KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ১৪৮ নং রসা রোড (সাউথ) কালীঘাট, কলিকাতা; ২০৮/২১ বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা
Collection KLMLGK	Publisher রমেশচন্দ্র চৌধুরী
Title নারায়ণ	Size 5.5"x9.5" 13.97x24.13 c.m.
Vol. & Number ১/১-৬ ১/৫	Year of Publication : অগ্রহায়ণ, ১৩২১ – মাঘ, ১৩২১ চৈত্র, ১৩২১
	Condition : Brittle ✓ Good
Editor : চিত্তরঞ্জন দাশ	Remarks : No. of Pages Missing

CD Roll No. KLMLGK

...ও সমাে...

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড প্রথম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র ১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূচী পত্র

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
। স্তব	...		১
। অন্তর্যামী (কবিতা)	...		৪
। নূতনে পুরাতনে	...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।	৫
। মৃণালের কথা (গল্প)	...		২০
। বৌদ্ধধর্ম্ম	..	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।	৫৭
হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব	...	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শী...	৭১
পৌরাণিকী কথা	...	শ্রীপাচকড়ি বনে...	
...বন (ভ্রমণ)	...	শ্রীজলধর সেন।	
	...	শ্রীমতী সরযূবাল...	

নূতনে পুরাতনে

ইংরাজি শিখিয়া, য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া, একদিন আমরা নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইহার জন্য একটুও দুঃখ করি না। গতানুগতিক শ্রদ্ধাটুকু একবার এরূপভাবে ভাঙ্গিয়া না গেলে সত্যশ্রদ্ধালাভ কখনই সম্ভব হইত না।

তখন আমাদের চক্ষে বিদেশের প্রায় সকলই ভাল লাগিত, আর স্বদেশের প্রায় সকলই স্বল্পবিস্তর মন্দ ঠেকিত। সে ভাবটা ক্রমে কাটিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, একদিন যেমন আমরা স্বদেশের যাহা কিছু তাহাকেই হীনচক্ষে দেখিতাম, আজ বুঝি সেইরূপ বিচারবিবেচনা-বিরহিত হইয়াই, স্বদেশের যাহা কিছু তাহাকেই ভাল বলিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। একদিন আমরা বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম; আজ সে দিকে বাড়ি খাইয়া, ফিরিয়া আসিয়া ঐ পুরাতন ঘরকেই অচলায়তন করিয়া তুলিতেছি। সত্য কথাটা তাহা নয়।

যখন আমরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছিলাম, তখন ঐরূপ বাহিরে যাওয়াই আমাদের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যে সকল মমতা কাটাইয়া কোনও দিন ঘরের বাহিরে চলিয়া যায় নাই, সে ঘরের মর্য্যাদাও কখনও বুঝিতে পারে না। প্রবাসের বেদনা ও পরদেশীর উপেক্ষা সহিয়াই লোকে আপনার ঘর ও আপনার জন যে কি বস্তু, ইহা সত্যভাবে বুঝিতে পারে। যে ঘরের কোণে বসিয়া থাকে, কিম্বা হদ্দমুদ্দ উঠানে যাইয়া নিরাপদে দাঁড়াইয়া দূরের পথের আবছায়ার ধ্যান করে, তার পক্ষে এ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না।

ফলতঃ, যে মন বাহিরে ছুটিয়া গিয়াছিল সেই যে ঘরে ফিরিয়া আসে, তাহাও নহে। সেই মানুষই আসে বটে, কিন্তু সে মন আসে না। নূতন প্রেম, নূতন দৃষ্টি লইয়া সে ঘরে ফিরিয়া আইসে।

বস্তুকে যে চক্ষে দেখিত, সেই চক্ষেই যে এখনও দেখে
নয়। সে চক্ষু থাকিলে, সেই ভাবও থাকিত। সে ভাব
থাকিলে, সে পুরাতন অভক্তিও থাকিত। ভাবের পরিবর্ত্তন না হইলে
যেখানে অশ্রদ্ধা ছিল, সেখানে শ্রদ্ধা জাগে না।

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়"। আমাদের স্বদেশে
প্রতি এই বিশ্বাস বাড়িয়া গিয়াছে। এই নববিশ্বাসই আমাদের নূত
স্বাদেশিকতার প্রাণ। আর কেবল বর্ত্তমানের সত্যের উপরেই নহে
কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপরেও এই নূতন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠ
হইয়াছে। কা'র ভিতরে কতটা কি সম্ভাবনা আছে, ইহা দেখিতে
হইলে, প্রেমের কাজল চক্ষে মাখিতে হয়। লোকে বলে বটে, প্রে
অন্ধ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেম যতটা দেখে, অপ্রেম বা ঔদাসীন্য তা
শতাংশের একাংশও দেখিতে পায় না। অপ্রেম অপূর্ণতাই খুঁজিয়া
বেড়ায়, কারণ যাহা দেখিতেছে তাহার মধ্যে সুন্দর ও পরিপূর্ণ কিছুই
নাই, এই জ্ঞান বা ধারণাকে আশ্রয় করিয়াই অপ্রেম বাঁচিয়া থাকে।
যার জীবনের জন্য যে বস্তুর যেটুকু প্রয়োজন সে তা'ই খুঁজিয়া নেয়।
আর অপ্রেম যেমন বস্তুর মন্দটাই দেখে, ঔদাসীন্য সেইরূপ বস্তুর
উপরটা মাত্র দেখে। এক প্রেমই বস্তুর সকলটা দেখে, ছায়ার সঙ্গে
তার আতপটুকুও দেখে, মন্দের সঙ্গে তার ভালটুকুও দেখে, বস্তুটি
যেমন আছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে, তাহা কত বড়, কত সুন্দর
হইতে পারে, ইহাও প্রত্যক্ষ করে। বস্তুর সমগ্র জ্ঞানের উপরে
প্রেম গড়িয়া উঠে। সুতরাং প্রেম যতটা দেখে, আর কেউ ততটা
দেখিতে পারে না।

স্বদেশকে আমরা যখন অশ্রদ্ধা করিতাম, তখন তাহার প্রতি
আমাদের এই প্রেম জন্মায় নাই। প্রেমের অভাবে তার বাহিরটাই
কেবল দেখিয়াছিলাম, ভিতরটা দেখিতে পাই নাই, তার এক দেশ
মাত্রই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সমগ্রকে চাক্ষুষ করিতে পারি
নাই। আজ নূতন প্রেমে সেই পূর্ণবস্তুকে দেখিতেছি বলিয়াই, তার

মন্দের সঙ্গেই যে ভালটুকুও জড়াইয়া আছে, তাহাও
তেছি। আর ঐ ভালটুকুর জন্যই জোর করিয়া মন্দটুকুর
আঘাত করিতে ভয় পাই।

ফলতঃ, ভাল মন্দ দুটা এমন একান্ত বিচ্ছিন্ন বস্তু নয় যে, এক-
াকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আর একটীকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়।
নাহিঁচড়া করিয়া কোনও জীবন্ত বস্তুর গঠনগত বা প্রকৃতিগত ভাল-
ন্দকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করা যায় না। জীবন্ত বস্তুর ভাল-
াকে বাড়াইয়া দিয়া ও ফুটাইয়া তুলিয়াই ক্রমে ক্রমে তার মন্দটাকে
নিরস্ত করিতে হয়। এক্ষেত্রে আর কোনও উপায়ান্তর নাই।
জোরাবরি করিলে শেষে জীবের জীবন লইয়াই টান পড়ে।

এই জন্যই জোরজবরদস্তি করিয়া কাহাকেও ভাল করিতে ভয়
াই। নিজের পুত্র কন্যার উপরেও জোর চালাইতে চাহি না, নিজের
সমাজের উপরেও নয়। যার প্রকৃতিতে যা নাই, বাহির হইতে বা
উপর হইতে তার উপরে তাহা চাপাইতে গেলে তাহাতে কোনও ইষ্ট
হয় না, বরং অনিষ্টেরই আশঙ্কা বেশী হইয়া থাকে।

এক দিন এই জ্ঞান জন্মায় নাই। তাই য়ুরোপের ভালটাকে তখন
জোর করিয়া আমাদের নিজেদের সমাজের ঘাড়ে চাপাইয়া, তাহাকে
য়ুরোপের মতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম। য়ুরোপ যে য়ুরোপ,
আর ভারত যে ভারত, এরা যে দুইটা বিশিষ্ট সমাজ, এবং বিশিষ্ট
বলিয়াই যে ইহাদের নিজস্ব একটা অন্তঃপ্রকৃতি, এবং সেই প্রকৃতি
অনুযায়ী এক একটা বহির্গঠন আছে; আর সমগ্র, সম্পূর্ণ, মনুষ্যত্বের
গোটা বীজটা যে সমভাবে উভয় সমাজের গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে, ঐ
বীজকে ফুটাইয়া তুলা যে উভয়েরই সমান লক্ষ্য, উহাতেই যে উভয়
সমাজেরই চরম সার্থকতা,—এ সকল কথা তখন বুঝি নাই। বৈষম্যের
ভিতর দিয়াই যে সাম্য, বিচিত্রতার মধ্য দিয়াই যে প্রকৃত একত্ব
আপনাকে নিয়ত অভিব্যক্ত করিয়া থাকে; বৈষম্য না থাকিলে সাম্য
যে অবস্তুতে, আর বিচিত্রতা না থাকিলে একত্ব যে কৃষ্ণত্ব শুক্লত্ব

য় কেবল একটা ভাববাচ্যের পদে পরিণত হয়, এক
জানি নাই। সুতরাং খোদার উপর খোদকারি করিতে যাই
নিয়াটাকে একাকার করিতে চাহিয়াছিলাম। ঐ মায়া এখন কাটি
গিয়াছে। দুনিয়াটা সংস্কারকের সৃষ্টিও নয়, আর সংস্কারকের হা
পাকাইবার জন্য সৃষ্টও হয় নাই। সুতরাং দুনিয়ার ভাল করিবা
জন্য ব্যস্ত হইয়া দুনিয়া-শুদ্ধ লোককে মন্দ বলিতেও আর প্রবৃ
হয় না।

এই ভাল-মন্দ জড়াইয়াই দুনিয়ার সত্য ভালটা গড়িয়া উঠে
পচাধষাটাকে কোনও দিনই বোধ হয় কেউ ভাল বলে না। অথচ
বীজ প্রত্যক্ষতঃ যতক্ষণ না পচিতে আরম্ভ করে, ততক্ষণ তার অঙ্কুর
জাত হয় না। অদ্যকার মন্দ অনেক সময় কল্যকার ভালরই অগ্র
দূত হইয়া আইসে। সকল সাধুরা এই কথা বলিয়াই ত জীবকে
সান্ত্বনা দিয়া থাকেন। আখেরী ভালর উপরে তাঁদের অটল আস্থা
আছে; আমাদের নাই বলিয়াই আমরা পদে পদে এত বিচলিত
হইয়া পড়ি।

আমাদের নিজেদের প্রকৃতির ভিতরে, আমাদের সমাজেরও প্রাণের
মূলে, তার পক্ষে যাহা ভাল, আর দুনিয়ার পক্ষে যাহা ভাল, তাহা
সকলই বীজাকারে লুকাইয়া আছে। এই ভালটাকে সংগ্রহ করিবার
জন্য ছুটাছুটি করিয়া বাহিরে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এ কথাটা এক দিন
জানি নাই ও বুঝি নাই বলিয়াই স্বদেশের দিকে পিছন ফিরিয়া বিদে
শের দিকে ছুটিয়াছিলাম। তবে ছুটিয়াছিলামও ভালরই জন্য।
ভ্রান্তিটুকু না হইলে আজ যে সত্য লাভ করিয়াছি, তাহারও পরীক্ষা হইত
না। আমাদের ভাল যে আমাদের ভিতরেই আছে, তাহাকে ভিতর
হইতেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, বাহির হইতে মাগিয়া আনা নিষ্ফল
জন, ইহা বুঝিবার জন্যই বাহিরে গিয়া ভিতরের ভালটাকে একবার
খুঁজিতে হয়। ইহা বিধাতারই বিধান। ঐ ভুল করিয়াছিলাম বলিয়াই
এই সত্যটাকে আজ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি।

নারায়ণ

স্তব

নমস্তে নারায়ণ!

তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়,
মাত্র অবলম্বন। আমাদের এই হাসি-অশ্রুময় জীবন, সুখে-
খ পরিপূর্ণ সংসার,—ইহাকে বাঁচাইয়া, জাগাইয়া রাখ একমাত্র
র্ণ।

তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়া-পুত্তলিকা। তুমি
আপনাকে লুকাইয়া রাখ তখনি সংসার মায়ার খেলা হইয়া
। তুমি সৃষ্টিকে সত্য করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছ।
সংসার তোমার লীলাভূমি।

য়কনায়িকার মাধুর্য্য, পিতামাতার বাৎসল্য, সখা এবং
ও দাসের একদিকে স্নেহ ও অপরদিকে ভক্তি—
সার, এইসব লইয়াই ত জীবের জীবন। তুমি
সার্থক কর। সকল রসের একমাত্র লক্ষ্য
কিছু সব ত উপলক্ষ্য।

ই যে মাতা বাৎসল্য-আবেগে আপনার
লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন, ঐ বাৎসল

ছুটিয়া যাইতেছে। ওই শি...
...তোমাকে না দেখিতে পান, তাঁহার ...
তুমি যখনি তাঁহার প্রাণে ওই শিশু...
তাঁহার বাৎসল্য ধন্য হয়। বাৎসল্যের অসীম ...
উপভোগ করেন। নায়কনায়িকার যে মাধুর্য্যরস তাহাও তো...
পানে প্রবাহিত হয়; যতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া না পায় ততক্ষ...
তাহার কোনও সার্থকতা হয় না। যখনি তুমি নায়কনায়িকারূ...
আপনাকে প্রকাশিত কর, তখনই তাহাদের প্রেমালিঙ্গন ধন্য হয়...
তাহারা হাসি-অশ্রুজলে, চুম্বনে, পরশে, তোমারই মাধুর্য্যরসের অপা...
আনন্দ সম্ভোগ করে। সকল সখ্যের তুমি আশ্রয়, সক...
দাস্যের তুমি যে প্রভু। যতক্ষণ তুমি সখারূপে প্রভুরূপে, না দে...
দাও, ততক্ষণ তাহারা "কই সখা, কই প্রভু" বলিয়া এই সংসা...
অরণ্যে কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তুমিই তাহাদের সখ্য ও দাস্য...
সার্থক করিয়া তুল।

সকল জীবের তুমি একমাত্র আশ্রয়, সকল নরের তুমি সম...
সকল নরসমাজের তুমি ব্যষ্টি, সকল জাতির তুমিই জাতীশ্ব...
তুমিই বিশ্বমানব;—অতীত মানব তোমারই বুকে লুকাইয়া আ...
বর্ত্তমান মানব তোমারই জীবন আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন ক...
তেছে; আর মানব যাহা হইবে, তাহার সমুদায় ভবিষ্যৎ সম্ভাব...
এক অপূর্ব্ব অসংখ্য-দল পদ্মের মত তোমারই বক্ষে ফুটিয়া আ...
তুমি দেহ ... আত্মা; তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি; অনাদি ...
...ন্ত তুমি, সান্ত তুমি। তুমিই নরনারায়ণ।
...জীবের অবলম্বন, জীবও যে তেমনি তোমার অব...
...ড়াও তোমার চলে না। লীলা-প্রয়োজনহেতুই ...
...বক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দিলে।
...ার লীলা সম্ভব হয় না। তুমি নিত্যই এক, ...
... আপনার মধ্যে লীলা কর। তুমি এক ...

...রূপ ধরিয়া বিশ্বসংসারে বিচর...
... ঝঙ্কার দেও তখনি সকল বিশ্বের ...
...স সঙ্গীত, প্রভো! তুমি ছাড়া কেই তাহা
... পিতা হইয়া, মাতা হইয়া স্নেহদান কর,—আবার
... সন্তান হইয়া সে স্নেহের দাবী কর। তুমি প্রভু হইয়া
...সকে স্নেহে আবদ্ধ কর, আবার তুমিই দাস হইয়া প্রভুকে প্রাণের
...ক্তি অর্পণ কর। তুমি সখা হইয়া সখ্যরস ঢালিয়া দাও, আবার তুমিই
... রস সম্ভোগ কর। তুমি ধনী হইয়া দান কর, ভিখারী হইয়া
...হণ কর। তুমিই নায়কনায়িকা হইয়া প্রেমলীলার অভিনয় কর।
...মিই তাহাদের বাহুপাশ হইতে আলিঙ্গন কাড়িয়া লও, তাহাদের
...ষ্ঠপ্রান্ত হইতে প্রেমচুম্বন চুরি করিয়া আস্বাদ কর।

সকল ভোগ্যের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদন-
...রী। আমাদের সকল কর্ম্মের তুমি কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি
...তা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্ত-
...পী নারায়ণ! তোমার কথা যখন ভাবি, অতীতের সমস্ত যবনিকা
...ত্তালিত হয়, তখন বুঝিতে পারি ইতিহাস শুধু তোমারই লীলাপরি-
...র্ণ পুণ্য কাহিনী। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর
...ব। তুমি এক, তুমিই দুই—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই
...শ্বর নিগূঢ় রহস্য। ইহাতেই বিশ্বের নিখিল রস-স্ফূর্ত্তি। ধন্য জীব,
... তুমি, ধন্য তোমার লীলা!

নমস্তে নারায়ণ!

অন্তর্যামী

যে পথেই লয়ে যাও,
মনে রেখো আমি শুধু তোমারেই চাই!
প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,
সে দিন হইতে, বঁধু! আলোকে আঁধারে,
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে!
তোমারে পেয়েছি কি গো? তা'ত মনে নাই,—
সদাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই!
শৈশবে পথের ধারে করিয়াছি হেলা,
সে কি শুধু অকারণ আপনার খেলা?
সে দিন তোমারে, বঁধু! পারিনি ধরিতে,
আমার খেলার মাঝে মোরে খেলাইতে!
প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
যৌবনে সকল মনে আপনা বিকাই;
পুষ্পিত, ঝঙ্কৃত সেই, আলোক আগারে,
কেমনে রাখিলে, বঁধু, আপনা লুকাই!
আমার সুখের মাঝে সুখ খুঁজি নাই,
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে, তোমারে শুধু! পাই বা না পাই;—
হে! তোমারি লাগি আকুল পরাণ!
হে! বঁধু হে! আমি তোমারেই চাই,
পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই!

ইংরাজি পড়িয়া য়ুরোপের সভ্যতার রূপরসে মুগ্ধ হইয়া আমরা
শের সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে একটা বিরোধ বাধাইয়া বাহিরে ছুটিয়া
ই এই সত্যটা লাভ করিয়াছি বলিয়া, সেই বিরোধের জন্য কিছুমাত্র
করি না। ঐটি না হইলে এইটিও হইত না। আজ আমরা একটা
র, উচ্চতর, গভীরতর সমন্বয়ের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ঐ
াধটা বাধাইয়াই এই সমন্বয়ের সন্ধান পাইয়াছি। আজিকার এই
য়ের পথে দাঁড়াইয়া, পূর্ব্বকার ঐ বিরোধকে জাগাইয়া রাখা বা
ইয়া তোলা যেমন অসঙ্গত ও অনিষ্টকর, সেইরূপ ঐ বিরোধ হইতেই
এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথাটা ভুলিয়া যাওয়া বা
কার করাও অন্যায়। যারা আজিও ঐ পুরাতন বিরোধকেই সামান্য
নাটি ধরিয়া জাগাইয়া রাখিতে চাহে, তারা যেমন এই সমন্বয়ের বাধা
ইতেছে, অন্য দিকে যারা ঐ বিরোধটার মূল্য অস্বীকার করে,
ও এই সমন্বয়ের প্রকৃত মর্ম্ম যে কি ইহা জানে না ও বোঝে
ঐ বিরোধের মূল্য যে বোঝে না, এই সমন্বয়ের মর্য্যাদাই বা
জানিবে কিসে?

সমন্বয় মাত্রেই, যে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী
তবাদী উভয় পক্ষেরই পূর্ণ দাবীদাওয়া কিছু কাটিয়া ছাটিয়া একটা
পথ ধরিয়া তাহার ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দেয়। সুতরাং এই
য়মুখে পূর্ব্বে আমরা যে দিকে ছুটিয়া যাইতেছিলাম, তার কিছু
বর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোনও সমন্বয়ই বিপরীত পথ ধরিয়া চলে
গতির বেগটা একটু কমাইয়া বা তার মুখটা একটু ঘুরাইয়া
ও, প্রকৃত সমন্বয় মাত্রেই বস্তুকে তার মূল গন্তব্যের দিকেই বাড়াইয়া
সমন্বয় প্রত্যাবর্ত্তন নহে, অগ্রসর; প্রতিক্রিয়া নহে, বিকাশ।
মাত্রেই পূর্ব্বকার বিরোধের মূল লক্ষ্যকে সাধন করে, তাহাকে
ারে নিরর্থক করিয়া দেয় না। মানুষের মন ও মানবসমাজ
ন করিয়া যে বিকাশের পথে চলে, এইটী যাঁরা ভাল করিয়া
য়া দেখেন না, তাঁরাই কেবল কার্পণ্যাভিভূত হইয়া এই

সমন্বয়-চেষ্টাকে প্রত্যাবর্ত্তন বা প্রতিক্রিয়া বলিয়া কল্পনা কি
থাকেন।

তালগাছের মতন মানুষের মন বা মানবসমাজ একটা স
রেখার ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উন্নতির পথে চলে না; আর ঘ
পেণ্ডুলাম্ বা পরিদোলকের মতনও একবার বামে আরবার দ
দোল খায় না। কিন্তু ঐ তালগাছে কোন সতেজ ব্রততী
তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরূপই মানু
মন ও মানবের সমাজ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়া থাকে। এ
লম্বা সরল খুঁটার গায়ে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত একগাছা
জড়াইতে হইলে যেমন তাহাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিতে হয়, মানু
মনের ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের পন্থাও কতকটা তারই মত
এই গতির ঝোঁকটা সর্ব্বদাই উন্নতির দিকে থাকিলেও, প্রতি স্তরে
উপরে উঠিবার জন্যই, একটু করিয়া নীচেও নামিয়া আসিতে হ
ইংরাজিতে এরূপ তির্য্যক-গতির একটা বিশিষ্ট নাম আছে,—ইহা
স্পাইর‍্যাল মোষণ spiral motion বলে। সমাজ বিকাশের ক্র
এইরূপ স্পাইর‍্যাল, একান্ত সরল নহে। এ গতিতে ঠিক ক্রিয়া
প্রতিক্রিয়া, একবার বামে ঝুঁকিয়া, আবার দক্ষিণে ছুটিয়া যাওয়ার ম
কোনও কিছু নাই। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার গতি, কিম্বা পরিদোলনে
গতির জন্য একটা সমতল ক্ষেত্রের প্রয়োজন। এইভাবে এক স্তর হই
অন্যতর ও উচ্চতর স্তরে যাওয়া যায় না। আপনার গতি-বেগের অ
ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ উ
মুখী তির্য্যক্‌গতির পথ অনুসরণ করিতে হয়। মানুষের মন ও মানু
সমাজ যে ক্রমাগতই এরূপ এক স্তর ছাড়াইয়া অন্য স্তরে, এক
অতিক্রম করিয়া অন্যতর ও উচ্চতর ধাপে যাইতেছে, ইহা ত প্র
কথা। সুতরাং এক্ষেত্রে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া শব্দে কোনও
সত্যবস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

এই জন্যই বলি, বর্ত্তমানে আমরা যে সমন্বয়ের মুখে অ

চাইয়াছি, তারই জন্য পূর্ব্বকার বিরোধটা অত্যাবশ্যক ছিল। এই
ন্বয়ের মুখে আমরা ফিরিয়া নহে, অগ্রসর হইয়াই আসিয়াছি। ঐ
ারাধের পূর্ব্বে আমাদের দেশের সভ্যতা ও সাধনা যেখানে দাঁড়াইয়া-
ন, আজ তার চাইতে অনেক উচ্চ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।
রীর দেশ-ভক্তি বা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা এই সত্য কথাটা
ন্দুমাত্র করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না।

যে আজ দেশব্যাপী যে একটা সতেজ স্বাদেশিকভাব জাগিয়াছে, ইহা ত
বোকার করা যায় না। এই নূতন স্বাদেশিকতা যে আমাদের অব্যবহিত
র্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বাদেশিকতা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, তাই কি
স্বীকার করিতে পারি? আর এই যুগের প্রথমে আমরা বিদেশীয়
াবের প্রেরণায় স্বদেশের সঙ্গে যে বিরোধটা বাধাইয়াছিলাম, তাহা যদি
বাধিত, তবে এই শ্রেষ্ঠতর স্বাদেশিকতার কোনই সন্ধান যে আমরা
ইতাম না, ইহাও অস্বীকার করা যায় কি?

আজ আমরা আমাদের স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনাকে অল্পে অল্পে
াক্ষভাবে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের অব্যবহিত-পূর্ব্ব-
যেরা এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলাভ করেন নাই। যাহা চলিয়া আসিতেছিল,
োকেই তাঁরা সত্য ও সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। দেশের
নীতি, আচার-বিচার, ক্রিয়া-কর্ম্ম, এ সকলকে তাঁরা নিষ্ঠাপূর্ব্বক
য় করিয়া বহিয়াছেন; কিন্তু কোনও দিন বোধ হয় মাথা হইতে
ইয়া নিজেদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন নাই।
যে বস্তুকে কেবলই মাথায় করিয়া রাখা যায়, চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া
ণা করিয়া দেখা হয় না, তার যথার্থ জ্ঞানলাভ কদাপি সম্ভবে না।
বস্তুর তত্ত্ব-নিরূপণ ও উপলব্ধির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণকেই আমাদের
কে পরিভাষায় পরীক্ষা কহে। এই পরীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান
না। আবার সন্দেহ ব্যতীত পরীক্ষার প্রয়োজনও উপস্থিত হয়
দরজার সামনে অন্ধকারে একটা লম্বা সরু বস্তু পড়িয়া আছে
খয়া, ইহা দড়ি না সাপ, এই সন্দেহ উপস্থিত হইলেই আলো আনিয়া

তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখি। দড়ি বা সাপ এ দু'এর কোনও এক
ধারণা স্থির থাকিলে এ ব্যর্থশ্রম-স্বীকার কেহ করে না। অতএব পরী
ব্যতীত যেমন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না, সেইরূপ জিজ্ঞাসা ব্যতীত প
ক্ষারও সূত্রপাত হয় না। আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষদিগের
নিজেদের সভ্যতা ও সাধনা, আচার ও অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম ও কর্ম্মাদির
একটা কোমল শ্রদ্ধামাত্র ছিল, কোনও কোনও স্থলে একটা খু
ভক্তি পর্য্যন্তও দেখা গিয়াছে। শাস্ত্রযুক্তি না জানিয়াও কেবল
গতানুগতিক রীতিকে আশ্রয় করিয়া যে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাকেই কে
শ্রদ্ধা কহে। আমাদের শাস্ত্রে এই কোমল-শ্রদ্ধাবান লোকদিগ
নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়াছেন। তবে সাধন বলে

"ক্রমে ক্রমে তিঁহ ভক্ত হইবেন উত্তম—"

এই আশ্বাসও দিয়াছেন। আর জিজ্ঞাসাই এই উত্তম অধিকারলা
পথে প্রথম অবস্থা। কিন্তু আমাদের অব্যবহিত-পূর্ব্বপুরুষদিগের
জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই। যাহা প্রচলিত তাহাই প্রামাণ্য, যাহা
তাহাই শ্রেষ্ঠ, যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই সনাতন; তাঁরা এ
মাত্র বিশ্বাস করিতেন। এগুলি যে অসত্য বা সত্যাভাস, নিকৃষ্ট
অধুনাতন হইতেও বা পারে, তখন পর্য্যন্ত কাহারো মনে এই সন্দে
উদয় হয় নাই। সন্দেহ না জাগিলে জিজ্ঞাসার, জিজ্ঞাসা না জা
পরীক্ষার প্রবৃত্তি হয় না। এই জিজ্ঞাসা ব্যতীত সত্যসন্ধিৎসা, সত্যসন্ধি
ব্যতীত সাধনে একাগ্রতাও জন্মে না। একাগ্রতা না জন্মিলে তা
শক্তি জাগে না। ত্যাগের শক্তি না জাগিলে সংস্কারবর্জ্জনের
আর সংস্কারবর্জ্জন না করিলে সম্যক বিচারের অধিকার, এবং
ব্যতীত কদাপি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।

ইংরাজি শিখিয়া, য়ুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ইতিহাসাদির
গত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া, আমাদের নিজেদের ধর্ম্ম, সমাজ,
ও শিল্পাদি সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এখানে নিজেদের
যাহা দেখিতেছিলাম, ওখানে ঐ সকল গ্রন্থে আর সাহেবদের আ

আচরণে তার বিপরীত সব দেখিতে লাগিলাম। আমাদের শাস্ত্রের অর্থ
শুন কেহ আমাদিগকে কহেন নাই; কহিবার মতন লোকও দেশে
শী ছিলেন কি না সন্দেহ। উহাদের শাস্ত্রসাহিত্যের মর্ম্ম আমাদের
ক্ষর সম্মুখেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উহাদের ভাব ও আদর্শ যে কি
রি আমরা সল্পবিস্তর বুঝিতে পরিতাম; আমাদের রীতিনীতির মর্ম্ম
ন্দুকি, ইহা কিছুই বুঝিতাম না। উহাদের বাহিরের শিক্ষা আমাদের
ফিল বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিত; আর আমাদের ঘরের শাসন
কেবলই চারিদিকে আমাদিগকে কষিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিত। এক
দিকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, অপরদিকে কঠোর আনুগত্য। একদিকে
ভোগ, অপর দিকে ত্যাগ। এক দিকে প্রত্যক্ষ রূপরসাদি, অপর দিকে
অপ্রত্যক্ষ স্বর্গমোক্ষ। এক দিকে প্রবৃত্তির মোলায়েম প্ররোচনা, অপর
দিকে নিবৃত্তির নির্ম্মম শাসন। এই দুই শক্তির মাঝখানে পড়িয়া
আমরা যে যৌবনের সহজটানে আমাদের ঘরের বাঁধন কাটিয়া ঐ
হিরের মুক্তির সন্ধানে ছুটিলাম, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কারণ, ঐ স্বাধীনতাই যৌবনের স্ব-ধর্ম্ম। বিধির বিধানেই মানুষ
যৌবনের প্রেরণায় বহির্বিষয়ের রূপরসের মাঝে আপনার ভিতরকার
পূর্ণতাকে খুঁজিয়া থাকে। আমাদের নিজেদের সভ্যতায় ও সমাজে
ই সহজ যৌবন-ধর্ম্মের উপযোগী সাধন সে সময়ে একপ্রকার লোপই
াইয়াছিল। যুবা বৃদ্ধ সকলে একই বিধি-নিষেধের বন্ধনে আবদ্ধ
ছিলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, আশ্রমবিহীন হইয়া, কেবলমাত্র বর্ণভেদে পরিণত
ইয়াছিল। কৈশোরে ব্রহ্মচর্য্য, যৌবনে গার্হস্থ্য, প্রৌঢ়ে বানপ্রস্থ,
র্দ্ধক্যে সন্ন্যাস,—এসকলের কোনও কিছু ছিল না; ছিল কেবল বিধি-
নগড়বদ্ধ গার্হস্থ্য, আর অস্বাভাবিক মর্কট বৈরাগ্য ও উচ্ছৃঙ্খল সহজীয়া
াস। শাস্ত্র ছিল, তার অর্থ কেহ জানিত না; আচার ছিল, তার
বিচার কেহ করিত না। ধর্ম্ম ছিল, তার মর্ম্ম কেহ বুঝিত না। সমাজ
একদিকে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষণ করিয়া
থিতে চেষ্টা করিত, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত কাম্যকর্ম্মজাল,

পূজা-অর্চ্চনার সংকল্প ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া—"রূপং দেহি, ধ
দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি"—বলিয়া সকল সংসার-কামনা
প্রদীপ্ত করিয়া দিত।

আমরা যে আকস্মিক উল্কাপাতের মতন পূর্ব্বাপর সম্পর্কশূন্য হ
আকাশ হইতে এদেশের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা ন
আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দোষগুণের বোঝা মাথায় লইয়া তাঁহ
কর্ম্মভারক্ষয় করিবার জন্যই এদেশে আসিয়া জন্মিলাম। ঐ বিধি
বাঁধনের ভিতরেই এবং ঐ সমাজশাসন সত্ত্বেও, তাঁহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে
সকল কামনা ও বাসনা শুষ্ক-নির্ঝরগর্ভে-গুপ্ত-ফোয়ারার মতন দিবানি
স্ফুরিত হইত তাহাই আমাদের এই নূতন শিক্ষা ও সাধনার প্রেরণা
বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তাঁরা যাহা চাহিতেন, কিন্তু পাইতেন না; যে
বন্ধনের ক্লেশই তাঁরা অনুভব করিতেন, কিন্তু তাহাকে কাটি
ছিঁড়িয়া মুক্ত হইবার মতন শক্তি ও সাহস তাঁদের ছিল না
আমরা এই নব-শিক্ষায় নূতন শৌর্য্য অর্জ্জন করিয়া সেই বং
পশ্চাতে প্রকাশ্যে ছুটিয়া গেলাম এবং অবলীলাক্রমে সেই ব
ছিন্ন করিয়া আপনাদের যৌবনকে সার্থক করিতে লাগিলাম।

শক্তির সাহায্যে আমরা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার বন্ধন
কাটিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম, সে শক্তিও মূলে আমাদে
দেশের, বিদেশের নহে। ইহাকে স্বাধীনতাই বলি, আর স্বেচ্ছাচা
বলি, যাই বলি না কেন, ইহার উদ্দীপনা মাত্র কেবল বিদেশের শিক্ষ
দীক্ষা হইতে আসিয়াছিল, মূলে শক্তিটা স্বদেশেরই সভ্যতা ও সাধনা
পূর্ব্বপুরুষদিগের যে বাসনা চরিতার্থ হয় নাই, তাহাই এই শক্তি
আশ্রয় করিয়া আমাদের জীবনে নিজ নিজ চরিতার্থতা অন্বেষণ কবি
লাগিল। কোনও শিক্ষাদীক্ষাতেই মূল রক্তের বাঁধনটা নষ্ট কি
পারে না। সুতরাং আমরা এই বিদ্রোহের মুখেও স্বদেশের ভিত
কার প্রাণস্রোত হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারিলাম ন
এই যোগটা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইলে আজিকার এই সমন্বয়ের সম্ভার

য্যন্ত থাকিত না। সমন্বয় বিরোধের নিষ্পত্তি করে, সামাজিক-
ন্বয় সমাজগতিকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াই পরিবর্ত্তিত আধার ও আবে-
দনের সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া দেয়। সমন্বয় পুরাতনকে পূর্ণ করে,
াশ করে না; নূতনকে সার্থক করে, সংহার করে না।

এই সমন্বয়-পন্থাকে অনুসরণ করিয়াই আমাদের দর্শনশাস্ত্র সকল
াণ্ডসার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধর্ম্মমীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা এবং ব্রহ্ম-
ীমাংসা বা উত্তরমীমাংসা, উভয় দর্শনই এই সমন্বয়ের প্রণালীর অনুসরণ
রিয়াছেন। উভয়েই প্রথমে শাস্ত্র মানিয়া লইয়াছেন, শাস্ত্রের স্বতঃ
ামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। সকল বিজ্ঞানই এইরূপে আপনার মূল
স্বগুলিকে মানিয়া লয়। গণিত দেশকালের অস্তিত্ব, আর এই দেশ
ালের যে একদিকে অন্ত নাই ও অন্যদিকে এরা অনন্তভাগে বিভক্ত
তে পারে—এই তত্ত্বগুলি মানিয়া লইয়া তবে আপনার যাবতীয়
দ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। গণিতের সকল বিচার
যুক্তি এই কয়টা তত্ত্বকে মানিয়া লইয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াই
ীয়াছে। জড়বিজ্ঞান সেইরূপ জড়বস্তুর অস্তিত্ব ও যাহাকে আমরা
চর জড়ের গুণ বা ধর্ম্ম বলি, তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লই-
আপনার সর্ব্বপ্রকারের বিচার-পরীক্ষায়, গণনা ও গবেষণায় নিযুক্ত
া থাকে। এইরূপ আমাদের মীমাংসাদর্শনও শাস্ত্র যে স্বতঃ
ামাণ্য এইটি মানিয়া লইয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা বেদের কর্ম্মকাণ্ড-
ই, আর উত্তরমীমাংসা তাহার জ্ঞানকণ্ডকেই, একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র
য়া গ্রহণ করিয়া বিচারযুক্তি প্রয়োগে নিজ নিজ বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের
তষ্ঠা করিয়াছেন। শাস্ত্র উভয়েরই মূল। তাহারপর, এই শাস্ত্রার্থ
ক্কে জিজ্ঞাসার বা সন্দেহের উৎপত্তি। এই জিজ্ঞাসাই মীমাংসার
াজন প্রমাণ করে। এইজন্য এই জিজ্ঞাসাই উভয় মীমাংসার
ম ও আদি কথা। পূর্ব্বমীমাংসা "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা," আর
ত্তরমীমাংসা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—বলিয়াই আপনাদের দর্শনের
য়োজন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম কি, আর ধর্ম্ম নয় কি; ব্রহ্ম

কি, আর ব্রহ্ম কি নয়; এই বিষয়ে সন্দেহই এই জিজ্ঞাসার মূল। এই সন্দেহ হইতে বিচার। এই বিচার হইতে সঙ্গতি। আর সঙ্গতির পরে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

শাস্ত্র ;
|
সন্দেহ ;
|
বিচার ;
|
সঙ্গতি ;
|
সমন্বয়

—এই পাঁচ পায়ের উপরে আমাদের ধর্ম্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সামাজিক জীবনের অভিব্যক্তিতেও এই ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে যদি সমাজের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বিধানাদিকে বসাইয়া দেই, তাহা হইলে—

যাহা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত,
|
তাহার সত্যতা বা সনাতনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ,
|
সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিচার,
|
এই বিচারের ফলে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের
পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি,
|
আর সর্ব্বশেষে, এ সকল বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের
সঙ্গে সার্ব্বভৌমিক যে বিশ্ব-সমস্যা
তাহার যথাযোগ্য সমন্বয়—

এই পঞ্চ অঙ্কে সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তির ক্রমও ঠিক প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সমাজ-জীবনের বিকাশের ভিতরেও চৈতন্যের বা জ্ঞানের লীলা রহিয়াছে, ইহা মানিয়া লইলে এই প

দের অনুক্রমণ করিয়াই যে সমাজের ধারা রক্ষিত ও বিকশিত হয়, ত স্বীকার করিতেই হইবে। ফলতঃ ইহাই জ্ঞানের সার্ব্বজনীন । জড়বিদ্যা, জীববিদ্যা, সকলেরই এই একই পন্থা। বিশ্ব-াণ্ড জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া, জ্ঞানেতেই স্থিতি করিতেছে বলিয়া, র গতি এবং অভিব্যক্তি এই জ্ঞানের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই চলে। হা আছে, তাহাতে মানুষের চিরদিন কুলায় না। বাহিরে যাহা হয়, ভিতরে তার চাইতে ঢের বেশী অব্যক্ত থাকিয়া যায়। ভব্যক্তির ধর্ম্মই ইহা। চিত্রকর যখন চিত্র আঁকেন, তখন তাঁর নে যে রূপটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া আছে, তাহাকেই তিনি খণ্ড করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার চিত্রপটে ফুটাইয়া তুলেন। প্রতি র্ত্তেই তিনি চিত্রপটে যতটা ফুটাইয়া তুলেন, তাঁর নিজের চিত্তপটে তার তে অনেক বেশী অপ্রকট থাকিয়া যায়। সমগ্র ছবিটা আঁকা শেষ লও, তাঁর মনটা ফাঁকা হইয়া গিয়াই, যাহা আঁকা হইয়াছে তার তে আরো বড় কি একটা যেন আঁধারে পড়িয়া আছে, এই , উদাস-পারা হইয়া উঠে। কবি, গায়ক,—সৃষ্টি যাঁরাই করেন, ই এই অভিজ্ঞতালাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানের, প্রেমের, রে, সকল অভিজ্ঞতার ভিতরেই এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের সম্বন্ধ ত পাওয়া যায়। আর অব্যক্তের সর্ব্ববিধ অভিব্যক্তিই স্বল্পবিস্তর ক্রমটার অনুসরণ করিয়া চলে।

স্থিতি
|
বিরোধ
|
সমন্বয়

ভাবেই বিশ্বের অভিব্যক্তি হইতেছে। ইংরেজিতে এই ক্রমটাকে— sis, Antethesis, Synthesis বলে। আমাদের শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে—তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক—এই ভাবে কতকটা করা যাইতে পারে। স্থিতির অবস্থাই থিসিসের

(Thesis) অবস্থা। স্থিতিতে গতিবেগ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে
ইহা একরূপ অসাড় অবস্থা। অসাড়তা তমের প্রধান ধর্ম্ম। স্
প্রক্রিয়ার তম প্রলয়ের ধর্ম্ম। নিদ্রা ইহার লক্ষণ। আর প্র
কালে বিধাতা যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া কারণ-জলে শয়ন করিয়া র
পুরাণে এই কাহিনী আছে। সুতরাং স্থিতি, থিসিস, আর তম
তিনই সমধর্ম্মাপন্ন। তার পর বিরোধ বা অ্যাণ্টিথিসিস্ বা রা
অবস্থা। এই অবস্থাতেই ভেদ, বিদ্রোহ, সংগ্রাম, আত্ম
দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর সমন্বয়ে, সিন্‌থেসিসে, বা সা
ভাবেতে সকল ভেদবিরোধের মীমাংসা হইয়া, সত্যের আপাত-পূর্ণ
রূপ প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই অবস্থাই আবার ক্র
স্থিতিতে বা থিসিসে বা তমেতে যাইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে
সমন্বয় পরবর্ত্তী যুগের স্থিতি, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সিন্‌থেসিস পরব
যুগের থিসিস,পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সত্বই পরবর্ত্তী যুগে তম হইয়া প
তখন আবার বিকাশগতিকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য, বিরোধ, অ্যা
থিসিস্ বা রাজসিকতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিরোধ বি
প্রকৃতির মূল কথা নহে। বিরোধেতে এ সংসারে কোনও কিছু
ক্ষণ স্থিতি করিতে পারে না। তাই বিরোধটা পাকিয়া উঠি
সমন্বয়ের সূত্রপাত হয়;—অ্যাণ্টিথিসিস পূরা হইলেই সিন্‌থে
আর রাজসিকতা প্রবল হইলেই সত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে আ
করে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ এই ক্রম অনুসরণ করিয়া বিশ্ব বিকা
হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের এই "সনাতন" হিন্দুসমাজের জীবনেও এই সার্ব্বজ
বিকাশ-ক্রমের ব্যতিক্রম হয় নাই। আমরাও এক দিন বর্ব্বর ছিল
ক্রমে সেই শৈশবের বর্ব্বরতা হইতেই বর্ত্তমানের সভ্যতায় আ
উপস্থিত হইয়াছি। এই দীর্ঘপথ হাঁটিতে অনেক যুগযুগান্তর ক
গিয়াছে। তম হইতে রজঃ, রজঃ হইতে সত্ব; স্থিতি হইতে বি
বিরোধ হইতে সমন্বয়, থিসিস হইতে অ্যাণ্টিথিসিস, অ্যাণ্টিথিসিস হ

থেসিস,—বারম্বার এইরূপ করিয়া আমরাও ফুটিয়া উঠিয়াছি। যুগে
ড়া। আমরা নূতন জ্ঞান, নূতন শক্তি, নূতন প্রীতি, নূতন কর্ম্মের দ্বারা
রপুষ্ট হইয়া আসিয়াছি। হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনা বহুকাল পূর্ব্বে
পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছিল, তাহাই এতাবৎকাল চলিয়া আসিয়াছে,
র অপচয় বা সঞ্চয় আর কিছুই হয় নাই, একথা যে বলে, সে
ন্দুর ইতিহাস জানে না, হিন্দুর শাস্ত্র বুঝে না, হিন্দুর দর্শনের ক খ'এর
ান পর্য্যন্ত তার জন্মায় নাই। হিন্দু চিরদিনই মুক্তভাবে চলিতে
হিয়াছে। এই মুক্তির জন্যই সে নিজেকে কতবার কত বাঁধনে
ড়াইয়াছে, আবার এই বন্ধনের দ্বারা এই মুক্তিলাভ হইল না দেখিয়া
র্ম্মে ভাবে সকল বিধিনিষেধকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে। এই
টা বুঝিলেই হিন্দু যে কোনও দিন অচলায়তন রচনা করিয়া তার
রে বেশীদিন আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, এটা সুস্পষ্ট-
বুঝা যায়। যুগে যুগে হিন্দু, যুগপ্রয়োজনকে অঙ্গীকার করিয়া,
ন নূতন ধর্ম্মের, নূতন নূতন কর্ম্মের, নূতন নূতন বিধিনিষেধের,
ন নূতন শাস্ত্র সংহিতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যথা পূর্ব্বং তথা-
যুগে যুগে যাহা হইয়া আসিয়াছে, এই যুগেই কি কেবল
যদি ব্যতিক্রম হইবে?

তিক্রম যে হয় নাই, পরমহংস রামকৃষ্ণ, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ,
নন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ, ইহাঁরাই তার সাক্ষী।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মৃণালের কথা।

১।

ভগিনীর পত্র।

মেজ দাদা,

তোমার চিঠি পাইলাম। মৃণালের পত্রখানাও পড়িলাম। তু ভাবিও না। আমি তারে বেশই চিনি, তোমার চাইতে বোধ হ বেশীই চিনি। দিন কতক যদি তারে না ঘাঁটাও, সে আপনি ফি আসবে।

লেখার ঢংটা দেখেও কি বুঝনি ও চিঠি তার নিজের ন তুমি রাগ ক'রো না, তার বিদ্যা কত, আমরা ত জানি। দেখ না কি, যে সব বইএর কথা গেঁথে গেঁথে মেজ'বউ এই চিঠিটা সা য়েছে। আমি ভাব্ছি সে অমন চিঠিটা তোমায় পাঠালে কে তা না করে', কোন ভাল মাসিক কাগজে পাঠিয়ে দিলে তার তারিফ বেরোত', কালে জানি কি একজন বড় লিখিয়ে বলে তাকে জানত। আমার দুঃখু হয়, আমরা দুই ভাই-বোন আর ছাড়া অমন একটা বড় লেখা বাংলার সমজদার পাঠকেরা পড়্লে না।

আমার সন্দেহ হয়, এ চিঠিটা সত্যি সত্যি মেজ'বউর কি না। তার যে ভাইটার কথা লিখেছে, তাকে ত তুমি জান। শুনছি সে নাকি একজন ভারি লিখিয়ে হয়ে উঠ্ছে। শু ওয়ালা নাগরা জুতা পায় দেয়, চুড়িদার জামা পরে, আর কবি মতন বাব্রী চুল রেখেছে। শুনেছি রবিঠাকুরের সঙ্গেও নাকি জানাশুনা আছে। তাঁর নামসহি ছবি পর্য্যন্ত বাক্সে আছে, বান্ধবদের দেখিয়ে বেড়ায়। সে'ই হয়তো এ চিঠিটা লিখে দিয়ে

লেখার মার খুব বাহাদুরি আছে, উনি পড়ে বল্লেন যে ঠিক যেন রবি ড়া বন্ধকরেরই মতন। তুমি জান কি? মেজ' বউই আমায় লিখেছিল ড়ছ, জ' "সঞ্জীবনীতে" স্নেহলতা ছুঁড়িটার যে চিঠি বেরিয়েছিল, সেটা াকুক এই ছোঁড়াটারই লেখা, স্নেহলতার নাম জাল করে ছাপিয়েছে। ন মাদেরো পড়েই তাই মনে হয়েছিল। হিন্দুঘরের মেয়ে, যতই াঠা হোক না কেন, অমন চিঠি লিখ্তে পারে না।

দেখ্ছো না, মেজ'বউএর চিঠিও ঐ ছাঁচেই ঢালা। আমরাও ত মাদের কল্যাণে একটু আধটু বাংলা শিখেছি, কিন্তু অত বড় বড় কথা কৈ জুটাতে পারি না। আর অত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লেখা! বল্লেন আগা গোড়া যেন ইরেজির তর্জ্জমা। মৃণাল কবি-াই লিখুক আর যাই করুক, ইংরেজিও পড়েনি, বিলেত টিলেতও নি। সে অমন ইংরেজি ঝাঁঝের বাংলা লিখ্তে শিখ্লে মন করে, উনি কিছুতেই ঠাওর কর্ত্তে পাল্লেন না। আমি মুখ্খু না, য, কি আর বল্'ব?

তুমি বল্'বে, ইংরেজি হো'ক, বাংলা হো'ক, লেখাটা ত মৃণালের; টা যারই হো'ক না কেন, মনের ভাবটা ত তার নিজের! বলি, তাও নয়। ভাষা, ভাব, সব ধার করা, নাটুকে জিনিষ। ছ না, ও কোথায়, কোন্ নাটকে, কি কোন্ গানে, মীরা বাই'এর পড়েছে, আর অম্নি ভাব্ছে যে, সে মীরা বাই হয়েছে। বল্লেন, ভক্তমালের যখন আবার নতুন সংস্করণ হবে, তখন উএর কোনও কবি-ভক্ত নিশ্চয়ই, মীরা বাইএর কথার পরে, থাটাও বসিয়ে দেবে। এ চিঠিতে তারই আয়োজন হচ্ছে। কচ্ছেন না, সত্যি হতে পারে। তবে তুমি মাঝখানে পড়ে দেবে, ওঁর ঐ যা ভয়।

ন বল্লেন এ চিঠিটা আর কিছু নয়, কেবল হিষ্টিরিয়া। ওঁদের কেতাবে না কি লেখে হিষ্টিরিয়াতে এ সব হয়। এমন ন যে রক্তমাংশের মানুষের পীঠটা, তাও নাকি একেবারে

কাচের হয়ে যায়। উনি বলেছিলেন যে ডাক্তারী বইএতে নাকি ধরণের একটা মেয়ের কথা আছে। তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, পীঠটা কাচের হয়ে গেছে। তামাসা করে একজন তার পীঠে এ চাপড় মারাতে, "পীঠ গুঁড়ো হয়ে গেল" বলে চীৎকার করে মেয়েটা তখনি মারা যায়। হিষ্টিরিয়াতে এতটা নাকি হ মেজ'বউএর এও এক রকমের হিষ্টিরিয়া। তার খেয়াল হয়ে যে সে কারার বন্দিনী, আমাদের বাড়ীটা একটা জঘন্য জেলখা তোমরা সবাই কারারক্ষক। আমাদের বাড়ীর উঠানটা ত ন ছোট নয়,—আমার শ্বাশুড়ী তোমার বে'র সময় গিয়ে ঐ উ দেখে আশ্চার্য্য হয়ে গেছলেন,—পাড়াগাঁয়েও অমন দোড়দার উ কম, কলকাতার ত কথাই নাই। কিন্তু এত বড় উঠানটা মেজ'বউ চোখে কত ছোট ঠেকছে! আমাদের ঘরগুলো কেমন বড় উত্তরদক্ষিণ খোলা, সাহেবদের ঘরের মতন অমন সাজান না হ কেমন পরিচ্ছন্ন, মেজে গুলো আয়নার মতন চক ক'চ্ছে। আর বড় বৌএর যে শুচি বাই, রাতদিনই ত জল ঢাল্‌ছেন, আর দুটো ঝির পেছুনে পেছুনে ঘুরে ঘষাচ্ছে মাজাচ্ছেন, এমন সাফশুক্ষু ঘরদোর সকলের বাড়ীতে দেখা যায় কিন্তু অমন ঘরেও মেজ'বউএর মন উঠে না। কিন্তু মেজ এর কোনও দোষ নাই। মেজ'বউ ত আর চোখ দিয়ে জিনিষ দেখে না। তার খেয়ালে যখন যেটা যেমন ঠেকে তেম্নি দেখে। উনি বলেছিলেন যে সব কবি আর ঋষিদেরই ঐ রকম স্বভাব।

এক দিনের কথা তোমায় বলি; এ কথাটা নিয়ে আম দিন হেসে হেসে গড়াগড়ি দিয়েছি। সে বারে আমি পূজা তোমাদের ওখানে ছিলাম। তুমি ছুটিতে কোথায় বেড়াতে ছিলে। তখন বছর পাঁচ ছয় বোধ হয় মেজ'বউএর বে' আমি মেজ'বউএর ঘরেই শুতাম। একদিন, ঘোর আঁধ

কাশে ঘন মেঘ, বাহিরে গিয়ে হাত বাড়ালে হাত দেখা যায় না। নক রাত অবধি আমি বড়বউএর কাছে বসে গল্পগাছা কচ্ছি- াম। শু'তে গিয়ে দেখি, মেজ'বউ জানালার পাশে বসে ঐ ন্ধকার পানে তাকিয়ে আছে। বল্লাম "রাত অনেক হয়েছে, জ'বউ শু'তে এসো।" মেজ'বউ আমায় বল্লে কি জান?— াকুর ঝি, দেখ এসে কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে। ঐ আমবাগানে ন রূপো গালিয়ে ঢেলে দিয়েছে, আকাশে যেন রূপালী রং মাখিয়ে র নীলবরণকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। মরি, মরি, কি সুন্দর।"

আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম, বল্লাম "বলিস্ কি মেজ'বউ? এ যে ঘোর াঁধার রাত। কাল বাদে পরশু কালীপূজা। চাঁদ পেলি কোথায়?' র অত রসের ঢেউ আজ উঠ্‌ল কিসে?"

মেজ'বউ একেবারে চটে উঠে বল্লে "ঠাকুর ঝি, তোমার কুল কেমন? অমন ত্রিদিববন্দ্য চন্দ্রমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা ? না তোমার চোখের মাথা খেয়েছ?"

ালোটা একটু উঁকিয়ে দিয়ে কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম মেজ'বউএর র ভাবটা সহজ মানুষের মতন নয়। প্রাণ শুকিয়ে গেল। শেষে পাগল হ'লো! হঠাৎ তার বিছানার দিকে চেয়ে মজ'বউ এক নতুন কবিতা লিখেছে—

চাঁদনি রজনী, আও-লো সজনি,
চাহলো নয়ান মেলি।
আম্র কানন, মর্ম্ম মন্থন
নর্ম্ম পরাণ কেলি।
শুভ্র উজল, অভ্র কাজল
উছল ভুবন ভরি।
মঞ্জীর মুকুরে, শিঞ্জিত নূপুরে
রঞ্জল কিবা মরি!

তখন আমার ঐ ডাক্তরী বইএর কথা মনে পড়্লো। ভাব্লাম
খেয়ালটা তার যেমন আছে থা'ক। জোর করে ভাঙাতে গেলে হয়
উল্টা উৎপত্তি হবে। তাই ভেবে বল্লাম—

"তাই ত মেজ'বউ, আমার কি ভ্রমই হয়েছিল? সত্যই ত
সুন্দর চাঁদনি রাত। তবে জানই ত, উনি কালীপূজার সময় আম
নিয়ে যেতে আস্বেন, তাই ভেবে ভেবে কালই বুঝি অমাবস্যা তা
মনে হচ্ছিল। আমি বিরহে অন্ধ হয়ে গেছিলুম, তাই অমন জোছ
রাতও চোখে আঁধার ঠেক্ছিল।"

মেজ'বউএর মুখখানি অমনি প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। জানালা থে
লাফিয়ে উঠে এসে, আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরে বল্লে,—

"ঠাকুর-ঝি, তুমি তবে প্রেম তা' কি জান? আমি ভাবতাম তু
কেবল রান্নাবান্নাই কর, আর স্বামিপুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে
দাসীহেই অমন নারীজন্মটা খোয়াচ্ছো। বাঙ্গালীর মেয়ে খাঁচার পা
তারা কি বনের পাখীর সুর কখনও ভাঁজতে পারে? কেবল
বুলিই ত কপ্চায়, দেখি! বনের গান একেবারে ভুলে গেছে।
বনের পাখী হলাম না কেন?"

আমি কি আর বলব? তামাসা করে বল্লাম—

"তোর চকা তো এখন আকাশে উড়ছে; বাসায় ফিরে এলে
তোরে উড়িয়ে নিয়ে বনে যাবে।"

এই চিঠি পড়ে আমার সেই কথা মনে পড়্ল। এ
খেয়াল। কবিতাগুলো কি সে সঙ্গে নিয়ে গেছে, না সত্যিই
ফেলেছে? ও জিনিষ পুড়ান যায় না। দেখ দেখি, কোথা
গেছে কি না? যদি রেখে গিয়ে থাকে, তবে খুঁজে দেখ,
পক্ষের জোছনার বর্ণনার মতন বিন্দির সম্বন্ধেও অবশ্য
কবিতা পাবে।

তুমি ত তাকে জান। পনর বছর তাকে নিয়ে ঘর ক
যে তোমায় ছেড়ে বেশি দিন ঐ নীল-সমুদ্র আর আষাঢ়ের

থাকতে পারবে তা ভেব'না। সত্যি জিনিষে তার মন উঠে না।
বেলা থেকে সে তাই ছোট যা তাকেই বড়, আর বড় যা তাকেই
করে ভেবেছে। তোমার বাড়ী থেকে তোমার শ্বশুর বাড়ী
দূর তুমি জান। শ্যামপুকুর আর টালা দু-দশ দিনের পথ
। সেকেনক্লাস গাড়ীতে আধ ঘণ্টা লাগে। কিন্তু বাপের
ও শ্বশুর বাড়ী অত কাছাকাছি এটা ভাব্তে মেজ'বউএর ভাল
ত না। তোমারই মুখে শুনেছি, তাই সে কোনও দিন সোজা
বাপের বাড়ী যাতায়াত করে নি। শিয়ালদ'এ রেলে চেপে
া গিয়ে নেমেছে, সেখান হ'তে ছ্যাকড়া গাড়ীতে টালায় গিয়েছে।
র—তোমার মনে আছে কি?—সেবারে বর্ষাকালে আমি
দর দেখ্তে যাই। মে'জ বউএর ভাইপোর ভাত। কিন্তু সে
ই গাড়ীতে বাপের বাড়ী যাবে না। শিয়ালদ'এ রেলে চেপেও
। বল্লে—বর্ষাকালে বধূরা নৌকায় বাপের বাড়ী যায়, সব
লেখে। গাড়ীতে বরষার অভিসার কোনও কালে কেউ লেখে
—যদি যাই, ত নৌকায় যাব। এক রাত নৌকায় শোব।
নৌকা লাগিয়ে ভাত রেঁধে খাব। মাঝিগুলো ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ
, টানবে আর ভাটিয়াল গাইবে। কোট ক্যর বস্ল।
মিও তা'তেই রাজী হলে। শোভাবাজারে গিয়ে সন্ধ্যা বেলা
ঠলে, বাগবাজারে এসে রাত্রে রান্নাবান্না কল্লে, পরের দিন
মবাজারের পোলের কাছে নৌকা লাগিয়ে, পাল্কী করে
য় শ্বশুর বাড়ী গেলে! এ সকল জেনে শুনেও তুমি
র হয়েছ কেন?

পুরী যেতে বল্ছ, আমি এক্ষণি যেতাম। কটক
তেমন দূরেও নয়; কিন্তু গেলে উল্টা ফল হবে।
ঠাকুরপোকে পাঠাচ্ছি সে মেজ'বউকে চোখে চোখে
প্রতিদিন আমাকে খবর দিবে। উনি তা'কে একটা
দিয়েছেন। 'বল্লেন তুই সর্ব্বদা সঙ্গে থাক্বি আর

এই খাতায় ডায়রী রাখ্‌বি। আর রাত্রে ডায়রীটার
পাঠাবি।'

মেজদাদা তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমরা থাক্‌তে মেজ'বউএর কে
বিপদ ঘট্‌বে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঠাকুর পো'র পত্র।

১।

বউ দিদি,

এই তিন দিন তোমাকে কোনও খবর দেই নাই; খবর
কিছু ছিল না। তোমার মেজ'বউ যে বাড়ীতে ছিলেন,
এসে দেখ'লাম সেখানে নাই। সে এক পাণ্ডার বাড়ী।
যে উঠে গেছেন, তাও সে কথা বল্‌তে পারলে না।

তোমার যে খুড়িমার সঙ্গে তোমার মেজ'বউ পুরী গে
এখন তিনি দেশে ফিরে গেছেন। তোমার মেজ'বউ
জন্য শুন্‌লাম অনেক পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তিনি কিছুএ
রাজি হন নি। ওদিকে তাঁর পৌত্রটীর বড় অসুখ, ই
বেচারী আর থাক্‌তে পাল্লেন না। তোমার মেজবউ তাঁথা
নিয়ে সেই পাণ্ডার বাড়ীতেই রয়ে গেলেন, বল্লেন যখ
এনেছেন, তখন রথযাত্রা না দেখে যাব না। তোমা
চলে গেলে, পরের দিনই তোমার মেজ'বউ সে পাণ্ডার
কোথায় উঠে গেছেন, তারা কেউ জানে না। তবে
নাকি একটা বাড়ী ভাড়া করেছেন।

তোমার মেজ'বউকে যদি আমি জান্‌তাম বা তাঁর ভাইএর
টাও যদি বলে দিতে, তা হলে স্বর্গদ্বারে গিয়ে খুঁজে বের করা
তেই কঠিন হ'ত না। কিন্তু আমি ত তাঁকেও দেখিনি, তাঁর
এর নামও তুমি বল নাই। তোমার দাদার নাম করে খোঁজ
ত পারতাম। কিন্তু তাতে পুলিশের গোয়েন্দাগিরি হত, তোমরা
কে যে গোয়েন্দাগিরি কত্তে পাঠিয়েছ তাহা হত না। কাজেই
করি নাই। ঘটনাক্রমে কোনও সন্ধান কর্‌তে পারি কি না,
দেখে দেখে কেবল স্বর্গদ্বারের পথে ঘাটে এই কটা দিন ঘুরে
য়েছি। তোমার আশীর্ব্বাদে সন্ধান পেয়েছি। আমার বাহাদুরী
ই নাই। কেবল ঘটনাচক্রেই এটী ঘটেছে।

আজ সন্ধ্যাবলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটী পরিচিত
র সঙ্গে দেখা হলো। কল্‌কাতায় যখন আমি Y. M. C.
এর বোর্ডিংএ ছিলাম। তখন আমরা দুজনে একই ঘরে
াম। সে আজ তিন চার বছরের কথা। হঠাৎ আজ তাকে
দেখ্‌তে পেলাম। বল্লে সে তার দিদির সঙ্গে স্বর্গদ্বারে
সে আমায় কিছুতেই ছাড়্‌লে না—তাদের বাড়ী নিয়ে গেল।
ঘরে ঢুকে দেখি একটা বিলাতী ট্রাঙ্কের উপরে তোমার
নাম লেখা। বুঝ্‌লাম বিধি আজ সুপ্রসন্ন হয়েছেন। যা খুঁজ-
, তাই আপনি মিলিয়ে দিয়েছেন। সে আমায় কিছুতেই
না খাইয়ে ছাড়লে না। তোমার মেজ'বউএর সঙ্গেও দেখা
স'ই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তুমি যে আমার বউদিদি
কেউ জানে না।

জ এই পর্য্যন্ত। ক্রমে ক্রমে সব খবর পাবে এখন। তবে
য প্রতিদিন একটা ডায়রী পাঠাতে বলেছ, তা কি দর-
রে দিন কিছু বিশেষ বলবার থাকে সে দিনই চিঠি লিখ্‌ব।
ঘতে যারা হাওয়া খেতে আসে, তাদের ডায়েরী কিরূপ
বেমিই জান। প্রাতে চা' পান। তারপর সমুদ্রের ধারে

ভ্রমণ। তারপর গৃহে প্রত্যাগমন। নয়টার সময় মুনিয়ার আগম
সাড়ে ৯টা হইতে ১১টা সমুদ্রে স্নান ও মুনিয়ার হাত ধরিয়া
খাওয়া ও সাঁতার কাটবার ভান করা। ১১৷৷০টায় আহার।
পর্য্যন্ত নিদ্রা। ৪টায় চাপান বা জলখাবার। ৫টা হইতে
পর্য্যন্ত আবার সমুদ্রের ধারে বেড়ান। রাত্রে আহার ও তা
শয়ন। তোমার মেজ'বউএর ডায়রীও ঠিক এই। এটা
তাঁর ভাইএর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই বে'র করে নিয়েছি। সু
প্রতিদিন এইরূপেই কাটছে, জানিয়া রাখিও। প্রতি রাত্রে প
তন কথা লিখে বেহুদা কাগজ ও কালি খরচ করার কোনও প্রয়ে
আছে কি? যদি থাকে, লিখিও, হুকুম তামিল করব। এ
ধর্ম্মাবতারকে সেলাম করিয়া এ অধীনের তবে শয্যাশায়ী হ
আজ্ঞা হয়।

২।

বউ দিদি,

আজ একটা নূতন খবর আছে। শুনে তুমি খুসী ন
তোমাদের খরচ বাঁচ্‌ল। আমি ভিক্টোরিয়া হোটেল ছেড়ে
এসেছি। শরৎ (তোমার মেজ'বউএর ভাইএর নাম শ
ক'দিনই আমাকে তাদের সঙ্গে এসে থাকতে পীড়াপীড়ি কচ্ছি
আমি কিছুতেই রাজি হই নি। ইচ্ছা যে ছিল না তা নয়,
নিজেকে অত সস্তা করাটা কিছু নয়, তুমি দাদাকে সর্ব্বদা এ
বল। তাই আমিও নিজেকে সস্তা করতে চাই নি। যা
কাল রাত্রে, তোমার মেজবউও বড় ধরে বস্‌লেন। তিনি
নরেন বলেই ডাকেন, আর আমিও তাঁকে দিদি বল্‌তে শু
করেছি। তাঁর অনুরোধ আর এড়াতে পারলাম না। তাঁ
কাজের অনুরোধেও এ আতিথ্যগ্রহণ করাই ভাল মার
তোমার মেজ'দাদাকে লিখ, আমি তাঁর গিন্নিকে পাহা
গোয়েন্দাগিরিটা জমছে ভাল।

আচ্ছা, বউ দিদি, তোমরা তোমাদের মেজ'বউএর উপরে
মন নারাজ কেন? আমার ত তাঁকে বেশ ভালই লাগে।
াল'র চাইতেও ভাল লাগে,—সত্যি বড় মিষ্টি লাগে। মুখে হাসি
ন লেগেই আছে। চালচলন অতি শোভন, চোখ দুটো ভাবে ঢল
, নিজেকে সাজাবার কোনও চেষ্টা নাই, অথচ সাজা জিনিষটা
ন আপনি জোর করে এসে তাঁর অঙ্গে অঙ্গে বসে যায়। কথা
তি মিষ্টি। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক এক বার কেমন উদাস
রা হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন,—দেখে আমার সেই কীর্ত্তনের
দ মনে পড়ে—

যোগী যেন সদাই ধেয়ায়!

ামাদের কত ভাগ্যি, অমন বউ পেয়েছ। দিন রাত কেবলই
খ্‌ছেন আর পড়ছেন। আর তাঁর পড়বার ধরণটা বড় সুন্দর।
র্ব্বদাই পেন্‌সিল ও খাতা নিয়ে পড়তে বসেন; আর যখন যেখানে
ষ্টি কথা পান, তাই টুকে রাখেন। আমায় বলেছিলেন এতে
তা লেখার নাকি খুব সুবিধা হয়। আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম, "কি
সুবিধা হয়, দিদি?" বল্লেন, "জান কি, বড় বড় কবিরা যেন
ক এক জন ভারি রাজমিস্ত্রি। আর এই যে সুন্দর কথাগুলি
লি তাদের পঞ্চিরকাজের মালমসলা। ঐ মিষ্টি মিষ্টি কথা
া চুনে চুনে, "মোর," "হায়," "সখি," "সখা," "বঁধু" প্রভৃতি
কথার বুক্‌নী দিয়া সাজা'লেই অতি সুন্দর কবিতা হয়।"
মিও এখন থেকে খাতা হাতে করে সব বই পড়ি। দেখ
ামার মেজ'বউয়ের কল্যাণে হয় ত তোমার এই ঠাকুরপোও
াকটা কবি হয়ে উঠ্‌বে। বাঙ্গলা মাসিকে ছাপাবার মতন
ারি দু-দশটা এরি মধ্যে পকেটে জড় হয়েছে। গোয়েন্দা-
রতে এসে একেবারে একটা ডাকসই কবি হওয়া সকলের
ঘটে না। তবে ভাগ্যি জিনিষটাই নাকি অন্ধ, তার গমনে
কোন ছন্দ, আমার কপাল নহে নেহাৎ মন্দ; কর কি
ম'

এখনও তুমি সন্ধ ; তবে তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ ; করিলা
এখানেই চিঠি বন্ধ।

৩।

বউ দিদি।

তোমার শ্রীপাদপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম করি। তুমি য
মেম সাহেব হ'তে, তা হ'লে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ তোমায় দিতাম
তোমার কল্যাণে এই গোয়েন্দাগিরি করতে এসে কি সুখেই দি
কেটে যাচ্ছে। তোমার ফরমায়েস খাট্‌তে হয় না, ছেলেদে
পড়া বল্‌তে হয় না, আপিসে কলম পিসতে হয় না, ঘরে গিন্নি
মুখ ঝামটা খেতে হয় না ; দিনে শুতে পাই, ঝিমুতে হয় না
রেতে ঘুমুতে পাই, ছেলে বইতে হয় না ; আর দিন রাত কবি
শুনতে পাই, দুনিয়াশুদ্ধ লোকের সঙ্গে বকাবকি করতে হয় না
আমার মনে হয়, স্বর্গে যারা যায়, তারা বুঝি এই ভাবেই দি
কাটায়। বস্তু যত সব ছায়া হয়ে গেছে, ছায়া যত সবই কে
কায়া নয়, প্রাণী হয়ে উঠে, চারিদিকে ছুটোছুটি কচ্ছে। বি
পড়ে যা ভুল বুঝেছিলাম, সব এখন শুধ্‌রে যাচ্ছে। চোখ
গুলোকে ফাঁকি দিয়ে এখন কেবল মন দিয়ে সব জ্ঞান আহ
করতে শিখ্‌ছি। এ শিক্ষায় তোমার মেজ'বউ আমার গুরু হয়েছে
সত্যি বল্‌ছি বউ দিদি, মানুষের মনটা যে কত বড় জিনিষ, এত
বুঝি নি। এই মনই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি ও
কর্ত্তা। তোমার মেজ'বউএর মন ঠিক তাই।

সে দিন আমরা নরেন্দ্রসরোবরের ধারে বেড়াতে গিয়ে
সেখানে একটী অতি সুন্দর মন্দির হয়েছে। তোমরা
মন্দিরের বাগানে বিস্তর আমগাছ আছে। একটা আমগা
অকালেও নতুন লালপাতা গজিয়েছে। তোমার মেজ'বউ
গাছটা দেখিয়ে বল্লে, "দেখেছ নরেন, ঐ গাবগাছে কেম
লাল পাতা বেরিয়েছে।"

আমি বল্লাম—"গাবগাছ কৈ দিদি, ওটা যে আম গাছ!"

দিদি বল্লেন—"আমগাছ, কখনই নয় ; তুমিও এত বড় একটা
াকে প্রতিষ্ঠিত কচ্ছো? আমাদের বাড়ীর দেয়ালের আড়ালে
মতন একটা গাবগাছ আছে, তার এই যৌবনের সাজ
খে আমি বসন্তের সংবাদ পেতাম। আর তাকেই কি না তুমি
তে চাও, আমগাছ?"

আমি তো একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে বল্লাম,
কটু কাছে গিয়ে দেখুন, ওটা যে আমগাছ তা বুঝতে
বেন।"

তোমার মেজ'বউ আরো গরম হয়ে উঠে বল্লেন—"কাছে গেলেই
সত্য দেখা যায়? অন্ধেরা তো হাতিটাকে গিয়ে হাতড়িয়ে-
কিন্তু তাকে সত্যিই দেখ্‌তে পেয়েছিল কি? দেখে চোক
ন, আর মনের নিকটে আবার কাছে আর দূরে কি? তুমি
চোখে ওটাকে আমগাছ ভাব্‌লে, আমি বুঝতেই পাচ্ছি না।
দি আমগাছ হবে তবে তার ডালে ডালে কোকিল কৈ?
গায় ভৃঙ্গ কৈ? আকাশে আকাশে কুহু কুহু কৈ? ঘরে
উহু কৈ? কেবল লাল পাতা দেখে ওটাকে আমগাছ
লালপাতা যে গাবগাছেও হয়।"

তিক দেখে বল্লাম, "তুমি যখন বল্‌ছ, তখন গাবই বা
দি,

বই বা হবে কেন, গাবই নিশ্চয়। ওটা যদি গাব না হয়
বির দৃষ্টি কি মিথ্যা হবে?"

বল্লাম—"কখনওই হতে পারেনা। বিধাতা যে কবির
তাঁর জগতকে দেখেন। তিনিও ত কবি।"

গুলি ধর্ম্মকথা বলে তবে প্রাণে বাঁচলাম। এবার থেকে
মেজ'বউ যখন যা বল্‌বে, তা'তেই হুঁ দিয়ে যাব।

৪।

বউ দিদি,

আমার ছুটি তো ফুরিয়ে আস্‌ছে, আর কতদিন তোমার মে
বউকে পাহারা দিতে হবে? তোমার মেজদাদাকেই না
পাঠিয়ে দাও, গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। যে কবি
ঢেউ উঠ্‌ছে, তাতে তোমার মেজবউকে কোথায় নিয়ে যা
বলা যায় না। আর আমাকে পরের স্ত্রীর পাহারা দিতে পা
তোমার ঘরেও যে খুব শান্তি পাচ্ছ, তাও ত সম্ভব নয়।
একবার নাকি আমি আগুণের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবার ফ
শিখেছিলাম, ঐ যা তোমাদের ভরশা।

সত্যি বল্‌ছি আমার ভাব্‌না হয়েছে। তোমার মেজ'বউকে
একমাসকাল দিনরাত দেখে দেখে, এতটাই চিনেছি বলে
হয় যে, বাহিরে তাঁর যতই কবিতা গজা'ক না কেন, ভিতরে
আছে। সে ভাবনা আমার হয় না। তবে জান কি, ভিত
থাক্‌লেই যে বাহিরে কালির ছিটা পড়ে না বা পড়তে পা
তা নয়। ঐ ভয়টাই আমার বড় বেশী হচ্ছে। অথচ হা
করে যে বেচারীকে বাঁচাই, ভেবে পাচ্ছি না। তারই জন্য ছে
লিখ্‌ছি। নহিলে তোমাকেও লিখ্‌তাম না;—এ সব কথা
কেই বলা ভাল নয়। বলাবলিতেই যত গোল বাধে।

আমার আরো বেশী বিপদ হয়েছে এই জন্য যে শরৎ
কল্‌কাতায় চলে গেছে। বাড়ীতে তোমার মেজ'বউ একটি
চাকরাণী আর আমি, আমরা তিন প্রাণী মাত্র আছি। তা
আমি ভাব্‌তাম না। কিন্তু শরৎটা নাকি নেহাৎ গাধা
সপ্তাহ খানেক আগে একটা সাহিত্যিক বন্ধুকে এনে জুটি
গেছে। এব্যক্তি নিতান্ত ছোক্‌রা নয়, বয়স তোমার মে
মতন। বল্‌ছে ত যে বিলেত টিলেত ঘুরে এসেছে, কিন্ত

লেখার কথাটা বিশ্বাস কর্‌তে মন উঠে না। তবে ইংরেজ কবিদের
ড়া হামেষাই মুখে লেগে আছে।
ড়ছ, ইনি তোমার মেজ'বউকে ব্রাউনীং বলে একজন খুব বড় ইংরেজ
আছেন, তাঁর কবিতার তর্জ্জমা করে পড়াচ্ছেন। এখন প্রতি
বিকেল বেলা সমুদ্রের ধারে গিয়ে দুজনে কবিতা পড়েন,
এ গরিব পাহারাওয়ালা দায়ে পড়ে কাজেই সেখানে গিয়ে
বসে ঝিমোয়। আমি মুখ্‌খু লোক,—কেরাণীগিরি করে খাই,
উপরে কোনও দিন জাহাজে চড়ি নি। কাজেই এই সাহি-
ত্যিকের চক্ষে যে অতি নগণ্য হ'ব, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?
তোমার মেজ'বউএর একটা বড় বাহাদুরী দেখতে পেলাম।
যে তাঁর সোদর ভাই নই, তিনি ঘুণাক্ষরেও একথাটা এ
কে জান্‌তে বা বুঝ্‌তে দেন নি। একদিন ও জিজ্ঞেস
—"শরৎ বাবু, আর নরেন বাবু এঁদের মধ্যে বড় কে?"
মেজ'বউ বল্লেন—"নরেনই বড় বটে, তবে পিঠোপিঠি বলে
ছেলেবেলা থেকেই কোনও দিন একে দাদা বলে ডাকে নি।"
শুনে অবধি তোমার মেজ'বউএর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে
যতটা বোকা মনে হচ্ছিল, ততটা বোকা নন। কবিতাই
আর যাই করুন, ভিতরে ভিতরে বিষয়বুদ্ধিটুকু বেশ

৫।

দি,

ওলোকটার পরিচয় জান্‌তে চেয়েছ। এ সব লোকের
ওয়া বড় কঠিন। বাংলা সাহিত্যে আজকাল বড় বড়
যে কি করে গজিয়ে উঠে, ভগবানও তার ঠিক কর্‌তে
না সন্দেহ। কবিতা যেমন এদের আকাশ থেকে
রে পড়ে, এদের জন্মকর্ম্মটাও তেম্নি দিব্য ব্যাপার
য়। এঁকে আমরা কেবল মিষ্টার মৈত্র বলেই জানি।

শরৎকে জিজ্ঞেস করছিলাম এঁর বাড়ী কোথায়, আছে
করেন কি, সে ওসব কথার কোনই উত্তর দিতে পারলে
বল্লে—"ও সব খবর সংসারের লোকেই রাখে। সাহিত্য
মনোজগৎ, ভাবরাজ্য; এখানে জন্মকর্ম্মের পরিচয় কেউ নেয়
রসসৃষ্টির শক্তির প্রমাণপরিচয়ই যথেষ্ট। মিষ্টার মৈত্রের
তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।" এর উপরে ত আর কোনও কথা
না। কাজেই ইহাঁর কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাই নাই,
আশাও রাখি না।

তবে নামগোত্রের পরিচয় না পেলেও, কাব্যরসপটুতার
প্রতিদিনই পাচ্ছি। সে পরিচয়টা তোমাকে দিতে পারি।
বৈকালে বৃষ্টি হচ্ছিল। কাজেই সমুদ্রের ধারে আমরা বেড়াতে
পারি নি। মিষ্টার মৈত্র এখানে বসেই তোমার মেজ'বউএর
সাহিত্য-চর্চ্চা কচ্ছিলেন। ইনি ব্রাউনীংএর একটা বাংলা
কচ্ছেন, তোমার মেজ'বউকে তাই পড়িয়ে শুনাচ্ছিলেন।
ক্রমে এখানেই সে অনুবাদটা ফেলে গেছেন, তার
তোমায় পাঠাচ্ছি।

ওগো সুন্দর মোর!
ও বয়ানে তব, এ নয়ান মম
পিয়ে পিয়ে হলো ভোর।
ওগো সুন্দর মোর!

চোরের মতন কতই চাতুরী,
গুপ্ত প্রেমের কিবা এ লহরী,
নাচত আঁখিতে উঠত শিহরী
সুখের নাহিক ওর!
ওগো সুন্দর মোর!

ঘরের ভিতরে বসে যারা ঐ,
ভাবিছে কাতরে গেল ওরা কৈ,

কৌতুকে কপোল করে থৈ থৈ,
বাহিয়া বাহিছে লোর।
ওগো সুন্দর মোর!

আমরা দুজনে, বিজনে বিপিনে,
নীপ মূলে এই, কিবা নিশি দিনে,
বাঁধা আছি, নতু আঁধোয়া তু বিনে,
কে ভাঙ্গে মোদের জোড়?
ওগো সুন্দর মোর!

তিলে তিলে গড়ি কতেক ছলনা,
পলে পলে পরি শতেক গহনা,
গাহি মূলতান, পূরবী সাহানা,
কাটিছে রজনী ঘোর,
ওগো সুন্দর মোর!

এ সুখ তেয়াগি, কোন্ সুখ লাগি,
কোন মন্ত্র পড়ি, কি সিন্দুর দাগি'
কিইবা সোহাগে, মিলিবে কি ভাগি,
কলা, মোচা, কিবা, থোড়!
ওগো সুন্দর মোর!

আষাঢ় মাসের গুপ্ত অভিসার,
ভৈরব ঐ নৃত্য বরিষার,
মর্ম্ম বিদারি এ ঘর্ম্মের ধার,
চর্ম্মে ঝুরিছে ঝোর!
ওগো সুন্দর মোর!

ছাড়িয়া এ সব বিভব ছন্দে,
ন ঘুরিয়া ফিরিয়া ভবের ধন্দে,

কোন্ রূপে রসে, গন্ধাশে গন্ধে
আনিবে আনন্দে তোর?
ওগো সুন্দর মোর!

থাক্ তারা নিজ জগত্ লইয়া
রান্ধিয়া বাড়িয়া, খাইয়া, শুইয়া,
জীবনে মরিয়া, মরমে মারিয়া
কেবলি ঘাঁটিয়া হোড়!
ওগো সুন্দর মোর!

জান নাকি তুমি উহাদের রীতি,
যশমান দিয়া কষয়ে পিরিতি
ঝগড়া-ঝাটি হয় নিতি নিতি
ভাঙ্গাতে ভামিনী ভোর
ওগো সুন্দর মোর!

নাহি সুতা হাতে, হলো কিবা তায়
ও রীতি দেখিলে পিরিতি পালায়?
দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পরাণ-ডোর।
ওগো সুন্দর মোর!

দাদাকে বলো, এর মূলটা ব্রাউনীংএর In A Ba[illegible] কোথাও নাকি আছে। মূলের সঙ্গে মিলুক আর না[illegible] অনুবাদের বাহাদুরী আছে বটে। আর সব চাইতে এর [illegible] এই যে তোমার মেজ'বউকে এ কবিতাটায় একেবারে [illegible] তুলেছে। তিনি বারবার এসে আমায় বলছেন "দে[illegible] দেখ, দেখ, কি সুন্দর শুনাচ্ছে—

দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পরাণ-ডোর—

লেখার কি ভঙ্গী, ভাবের কি গভীরতা। বাংলায় এক রবি ঠাকুর [illegible]ড়া আর কেউ অমন লিখ্‌তে পারে না। তুমি ত ব্রাউনীং [illegible]ড়ছ, ব্রাউনীং সত্যি কি এত মিষ্টি।" এর উত্তর আমি কি আর [illegible] আমার কেবল ইচ্ছা হলো বউদিদি, ঐ মিষ্টার মৈত্র-[illegible] আমার এই জিমন্যাষ্টিকপটু মুষ্টিটা যে কত মিষ্টি তাই [illegible]রেয়ে দি। সত্যি বল্‌ছি বউদিদি, এ লোকটা যদি শিগ্‌গির [illegible] না পড়ে, তবে কোন্ দিন যে আমার সঙ্গে একটা ফৌজদারী [illegible] যাবে জানি না।

৬।

[illegible]দি।

[illegible] যা ভয় কচ্ছিলাম, তাই হয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলা জুতিয়ে [illegible] লোকটার হাড় ভেঙ্গে দিয়েছি। বোধ হয় সে আর এখানে [illegible] দেখাতে সাহস পাবে না। আজকের এই জুতাপেটাটা কেউ [illegible] না, কেবল আমার হাত জানে, আর জুতা জানে, আর [illegible]ঠ জানে, আর কেউ জানে না; তোমার মেজ'বউও ভাল [illegible] জানেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি [illegible] যদি পুরীর সমুদ্রের ধারে দেখ্‌তে পাই, তবে সবার [illegible] জুতাপেটা করে ছাড়্‌ব। সে পায়ে ধরে দিব্যি করে [illegible] আজ রাত্রেই পুরী থেকে চলে যাবে। আমার বিশ্বাস [illegible]বে।

[illegible] হলো, কিসে হলো, আমার নিজের মনে মনেও তার [illegible] করতে ইচ্ছা হয় না; ভয় হয় বুঝিবা এ চিন্তাতেও [illegible] মেজ'বউএর অকৈতব শুদ্ধ চরিত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। [illegible]মাকে না বল্লে নয়। তোমার মেজ'বউএর প্রাণে যে [illegible] লেগেছে, তার ফল কি যে হবে, ভেবে পাচ্ছি না। [illegible]রে রাতে সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ না দিলে বাঁচি। দিনরাত [illegible]ন তাঁকে খাড়া পাহারা দিতে হ'বে দেখ্‌ছি।

ঘটনাটা তোমায় লিখ্‌তেই হচ্ছে, কিন্তু আমার আদৌ ইচ্ছ
নয় যে দাদাও এটা জানেন। আমরা পুরুষ মানুষ, স্ত্রী-চরিত্র
কিছুই বুঝি না, বউদিদি! তাই ভয় হয় দাদাও তোমার মেজ
সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারবেন না। যদি পার, তবে তাঁ
দেখিও না, তোমার মেজদাদার ত কথাই নাই। এই পত্র
পড়িয়াই পুড়াইয়া ফেলিবে।

ঘটনাটা এই। কাল রাত্রে আমার একটু সামান্য জ্বর হয়েছি
তাই আজ সন্ধ্যার সময় আর সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই
মিষ্টার মৈত্র এসে অনেক অনুনয় বিনয় করাতে তোমার মে
তাঁর সঙ্গেই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেন। আমায় বলে
যে বেশী দূরে যাবেন না, বাড়ীর সাম্‌নেই বেড়াবেন। তখন
রোদ পড়েছে। আমি দরজায় বসে দুজনায় বেড়াচ্চেন দে
লাগলাম। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল। কাজেই আমি আর
থাক্‌তে পারলাম না। তোমার মেজ'বউএর খোঁজে বেরুলাম।
তীরে গিয়া দেখ্‌লাম তিনি সেখানে নাই। ভারি মুস্কিলে পড়
কোন্‌দিকে গেলেন ঠাওর করতে পারলাম না। কা'কেই বা
করি? এমন সময় একটী পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা
তিনি বল্লেন—"আপনি যে আজ বড় পিছিয়ে পড়েছেন,
ভগিনী চক্রতীর্থের দিকে যাচ্ছেন দেখলাম।" শুনে কি জ
আমার বুকটা ধড়াশ করে উঠল। চক্রতীর্থ ত দো
নয়। স্বর্গদ্বার চক্রতীর্থ দেড় ক্রোশের পথ। আর সন্ধ্যা
অতি নিরালা স্থান। আমিও ঐদিকেই বালি ভেঙ্গে
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়্‌তে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রতীর জ
হয়ে পড়েছে। সারকিট্ হাউস ছাড়িয়ে দেখ্‌লাম, আর
কেউ নাই। হঠাৎ যেন একটা অস্ফুট চীৎকার কা
সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়া দেখলাম, ঐ লোক
মেজ'বউকে অপমান করবার চেষ্টা কচ্ছে। আমি

উপরে পড়ে তোমার মেজ'বউকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার গলার
ষে ধরে, পায়ের জুতা খুলে, গায়ে যত জোর ছিল তাই
বেটাকে পিটুতে আরম্ভ করলাম। যখন ও একেবারে
ত পড়ে গোঁগাতে লাগ্‌ল তখন ছাড়্‌লাম। তোমার মেজ'বউ
আরে পাথরের মত নিশ্চল, অসাড় হয়ে এই ব্যাপার দেখ্‌-
র। আমি কাছে যাবা মাত্র, মাটিতে পড়ে উপুড় হয়ে
ি লাগলেন। তোমার মেজ'বউ একটু সুস্থ হলে, তাঁকে নিয়ে
ল এলাম। ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায়, ভয়ে, অনুতাপে, তাঁর
কি হয়েছে বল্‌তে পারি না। এই আধ ঘণ্টা কালের
র মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেছে, চোক বসে গেছে,
য় যেন ছ মাসের রোগী। হঠাৎ মানুষের চেহারার অমন
ন হয়, ইহা জন্মে আর কখনও দেখি নাই। বাড়ী আসিয়া
মেজ'বউ ঘরে যাইয়া দোরে খিল দিয়া শুয়ে পড়েছেন।
কি করব, ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না। যে ঝিটী
তাকে কোন কথা বল্‌তেও পারি না, নিজে যাইয়াও তাঁর
ষা কর্‌তে পাচ্ছি না। হয়ত এই চিঠি পেতে না পেতেই
খানে আসবার জন্য আমার টেলিগ্রাম পাবে। কাল প্রাতঃ-
অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

৭।

ও দি,

বাঁচালেন। শরৎ আজ প্রাতে ফিরে এসেছে। তা'কে
াপারের কথা কিছুই বলিনি। বলা যায় কি? সে ভাবছে
অসুখ করেছে। অসুখও করেছে সত্যি। খুব জ্বর
াথার খুব যাতনা। বিকার না হলে বাঁচি। দেখি
রেন। দাদাকে তোমার মেজ'বউএর অসুখের কথাটা
বাড়াবাড়ি হলে আস্‌তেই হ'বে। তারে খবর দিব।

৮।

বউ দিদি,

ঠাকুরের প্রসাদে আজ সাতদিন পরে তোমার মেজ'বউএর জ্বর ছেড়েছে। চেহারাটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে, সে রং নাই, কোনও কিছুই নাই। চোখের ভিতরে কি যেন একটা কাতরতা উঠেছে। আজ বিকাল বেলা আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলে "শরৎ কোথায় ?" আমি বল্লাম—"কিছু আঙ্গুর আর ডালিমের বাজারে গেছে ; আর কলকাতা থেকে কিছু ফল আস্‌বার কথা এসেছে কিনা, দেখ্‌তে ষ্টেষনে যাবে।" তখন আমাকে কাছে বিছানায় বসিয়ে, আমার হাতখানা ধরে বল্লেন—"নরেন, তুমি সত্য ভাইএর কাজ করেছ, তুমি না থাক্‌লে সেদিন আমা হ'তো জানি না। প্রথম দিন থেকেই আমি যে চোখে শ দেখ্‌তাম, সেই চক্ষে তোমায় দেখেছি। তাই শরৎ যখন কল যেতে চাইলে, কোনও আপত্তি করি নাই। শরৎ আমার করতে পারত না, তুমি তাই করেছ, এ ঋণ জন্মে শো পারব না।" বলিতে বলিতে চক্ষু দুটা জলে ভরিয়া ক্রমে নিজকে একটু সামলে নিয়ে বল্লেন—"শরৎ সব শুনে

আমি বল্লাম "না। কিছুই শুনে নি। ওকি বলবার শরৎ কেবল জানে যে আপনার অসুখ করেছে।"

"শরৎ তো আমায় 'আপনি' বলে না, তুমি বল কেন

বউদিদি আমারও চক্ষে জল আসিল। একটু স্নেহের প্রাণটা যে কতই তৃষিত হয়ে আছে, দেখে আমার প্রাণট করে উঠ্‌ল।

বল্লাম "আচ্ছা আমি এখন থেকে তুমিই বল্‌ব। অ শরৎকে যেমন কথন' তুমি কথন' তুই বল, আমাকে বল্‌বে ?"

"আমার অসুখ বাড়্‌লে তোমরা কি করতে বল ত

"করব আর কি, ভাল ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতাম।"

"এখানে কি ভাল ডাক্তার আছে।"

"এখানে নাই, কটকে আছে।"

"সেখান থেকে কি এখানে ডাক্তার আসে ?"

"আনালেই আসে।"

"আমার ত অত টাকা নাই।"

"যে ডাক্তার আস্‌ত সে টাকার জন্য আস্‌ত না।"

"তবে কিসের জন্য।"

"আমি আমার দিদি, তারই জন্য আস্‌ত।"

"ডাক্তার তোর কে হয় নরেন ?"

"তিনি আমার দাদা, কটকের সিভিল সার্জ্জন।"

"তোমার দাদা, কটকের সিভিল সার্জ্জন! তোমার দাদার ?"

"দাদার নাম বল্লাম। তোমার মেজ'বউ অমনি চমকে বল্ল, "উনি তোর দাদা!" এই বলে চোখ দুটো আবার দ হয়ে উঠ্‌ল। এবার আমার পালা ; বল্লাম—"আমার কি তবে তুমি চেন ?"—একটু তামাসা করে বল্লাম—ভাব দেখে মনে হচ্ছে বুঝি বা কোনও দিন আমার তোমার সম্বন্ধ হয়ে ছিল।" তোমার মেজ'বউ বড় বল্লে ;—"উনি আমার নন্দাই ছিলেন।"

"মানে কি, দিদি ? দাদার ত দুটো বিয়ে হয় নি, আর দিদি তো এখনও বেঁচে আছেন।"

"বউ দিদিই আমার ননদ।"

"তুমি আমার দাদার শালাজ, আর এতদিন এই কথাটা খছিলে।"

"যে ওঁর ভাই, আমি জান্‌ব কি করে ?"

"টেই। যা হোক, এখন ত জানা শুনা হলো। আজই

আমি বউদিদিকে আস্‌তে লিখ্‌ব। কটক থেকে পুরী দু'তিন ঘ
পথ বই ত নয়।"

"না, না, তাকে লিখিস্ না। সে আস্‌বে না।"

"আস্‌বে না? তাঁর ভা'জ এখানে বেয়ারাম হয়ে পড়ে অ
আর উনি আস্‌বেন না, অসম্ভব কথা। আমার বউদিদি
লোক নন। আর বউদিদিকে লিখ্‌ব তাঁর দাদাকেও যেন তারে
দিয়ে আনিয়ে নেন।"

তোমার মেজ'বউ আর ধৈর্য্য রাখ্‌তে পাল্লেন না।
আমার দু হাত ধরে বল্লেন—"না ভাই নরেন, তোর পায়ে
অমন কর্ম্ম করিস্ না। আমি রাগ করে বাড়ী থেকে
এসেছি, তাদের আর এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না।"

"শরৎ বলেছে তুমি তোমার খুড়িশ্বাশুড়ীর সঙ্গে জগন্নাথ
এসেছিলে, রাগ করে এসেছ কে বল্লে।"

"কেউ বলে নি, আমি ত জানি।"

"তোমার মনের কথা ত আর কেউ জানে না।
জানে তুমি জগন্নাথ দেখ্‌তে এসেছিলে। এখন বাড়ী ফিরে
তাতে হলো কি?"

"উনি জানেন।"

"তা হলে এতদিন যে উনি তোমায় নিতে আসেন
জন্য মিষ্টার মৈত্রের যে ব্যবস্থা করেছিলাম, তাঁরও সে
করব।"

"নরেন তুই আমায় ভালবাসিস্ বলে ওসব বল্‌ছি
জানিস্ না, আমি কি করেছি। আমি তাঁকে ত্যাগ ক

আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লাম। "ত্যাগ
করে? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ডাইভোর্স নাই তা কি জা

"ডাইভোর্স কিরে?"

"মুসলমানেরা যাকে তালাক বলে, ইংরেজেরা

র্স বলে। হিন্দুর স্ত্রী যে স্বামীকে তালাক দিতে পারে
"

"কিন্তু আমি ত করেছি তাই।"

"করেছ কি, খুলেই বল না, দেখি।"

"ওঁকে লিখেছি, আমি আর ওঁর স্ত্রী নই।"

"ঐকথা! সব স্ত্রীই ত রাগ করে ওকথা বলে।"

"ঝগড়ার মুখে ওকথা বলিনি, কোনও দিন ওঁর সঙ্গে আমার
হয় নি। তাই বুঝি ছিল ভাল।"

"তবে কি করেছ?"

"আমি তাঁকে শান্তভাবে, ঠাণ্ডা হয়ে, চিঠি লিখেছি যে আমি
স্ত্রী নই।"

"আবার একটা বে করতে বল নি ত?"

"তা বল্‌তে যাব কেন? তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি করবেন। সে
আমার নয়।"

"হুঁ দেখ, তুমি তাঁকে ছাড়নি; ছাড়্‌লে তাঁর বিয়ের কথায়
হয়ে ওঠ কেন?"

"না নরেন, সত্যি আমি তাঁকে ছেড়েছি।"

"তিনিও কি তোমায় ছেড়েছেন?"

"আর ছাড়ার অপেক্ষা ত আমি রাখি নি।"

"তিনি যদি না ছাড়েন।"

"তাও কি হয়, আমি যে তাঁকে ছেড়েছি।"

"হিন্দু স্ত্রীতে অত সহজে ছাড়াছাড়ি হয় না, দিদি। যে
রেজিস্টারের কাছে রেজিস্টারী করে বিয়ে হয়, সে দেশে আবার
সেই কাছে গিয়ে রেজিস্টারী থেকে নিজেদের নাম খারিজ
করা পারে। হিন্দু তা পারে না। জান না দিদি, সাত পাক
ঘুরে হয়, চৌদ্দ পাকেও তা খোলে না।"

"আমি যে ওঁকে ছাড়্‌লাম বলে লিখেছি।"

"লিখেছ তাতে হলো কি? ছেলেটা বেশী বিরক্ত কর
মা যে কতবার বলে মর, মর; তাতে কি আবার সেই ছে
বুকে টেনে রাখে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, রাগের মা
মানুষ যা বলে তাতে মিথ্যা বলার পাপ হয় না।"

"আমি যে কি করেছি তুই জানিস্‌নে নরেন, নইলে অমন
ভাব্‌তে পার্‌তিস্ না"

"কি করেছ? ঝগড়াঝাটি করনি; মারধর করনি; এ
চিঠি লিখেছ বই ত নয়?"

"সে চিঠি দেখলে ওকথা কইতিস্ না। চিঠিখানা যে
ঐ বাক্সের ভিতরে তার নকল রেখেছি। বের করে নে।"

চিঠিখানা পড়ে বল্লাম, "এই ত, অমন চিঠি আমরাও
পাই। তাতে হয়েছে কি?"

এমন সময় শরৎ এসে হাজির হলো।

বিকাল বেলা তোমার মেজ'বউএর আর জ্বর আসে নি।
কার ডাক্তার বল্লেন, আর জ্বর হবে না। এখন ওঁকে
পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯।

বউদিদি,

আজ একটা খুব নতুন খবর আছে। বিন্দু বলে যে
আত্মীয়স্বজনদের অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছে শুনে তোমা
বউএর এই বিরাগ হয়েছিল, সে মরেনি। শরৎ কলকা
সে খবর নিয়ে এসেছে। বিন্দু নিজেও তোমার মেজ'ব
দিয়েছে। কি সামান্য ভুল ভ্রান্তি ধরে কত বড়
(মাপ কর বউদিদি, ট্র্যাজেডির বাঙ্‌লা আমি জানি
হতে পারে, এই ঘটনায় তাই বুঝ্‌লাম। বিন্দু মরে
বিন্দুর শ্বশুর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গিয়েছিল। তাই সে
আর একটা বাড়ীতে খোঁজ করতে গিয়ে জানে, সে

কাপড়ে আগুণ লাগিয়ে স্নেহলতার মতন আত্মহত্যা করেছে।
খবর নিয়ে এসেই ত যত গোল বাধিয়েছে। বিন্দু কেবল
নি তা' নয়, এখন অতি সুখে আছে। তোমার মেজ'বউকে
যে চিঠি লিখেছে, সেখানা নকল করে দিলাম, পড়ে দে'খ।
করো না, বউদিদি, বিন্দু যে প্রথমে অতটা গোল বাধিয়ে
ছিল, তা তোমার মেজ'বউএর শিক্ষারই গুণে, তার নিজের স্বভাব-
ষ নয়। তোমার মেজ'বউ নিজে এখন এটা বুঝেছেন, নইলে
ওকথা কইতাম না। বিন্দু সর্ব্বদাই নিজেকে বড় নিষ্পীড়িত
করত। তোমার মেজ'বউই এভাবটা তার প্রাণে বেশী করে
য়ে দেন। আর যে আপনাকে সর্ব্বদাই নির্য্যাতিত ও নিষ্পীড়িত
, তার দ্রোহিতা অবশ্যম্ভাবী। সব বিদ্রোহীর ভিতরকার কথাই
বিন্দুর কথাও তাই। তোমার মেজ'বউএর কথাও তাই।
এখন এরোগমুক্ত হয়েছে; তোমার মেজ'বউও ঠাকুরের কৃপায়
গ্যের পথে দাঁড়িয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিন্দুর পত্র

শ্রীচরণেষু,

দি আমি মরি নাই। তোমরা যে খবর পেয়েছিলে সেটা
থা। আমি যে দিন আবার আমার শ্বশুরবাড়ী ফিরে আসি,
দিন পরে, আমাদের পাশের বাড়ীতে একটী বউ কাপড়ে
ন দিয়ে আগুণ ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। তারও নাম বিন্দু
ওরা আমাদেরই জ্ঞাতি। তারও এই দু'তিন মাস আগে
এরই জন্য আমিই মরেছি বলে কথাটা রটে যায়। দিদি,

আমি মরি নি। আর এমন সুখে আছি যে মরবার কোন
আমার আর নাই।

ঐ মেয়েটা যখন পুড়ে মরে, আমি দেখেছিলাম। অ
শোবার ঘরের পাশেই ছাদ, আর তার পরেই ওদের ছাদ।
রাত দুপোর হবে। আমরা তার চীৎকারে জেগে উঠে,
বাহিরে গিয়ে দেখি, মেয়েটার চারদিকে দাউ দাউ করে
জ্বলে উঠেছে, আর সে "বাবা গো, আমি মরবো না, আমি মে
না"—বলে বিকট চীৎকার কচ্ছে। তার মুখের সে ছবি অ
প্রাণের ভিতরে কে যেন ঐ আগুন দিয়ে দেগে দিয়েছে।
মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটে, এত ভয় হয়। আমি ঐ
একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। উনি আমাকে কোলে করে
এনে বিছানায় শুইয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে, সারা রাত
করে, কত রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার ঐ ভয়টা তাড়াতে
করেন। আমি শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়্লাম; আর উনি,
ভয় পেলে মা যেমন তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ঘুমাতে
তেম্নি করে সারারাত জেগে আমার গায়ে হাত রেখে,
মাথায় বাতাস করে, পাহারা দেন। ভোর বেলা চোখ
দেখি, এইভাবে বসে আছেন। দিদি, তোমার আশীর্ব্বাদে
বড় সুখে আছি।

তুমি আমার দুঃখ অনেক দেখেছ, আমার সঙ্গে সঙ্গে
কেঁদেছ, আমাকে মার পেটের বোনের মতন ভাল বেসেছ
আমি তার আগে অমন আদর ও ভালবাসা পাই নাই
তুমি অমন করে ভালবাস্তে বলেই আমার বিয়ে কর
অনিচ্ছা ছিল। তোমার ঐ আদর ছেড়ে পরের বা
একেবারেই মন চাইল না। তাই তোমার পায়ে ধরে অ
ছিলাম, বলেছিলাম আমায় বিয়ে দিও না, দাসী করে
কাছে রাখ। আমার রূপ নাই জান্তাম। সবাই বল

মেয়ের কি আবার ভাল বে হয়? আমার বাপ মা নাই।
কড়ি নাই। শুন্তাম একরাশ টাকা নইলে কোনও মেয়ের
না। তাই আমার যখন বিয়ের সম্বন্ধ এল, তখন ভাব্লাম
ভিতরে অবশ্য একটা কিছু ভারি গলদ আছে; নইলে
কাল মেয়েকে, অমন মাবাপখেগো গরিব মেয়েকে বিয়ে কর্তে
রে? তাই ভয় হচ্ছিল, কোথায় যাচ্ছি। মনে মনে ভাব্লাম
কাল মেয়েকে যে বিয়ে কর্তে রাজি হয়, না জানি সে কত
ল। আমার মনের কথা কেউ জানে না, দিদি, কেবল এই
তোমায় বল্ছি। তোমায়ও এসব কথা কোনও দিন কইতাম
ঠাকুর আমার ভাগ্যে এত সুখ না লিখ্তেন। সুখ পেয়েছি
আজ দুঃখের কথা কইতেও আমার সুখ হয়। কি বল্ছিলুম?
আমার বের রাতের কথা। মনে মনে আমার স্বামী
কুৎসিত হবে ভেবে রেখেছিলুম বলে, শুভদৃষ্টির সময়
র করে চোখ দুটাকে চেপে রেখেছিলুম। ছেলেবেলা
াতে ঘরের বাহিরে গেলে ভূতের ভয়ে যেমন চোখ বুজে
তেমনি করে চোখ বুজে রইলাম। তার পর বাসর ঘরে
ার ভয় আরও বেড়ে গেল। গল্প শুন্তাম বাসর ঘরে কত
কে, কত রং তামসা হয়, আমার বাসরে সে রকম কিছুই
। একজন বুড়ী আমার হাত ধরে নিয়ে বিছানায় বসিয়ে
গেল। তার পরে উনি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন।
আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বিছানার
কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। একবার তিনি আমার হাত
ধরলেন, তার পরেই ছুড়ে ফেলে গর্‌গর্ কর্তে কর্তে
, আর সারা রাত ঐরূপ গর্‌গর্ করে পাইচারি করে
মাঝে একবার মনে হল যেন, অনেকগুলি কাচের
ছুড়ে ফেলে চুরমার করে ফেল্লেন। আমি বুঝ্লাম,
াল। তার পর দিন যখন খেতে বসেছি, অমনি তেড়ে

একেবারে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; আর ভাতের থালা
ফেলে, উনুনে জল ঢেলে, হেঁসেলের ভাতবেন্নুন সব জুতো
পায় লাথি মেরে চারিদিকে ছড়িয়ে চলে গেলেন। আমি দেখে
ভয়ে ভয়ে প্রাণের দায়ে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম। অ
পর কি হলো, তুমি জান। তুমি আমায় রাখ্‌তে চেয়েছিলে।
আমার ভাশুর যখন নিতে এলেন, তখন দেখ্‌লাম তোমাদে
হ'তে পারে, তাই তাঁর সঙ্গে ফিরে গেলাম। এবারে গি
সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি। আমি চলে এসেছি শুনে
বাড়ী ছেড়ে চলে যান। তার পর যখন শুনলাম, আবার
এসেছেন, তখন আবার আমার পিত্তি শুকিয়ে গেল। তাই
পালিয়ে আমার খুড়্‌তাত ভাইদের ওখানে যাই। ওরা যখ
তেই স্থান দিলে না, তখন কাজেই আবার ফিরে আস্‌তে
আমার গাড়ী যখন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখ্‌লা
নতুন লোক আমাকে গাড়ীর দরজা খুলে তুলে নিলেন
ভাব্‌ছিলাম আমার শ্বাশুড়ী বা বাড়ীর ঝিচাকরাণী বু
এসে দরজা খুল্‌ল; তাই নিঃশঙ্কোচে তার মুখের দি
দেখ্‌লাম। দিদি, দেখলাম একজন অতি সুন্দর পুরু
মুখ, তেমনি রং, যেমন কোঁকড়া কাল চুল, তেমনি
টানা চোখ, যেমন নাক তেম্নি সব। পুরুষের
জন্মে দেখিনি। মিথ্যা বল্‌ব না, দিদি, দেখেই মনে হ
কপাল! অমন স্বামি যদি আমার হ'ত! আমি
পিছু অন্দর মহলে ঢুক্‌লাম। তখন ইনি ডেকে
তোমার বউ এসেছে, আমার ঘরেই নিয়ে যাচ্ছি।"
আমার সর্ব্বাঙ্গ কেমন করিয়া উঠিল। পা যেন আর
শরীরটা যেন হঠাৎ ভারি হয়ে পড়্‌ল। মনে হলে
ভেঙে পড়্‌ছি। তখন তিনি আমার হাত ধরে একে
শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। যত্ন করে বিছানায় বস

াড়িয়ে বাতাস কর্‌তে লাগলেন। তার পর বল্লেন—অমন
ব জন্মে আমার সঙ্গে আর কেউ কথা কয়নি, দিদি,
করো না, তুমিও কইতে পারনি—"একবার এদিকে এস।"
যেন পুতুলবাজির পুতুল সেজেছি। অমনি ধীরে ধীরে
রি সঙ্গে গেলাম। বারান্দায় একখানা কাঠের চৌকি ছিল,
রসেখানে বসালেন। তার পর নিজে একঘড়া জল এনে
া ধু'তে দিলেন। আমি লজ্জায় মরে যেতে লাগ্‌লাম,
া দিবার শক্তি ছিল না। আমাকে হাতে মুখে জল দিতে
নিজে দাঁড়িয়ে সে জল ঢেলে দিলেন। তার পরে আবার
স, নতুন বাণারসী শাড়ী বের করে বল্লেন, "কাপড় ছাড়,
ফুলশয্যার জন্য এখানি এনেছিলাম, আজই তোমার
" এই বলে বারান্দায় গেলেন। আমি সেই শাড়ীখানি
তে পল্লাম। হাত পা কিছুই যেন আর আমার নিজের
আমার কাপড় ছাড়া হলে, এক বাক্স গহনা বের করে,
দেওয়া গহনাগুলি একে একে খুলে ফেলে, নিজের হাতে
, অনন্ত, চিক, ইয়ারিং পর্য্যন্ত পরিয়ে দিলেন। কতক্ষণ
গহনা পরাতে লাগ্‌ল, বল্‌তে পারি না। এক এক
পরাচ্ছেন, আর অনিমেষে ক্ষানিকক্ষণ সে অঙ্গটাকে
এক এক বার মনে হতে লাগ্‌ল, বুঝি এ ব্যক্তি সত্যি
। আবার মনে হতে লাগ্‌ল, দুনিয়ার সব ভাল
তে আমার এ পাগলই ভাল, এ পাগলকে গলায় বেঁধেই
সব গহনা পরান শেষ হলে আমার মুখখানি তুলে
র তখন চোখ বুজে থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু
চোখ তা কল্লে না, চার চক্ষে মিলন হলো। এই
ষ্টি। দিদি, আমার চোখ জলে ভরে আস্‌ছে, আমি
মি নাকি কুৎসিত, তবু ওঁর চক্ষে বুঝি বা আমিও
ইলে ও চোখ আমায় দেখে অমন হয় কেন?

দিদি, ইনি পাগল নন। ছেলে বয়সে একবার বড় ম
খেতে আরম্ভ করেন, তারই জন্য মাঝে ক'দিন একটু ক্ষেপে উ
সত্য। কিন্তু সে প্রায় দশবার বছরের কথা। এখন
পর্য্যন্ত ছোঁন না। তবে বড় বদ্‌রাগী লোক। রাগলে জ্ঞ
না। আর, দিদি, যে রাগতে জানে না, সে ত পাথর
ভালবাসতেই জানে? জান কি, আমায় বে কল্লেন কেন?
মেয়েটা যখন আত্মহত্যা কল্লে, ঐ কথা শুনে তিনি প্রতিজ্ঞ
যে, যার কোনও রকমে বরপণ দিবার সম্বল নাই, তেমন বা
না পেলে বে কর্‌বেন না। তাই খুঁজে খুঁজে ঘটকী আ
কল্লে। এ বিয়েতে তাঁর বাপমায়ের বড় আপত্তি ছিল
প্রথমে টাকা খুঁজছিলেন। যখন ছেলে পণ নিয়ে বে ক
কোট করে বস্‌লো, তখন আর কিছু না হউক যার দুপয়
বারমাসে তের পার্ব্বণে তত্ত্ব পাঠাতে পার্‌বে, এমন ঘরের
করুন, তাঁরা তাই চাচ্ছিলেন। কিন্তু উনি এতেও নারাজ
তাতেই বাপ বেটাতে ঝগড়া হয় ও বাপ ছেলের বিয়েতে
বলে কাশী চলে যান। আমার শাশুড়ী বাড়ী ছেড়ে গেলেন
কিন্তু আমি যে কুলীনের মেয়ে এ অপরাধটা ভুলতে প
তারই জন্য আমাকে হাড়ীবাগ্দীর মেয়ের মতন পিতলে
ভাত দিয়েছিলেন। হয় ত ভেবেছিলেন, অতি গরীবের ঘ
তাতে আবার বাপ মা নাই, এরূপেই বুঝি আমি লালিতপা
তারই জন্য উনি অমন রেগে উঠেছিলেন। মাকে ত আ
বল্‌তে পারেন না, তাই কতকটা আমার উপর দিয়ে, ত
থালাবাসন ও হাঁড়ীকুড়ির উপর দিয়ে সে রাগটা চা
আর উনি যে সব গহনা দিয়েছিলেন, ওঁর মা আমায়
দেন নি বলে বিয়ের রাতে অমন করে রেগে গিয়েছিলে

দিদি, আমি ভাবি, তোমরা যদি আমায় সত্যি
আমার খুড়তুত ভাইয়েরা যদি আমায় স্থান দিত,

যেখানেই হউক আমার মিল্‌তই,—তাতে আমার কি সর্ব্বনাশই
অমন দেবতার মতন স্বামীকে পেতাম না। আর স্বামীকে
ই বলে, শ্বশুর, শাশুড়ী সবাইকে পেয়েছি। ভাশুর, যা,
পো, ভাশুর-ঝী, সকলে আমার কতই আপনার হয়ে গেছে।
আমি নিজেকে ওদের সেবায় নিযুক্ত করে, ওদের মাঝে আপ-
ারিয়ে ফেলেছি। এখন আর আমার নিজের কোনও দুঃখ
সুখ আমার উপ্‌চে পড়্‌ছে। দিদি, অনেক দিন তোমার
থা রেখে আমি আমার ছোট্ট দুঃখের কান্না কেঁদেছি, আজ
ধ যায়, ঐ বুকে ছুটে গিয়ে এইবার আমার সুখের কান্না
আমার দুঃখে চিরদিন দুঃখ পেয়েছ, এবার আমার সুখ
সুখী হও।

বলাম আমি মরেছি শুনে তুমি বিবাগী হয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে
আমি যখন সত্যি সত্যি বেঁচে আছি, তখন তুমি আর ঘর
ছেড়ে থাক্‌বে কেন? আর মরেই কি কখনও তোমার দুঃখে
সুখ হতো? স্বামীর কোলে মাথা রাখাতে যে কি সুখ,
তুমি জান। তুমি আমার জন্য এই স্বর্গসুখও ছেড়েছ, শুনে
আমার নিজের সুখ যেন আধখানা হয়ে গেছে। তুমি শিগ্‌গির
এস। তোমায় বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। লক্ষ্মী দিদি
শিগ্‌গির ফিরে এস। আমার কোটী কোটী প্রণাম জানিবে।

তোমারই সেবিকা
বিন্দু।

চতুর্থ অধ্যায়।

মেজ'বউএর পত্র।

ঠাকুর-ঝি,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ঠাকুর-পোর কথা লি
লিখ্‌ব, আমার জন্য সে যা করেছে, শরৎ তা কর্‌তে পার
ভগবান তাকে এনে জুটিয়েছিলেন বলেই তোমার মেজ'বউ
বেঁচে আছে।

আমাকে তোমার ওখানে যেতে বল্‌ছ। আমি কি কর
জান্‌লে এ পোড়ারমুখীর মুখ আর দেখ্‌তে চাইতে না!
দেবতার মতন স্বামী, তাঁকে কতই না অনাদর, কতই না
করেছি। শাস্ত্র মতে আমি পরিত্যক্তা। কারণ অপ্রিয়ভাষি
তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর্‌বে, শাস্ত্রে এই কথাই বলে।

আমি তোমার দাদাকে পরিত্যাগ করেছি। তিনি আমায়
নি, আমিই ছেড়ে এসেছি। আমি তীর্থ কর্‌তে আসি নি, ওট
ছুতা মাত্র। আমি আর তোমাদের সম্পর্ক রাখ্‌ব
এসেছি। স্ত্রীলোকের মনের যে অবস্থা হলে আজকাল তারা
কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরে, আমি সেই মন নি
ছেড়ে আসি। মরতে সাহস হয় নি বলে মরি নি।
আপনি মরে, আমি তা করি নি, স্বামীর ভালবাসাটা
কর্‌বার চেষ্টা করেছি।

ঠাকুর-ঝি, তোমরা সতী সাধ্বী, আমি যে তোমাদের
আমায় মাপ কর। আমি তোমাদের কাছে এ মুখ দেখাতে
স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক, এই প্রার্থনা করি।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঠাকুর-পোর পত্র।

দিদি,

মি ত কিছুতেই তোমার মেজ'বউকে বাড়ী ফিরে যেতে রাজি
পাল্লাম না। তোমাকেই আস্‌তে হবে। তোমার দাদা
সন, আরও ভাল হয়। তোমাদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঠাকুর-ঝীর পত্র।

'বউ,

যখন এলে না, আমরাই তখন যাচ্ছি। মেজদাদাকেও
তিনি রবিবারে এখানে আস্‌বেন। উনিও শালাজকে
যাবেন। তিন দিনের ছুটী নিয়েছেন। আমরা তিন জনে
প্রাতে তোমার দোরে গিয়ে অতিথি হবো। জ্ঞাতার্থে
তি।

সপ্তম অধ্যায়।

আবার স্ত্রীর পত্র।

মলেষু,

র পত্রে জান্‌লাম, এই সোমবারে তুমি এখানে আস্‌বে।
য় পড়ি, এস না—আমিই যাচ্ছি। আমার জন্য এই
করে, এ হতভাগিনীকে আর নতুন করে অপরাধিনী

তুমি এস না বল্‌ছি; কিন্তু তোমার কাছে কোনও
গোপন কর্‌ব না। তুমি আস্‌বে শুনে আমার প্রাণটা
করে উঠ্‌ল, তোমায় বুঝাতে পার্‌ব না। তুমি আস্‌বে
আমি ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছি। নইলে বাকি জীবন হয় ত
করে এই তুঁষের আগুণে পুড়ে মর্‌তে হতো। তুমি আস
বুঝ্‌লাম তুমি তোমার এ কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ
আজ ঈশ্বরের দয়াতে আমার সত্য বিশ্বাস জন্মাল। লো
পাপ করুক না কেন, তিনি যে কাউকে ছাড়েন না,
এ ক্ষমা দেখে তাই বুঝ্‌লাম।

আর, সত্যি বল্‌ছি, ঈশ্বর কে, তা ত আমি জানি না
জন মনগড়া ঠাকুরের পায়ে এতকাল জীবনের সুখদুঃখে
বলেছি, কিন্তু এত দিন পরে আমার সত্য ঠাকুর
পেলাম।

তোমায় যতদিন আমি কেবল আমারি মতন একজ
বলে ভাবতাম, ততদিন আমি আমার সত্য ঠাকুরকে প
আর মানুষ ভেবেইত তোমায় এত অযত্ন, এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য
পনর বছর কাল তোমার ঘর কল্লাম, কিন্তু এক দিনও
পানে তাকাই নাই, কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম
ক্ষুদ্র বুদ্ধির অহঙ্কারই করেছি, তোমার ঐ বিশাল জ্ঞা
তাকাই নাই; আপনার ভোগটাকেই বড় ভেবেছি, তোমা
লক্ষ্য করি নাই; কেবল পাবার জন্যই ছটফট্ করে
দিন তোমায় সত্যভাবে কিছু দিই নাই। এবার
বোঝা মাথায় নিয়ে বুঝ্‌লাম, দিয়েই সুখ, পেয়ে
শাস্তি, ভোগে নয়। যে আপনাকে বড় করে, সেই
যায়, যে নিজেকে ছোট করে, সেই বড় হয়ে
তোমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তোমার সমান হতে গি
ধর্‌তে পাল্লাম না, নিজেকেও রাখ্‌তে পাল্লাম না

কালি মেখে, তোমার চরণের ধুলি হয়ে, তোমাকেও ধরেছি,
ও পেয়েছি। আমি বার বছরের ছোট্ট বালিকা তোমাদের
পরিবারের মধ্যে এসে পড়্‌লাম। কিন্তু তোমাদের বিশা-
ভিতরে আপনার ক্ষুদ্রত্বকে হারাতে পাল্লাম না। লোকে
আমার রূপের কথা, অমন রূপ বাঙ্গালীর ঘরে হয় না—
ারই গর্ব্বে ফেঁপে উঠ্‌লাম। মা বাবা বল্‌তেন আমার বুদ্ধির
মি সেই অহঙ্কারেই ঘট হয়ে বস্‌লাম। তুমি শিখালে
লেখাপড়া, আমি তাই নিজেকে বিদ্বান ভেবে একেবারে টঙ্গে
। অন্য লোক হলে কত ঝগড়াঝাটি হতো। কিন্তু
কদিন একটা কড়া কথা পর্য্যন্ত বল নি। যখন বড়
করেছি, মুখখানা কেবল একটু ভারি হতো। এত করে
কষ্ট দিয়েও আমি যখন যা চেয়েছি তুমি তাই দিয়েছ।
দিন কিছুতে 'না' করনি। 'না' কথাটা বিধাতা তোমায়
ন। বাড়ীর যে যা ইচ্ছা তাই করে, তুমি কোনও দিন
চ্ছার প্রতিরোধ কর নি। আমি ভাবতাম তোমার পুরু-
ভেবে দেখি নি যে, এই দুনিয়ার মালিক যিনি তিনিও ত
বেই চুপ করে বসে আছেন। তুমি ভাইদের মধ্যে সক-
ত বেশী রোজগার কর; তুমি যদি কোনও বিষয়ে কথা
ারে শান্তি থাক্‌বে না। যার যত শক্তি বেশী, যে যত
সে তত চুপ করে থাকে। এই মোটা কথাটা আমি
নি। আমি নিজেকে তোমা থেকে কেবলই আলাহিদা
বলে, তোমার মহত্ব যে কত ও কোথায় তা বুঝ্‌তে পারি
ামার এ দুর্গতি। আমি সব ছোট জিনিষকে বড় করে
তুমি যে অত বড় তা বুঝি নি, তোমাকেও ছোট বলে
এই করে জীবনের এই পনর বছর খুইয়েছি। সব
াতে বসেছিলাম।

ল অপরাধের কথা ত শুন নি। তোমাকে ছেড়ে

এসে আমায় কি অপমান সহিতে হয়েছে, তুমি জান না
দিন যদি তোমার বোনের দেবর নরেন আমার খোজে
অপমান থেকে আমায় না বাঁচাত, তাহলে এই সমুদ্রেই চি
মতন তোমার মৃণাল ডুবে মরিত। অরক্ষিতা স্ত্রীর অঙ্গ প
স্পর্শ করে অনেক স্বামী শুনেছি তাকে আর গ্রহণ ক
অপরের কথা কি, স্বয়ং রামচন্দ্র পর্য্যন্ত করতে চান নি।
কি তুমি গ্রহণ করবে? এই কথাটা তোমায় না বলে আমি
কাছে যেতে পারি না।

বড় সাধ হয়েছে এবার যদি তুমি এ কলঙ্কিনীকে আবা
শ্রয় দাও তবে তোমার মধ্যে ও তোমার পরিবার পরিজনে
একেবারে ডুবে গিয়ে এ নারী-জন্মটা সার্থক করি। বিন্দি
এই শিক্ষা দিয়েছে। সে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া
পেয়েছে। আর আমি নিজেকে নষ্ট করতে বসে সত্যকে
তুমি আমায় রাখ বা ছাড়, যাই কর না কেন, আমি তোমা
দিনের চরণাশ্রিতা

মৃণাল।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

১। বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?

বৌদ্ধধর্ম্ম যত লোকে মানে, এত লোকে আর কোন ধর্ম্ম মানে না। চীনের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং সাইবীরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসায়রের সব লোক বৌদ্ধ। নেপালের অর্দ্ধেকেরও বেশী বৌদ্ধ। বর্ম্মা, সায়াম, ও আনাম অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৌদ্ধ। সিংহলদ্বীপে অধিকাংশ বৌদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম্ম না মানিলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধ-দিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এখনও অনেক জায়গায় বৌদ্ধ মত একটু বিকৃতভাবে চলিতেছে। চাটগাঁ, রাঙ্গামাটীর ত কথাই নাই। উহারা বর্ম্মা আরাকানের শিষ্য। উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্যে এখনও বৌদ্ধ মত চলে। তাহার মধ্যে বোধ নামক রাজ্য যে বৌদ্ধমতাবলম্বী তাহা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। বৌদ্ধেরা এই সকল মহলে অনেক দিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা মহিমপন্থ নামে এক নূতন বৌদ্ধ মত চালাইয়াছেন। বাঙ্গালায় যাহারা ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা করে তাহারা যে বৌদ্ধ একথা এখন কেহ অস্বীকার করেন না। বিঠোবা ও বিল নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পূজা হয়, কিন্তু এই দুই দেবতার ভক্তেরা আপনাদিগকে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া পরি-চয় দিয়া থাকে। বাঙ্গালীদের মধ্যে যে তন্ত্রশাস্ত্র চলিতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের গন্ধ ভরভর করে। যাঁহারা বলেন ৫ম মহাশূন্যে তারা ও ৬ষ্ঠ মহাশূন্যে কালিকা, তাঁহারা বৌদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহেন, কারণ কোন হিন্দু কখনও শূন্যবাদী হন নাই, হইবেন না ও ছিলেন না।

এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব আরও বিস্তার হইয়াছিল। তুর্কীস্তান এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের আকর ছিল। সেখান হইতে সাময়েদরা এবং তুর্কীস্তানের পশ্চিমের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম পাইয়াছিল। পারস্য এককালে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পুরাই বৌদ্ধ ছিল। পারস্যের পশ্চিমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। কারণ রোমান কাথলিকদিগের অনেক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা-পদ্ধতি, বৌদ্ধদেরই মত। রোমান কাথলিকদের মধ্যে দুই জন 'সেণ্ট' বা মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের নাম 'বারলাম' ও 'জোসেফট'। অনেক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে এই দুইটি শব্দ বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্বশব্দের রূপান্তরমাত্র।

অনেকে এই বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস দিতে সক্ষম হন নাই। কারণ বৌদ্ধেরা বড় আপনাদের ইতিহাস লিখেন নাই। মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের নামও শুনেন নাই। তবকতিনাশিরী ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস হইবার ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি বলেন, মহম্মদি বক্তিয়ার ঐ বিহারটাকে কেল্লা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং যখন উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত "দুর্গরক্ষী সৈন্য" বধ করিয়া ফেলিলেন, তখন দেখিলেন সৈন্যদিগের চেহারা আর এক রকম; তাহাদের সব মাথা মুড়ান ও পরনে গেরুয়া কাপড়। তখন তিনি মনে করিলেন ইহারা "সব মাথা মুড়ান ব্রাহ্মণ"। আবুল ফাজল এত বড় "আইনি আকবরী" লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বৌদ্ধধর্ম্মের নামগন্ধ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই বৌদ্ধেরাও বড় করে নাই; করিয়াছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান। কিন্তু ইহাদের চেষ্টা কিরূপ হইতেছে? শুনা যায় এককালে কোন অন্ধনিবাসের লোকে হাতী দেখিতে ইচ্ছা

করিয়াছিল। সকলেই অন্ধ, সুতরাং তাহাদের জীবন্ত হাতী দেখান কঠিন। সেইজন্য অধ্যক্ষ অন্ধগুলিকে একটি মরা হাতীর কাছে লইয়া গেলেন। কানারা হাত বুলাইয়া হাতী দেখিতে লাগিল। কেহ শুঁড়ে হাত বুলাইল, কেহ কানে হাত বুলাইল, কেহ দাঁতে হাত বুলাইল, কেহ মাথায় হাত বুলাইল, কেহ পিঠে হাত বুলাইল, কেহ পায়ে হাত বুলাইল, কেহ লেজে হাত বুলাইল, সকলেরই হাতী দেখা শেষ হইল। শেষে সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেখানে সকলে ঝগড়া করিতে লাগিল। কেহ বলিল হাতী কুলার মত, কেহ বলিল হাতী নলের মত, কেহ বলিল হাতী উল্টা ধামী, কেহ বলিল হাতী বড় উঁচু, কেহ বলিল হাতী থামের মত, কেহ বলিল হাতী চামরের মত। সকলেই বলিতে লাগিল 'আমার মতই ঠিক'। সুতরাং ঝগড়া চলিতেই লাগিল, কোনরূপ মীমাংসা হইল না। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপই ঘটিয়াছে। ইউরোপীয়েরা সিংহলদ্বীপেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম দেখেন ও সেইখানেই পালী শিখিয়া বৌদ্ধদের বই পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বলেন বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল ধর্ম্মনীতির সমষ্টিমাত্র, উহাতে কেবল বলে 'হিংসা করিও না', 'মিথ্যা কথা কহিও না', 'চুরি করিও না', 'পরস্ত্রীগমন করিও না' 'মদ খাইও না'। হজ্‌সন্ সাহেব নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম পাইলেন। তিনি দেখিলেন, বৌদ্ধদের অনেক দর্শন গ্রন্থ আছে এবং তাহাদের দর্শন অতি গভীর। কেহ বা শুদ্ধ বিজ্ঞানবাদীমাত্র, কেহ বা তাহাও বলেন না। যে সকল দর্শনের মত আঠার ও উনিশ শতে ইউরোপে প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল, তিনি সেই সকল মত নেপালের পুঁথির মধ্যে পাইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, এ সকল মত বৌদ্ধদের মধ্যে দুই তিন শতে চলিতেছিল। বিশপ বিগাণ্ডেট ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিতে পান। তিনি দেখেন উহার আকার অন্যরূপ। উহাতে পূজাপাঠ ইত্যাদির বেশ ব্যবস্থা আছে। তিনি দেখেন, বৌদ্ধমঠমাত্রেই একএকটি পাঠ-

শালা। ছোট ছোট ছেলেরা পড়ে। যিনি তিব্বত দেশের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিলেন, তিনি দেখিলেন, সেখানে কালীপূজা হয়, সেখানে মন্ত্রতন্ত্র আছে, হোমজপ হয়, মানুষপূজা হয়। চীনদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম আবার আর এক রূপ। তাহারা সব মাংস খায়, সব জন্তু মারে; অথচ বৌদ্ধ। জাপানীরা বলে 'আমরা মহাযান অপেক্ষাও দার্শনিকমতে উপরে উঠিয়াছি'। অথচ আবার তাহাদের মধ্যে এক দল বৌদ্ধ আছে, তাহারা নানারূপ দেবদেবীর উপাসনা করে।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম নানাদেশে নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে; কোথাও বা উহা পূর্ব্বপুরুষের উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ভূত প্রেত উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দেহতত্ত্ব-উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও আবার খাঁটি বুদ্ধের মত চলিতেছে, কোথাও খাঁটি নাগার্জ্জুনের মত চলিতেছে। সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের একখানি পুরা ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার ভাষার গোল। বুদ্ধের বচনগুলি তিনি কি ভাষায় বলিয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার বাড়ী ছিল কোশলের উত্তরাংশে। তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন কোশলে ও মগধে। এই দুই দেশের লোক বুঝিতে পারে এমন কোন ভাষাতে তিনি ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই দেশেও আবার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলেন নাই। যে সকল অতিপ্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না সংস্কৃত, না মাগধী, না কোশলী; এক রূপ মাঝামাঝি গোছের ভাষা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন 'মিশ্র ভাষা'। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহারই নাম দিয়াছেন 'Mixed Sanskrit'.। 'বিমলপ্রভা' নামে নয় শতের এক পুঁথিতে আমরা দেখিলাম যে, তৎকালে নানা ভাষায় বুদ্ধের বচন লেখা হইয়াছিল; মগধদেশে মগধভাষায়, সিন্ধুদেশে সিন্ধু ভাষায়, বোটদেশে বোটভাষায়, চীনদেশে চীনভাষায়, মহাচীনে মহাচীনভাষায়, পারস্যদেশে

পারস্যভাষায়, রুস্নাদেশে রুস্নাভাষায়। আমরা জানি পারস্যদেশে মগের ধর্ম্ম চলিত ছিল, অর্থাৎ সেখানকার লোক অগ্নি-উপাসক ও 'জরথুস্ত্র'র শিষ্য ছিল। সে দেশে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ছিল, এ কথাই শুনি নাই। তাহাদের ভাষায় যে আবার বৌদ্ধবচনগুলি লিখিত হইয়াছিল সে খবরও এই নূতন। রুস্নাদেশ কাহাকে বলে, জানি না, রোম হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, বিমলপ্রভায় বলে, উহা নীলানদীর উত্তর। বিমলপ্রভায় আরও একটি নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রাকৃত ও অপ্রভ্রংশ ভাষায়ও বুদ্ধদিগের অনেক সঙ্গীত লেখা হইয়াছিল, এ খবর এ পর্য্যন্ত অতি অল্পলোকেই জানেন।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে, একথা লইয়া নানামুনির নানামত আছে।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে?

যাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়া এবং পালি পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস করেন, তাঁহারাই যথার্থ বৌদ্ধ। গৃহস্থবৌদ্ধদের তাঁহারা বৌদ্ধ বলিতে রাজী নহেন। তাঁহারা বলেন, ত্রিপিটকে যাহা কিছু ব্যবস্থা আছে, সবই বিহারবাসী ভিক্ষুদের জন্য। বিনয়পিটকে যত বিধি-ব্যবস্থা আছে, সবই ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের তাহাতে স্থান নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, যাহারা "পঞ্চশীল" গ্রহণ করে অর্থাৎ "প্রাণাতিপাত করিব না", "মিথ্যাকথা কহিব না", "চুরি করিব না", "মদ খাইব না", "ব্যাভিচার করিব না"—এই পাঁচটি নিয়ম পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তাহারাও বৌদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলে এক জায়গায় ঠেকিয়া যায়। যে সকল জাতি দিনরাত প্রাণিহিংসা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, যথা জেলে, মালা, কৈবর্ত্ত, শিকারী, ব্যাধ, খেট, খটিক্ প্রভৃতি জাতির বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশের অধিকার একেবারেই থাকে না।

এদিকে আবার যাঁহারা নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন পৃথিবীশুদ্ধই বৌদ্ধ; কারণ, যিনি

বোধিসত্ত্ব হইবেন, তাঁহাকে জগৎ উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। লঙ্কাবাসীর মত আপনাকে উদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এইজন্য নেপাল ও তিব্বতবাসীরা লঙ্কাবাসীদিগকে হীনযান বৌদ্ধ বলেন এবং আপনাদিগকে মহাযান বৌদ্ধ বলেন। এখানে 'যান' শব্দের অর্থ লইয়া অনেক বিবাদবিসম্বাদ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ কেহ উহার ইংরাজী করেন Vehicle অর্থাৎ গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'যান' শব্দের অর্থ পন্থ বা মত। আমরা যেমন এখন বলি নানকপন্থী দাদুপন্থী কবীরপন্থী, সেকালে বৌদ্ধেরা সেইরূপ বলিত শ্রাবকযান, প্রত্যেক যান, বোধিসত্ত্বযান, মন্ত্রযান ইত্যাদি। Vehicleএর সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। মহাযান বৌদ্ধেরা আপনাদের বড় দেখাইবার জন্য আগেকার বৌদ্ধদিগকে হীনযানী বলিত, আর আপনাদিগকে বোধিসত্ত্বযান বলিত।

মহাযানী বৌদ্ধেরা যদি জগৎই উদ্ধার করিতে বসিলেন, তবে জগৎশুদ্ধই ত বৌদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলেন 'আমরা বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গানপত, পৌত্তলিক, ব্রাহ্মণপূজক প্রভৃতি সকলকেই উদ্ধার করিব'। কিন্তু সে উদ্ধারের পথ কি, সে কথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন না; এইমাত্র বলেন 'যাহার যাহাতে ভক্তি, আমরা সেইরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব'। এবিষয়ে কারণ্ডব্যূহে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তুমি কি করিয়া জগৎ উদ্ধার করিবে? জগতে ত নানামুনির নানামত, লোক তোমার কথা শুনিবে কেন?" তখন করুণামূর্ত্তি অবলোকিতেশ্বর বলিতেছেন, "আমি বিষ্ণুবিনেয়দিগকে বিষ্ণুরূপে উদ্ধার করিব, শিববিনেয়দিগকে শিবরূপে উদ্ধার করিব, বিনায়কবিনেয়দিগকে বিনায়করূপে উদ্ধার করিব, রাজবিনেয়দিগকে রাজরূপে উদ্ধার করিব, রাজভটবিনেয়দিগকে রাজভটরূপে উদ্ধার করিব"। এরূপে তিনি যে কত

দেবতার বিনেয়দিগকে কতরূপে উদ্ধার করিবেন বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, সেইজন্য উপরে তাহার কয়েকটিমাত্র দেওয়া হইল। এ মতে তাহা হইলে সকলেই বৌদ্ধ। এখন যেমন থিওজফিষ্ট মহাশয়েরা বলেন "তোমরা যে ধর্ম্মেই থাক, যে দেবতার উপাসনাই কর, ধর্ম্মে এবং চরিত্রে বড় হইবার চেষ্টা করিলেই, তোমরা থিওজফিষ্ট এবং যে কেহ থিওজফিষ্ট হইতে পারে"। এও কতকটা সেইরূপ,তবে ইঁহাদের অপেক্ষা মহাযানী বৌদ্ধদের জগতের প্রতি করুণা কিছু বেশী ছিল। তাঁহারা নিজেই চেষ্টা করিয়া জগৎ উদ্ধার করিতে যাইতেন। তোমার চেষ্টা থাকুক, আর নাই থাকুক, তাহারা বলিতেন "আমরা নিজগুণে তোমায় উদ্ধার করিব"। সেইজন্য মহাযান ধর্ম্মের সারের সার কথা "করুণা"। উহাঁদের প্রধান গ্রন্থের নাম "প্রজ্ঞাপারমিতা"। উহার নানারূপ সংস্করণ আছে; এক সংস্করণ শত সহস্র শ্লোকে, এক সংস্করণ পঁচিশ হাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ দশহাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ আটহাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ সাতশত শ্লোকে, আর এক সংস্করণ, সকলের চেয়ে ছোট, স্বল্পাক্ষরা—"স্বল্পাক্ষরা প্রজ্ঞাপারমিতা",—উহার তিনটি পাতা মাত্র। প্রজ্ঞাপারমিতা আরম্ভ করিতে হইলে কতকটা গৌরচন্দ্রিকা চাই—শেষ করিতে গেলেও কতকটা আড়ম্বর চাই। এই সব বাহ্য আড়ম্বর ছাড়িয়া দিলে উহাতে একটিমাত্র কথা সার—"সকল জীবে করুণা কর"।

মহাযানের মর্ম্ম গীতায় একটি শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। সে শ্লোকটি অনেকেরই অভ্যাস আছে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥

গীতায় এ কথাটি ভগবানের মুখে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মহাযানে এই ভাবের কথা প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের মুখে। বোধিসত্ত্বেরা নির্ব্বাণের অভিলাষী, তাঁহারা মানুষ। ভগবানের মুখে যে কথা শোভা পায়,

মানুষের মুখে সে কথা আরও অধিক শোভা পায়। ইহাতে বুঝা যায় তাঁহাদের করুণা কত গভীর।

মহাযান মতে তাহা হইলে জীবমাত্রেই বৌদ্ধ, কিন্তু এ কথায় ত কাজ চলে না। ভারতবর্ষে তখন নানারূপ ধর্ম্ম ছিল, মত ছিল, দর্শন ছিল, পন্থ ছিল, যান ছিল। মহাযান যেন বলিলেন, সকলেই বৌদ্ধ; কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা সে কথা মানিবে কেন? সুতরাং বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এ বিচারের প্রয়োজন চিরদিন ছিল, এখনও আছে। ইহার মীমাংসা কি? বৌদ্ধেরা জাতি মানে না যে, ব্রাহ্মণাদির মত জন্মিবামাত্রই ব্রাহ্মণ হইবে বা ক্ষত্রিয় হইবে বা শূদ্র হইবে, বৈষ্ণব হইবে বা শৈব হইবে। একে ত বৌদ্ধগৃহস্থেরা বৌদ্ধ কিনা তাহাতেই সন্দেহ, তারপর তাহাদের ছেলে হইলে, সে ছেলে বৌদ্ধ হইবে কিনা তাহাতে আরও সন্দেহ। এখনও এবিষয়ে কোন ইউরোপীয় বা এদেশীয় পণ্ডিতেরা কোন মীমাংসা করেন নাই, কিন্তু শুভাকর গুপ্তের আদি-কর্ম্ম রচনা নামক বৌদ্ধদের স্মৃতিতে ইহার এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেওয়া আছে। তিনি বলেন, যে কেহ ত্রিশরণ গমন করিয়াছে সেই বৌদ্ধ।

ত্রিশরণ শব্দের অর্থ—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"

বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে ত্রিশরণ গমনের জন্য কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, লোকে আপনারাই ত্রিশরণ গ্রহণ করিত।

কিন্তু পরে পুরোহিতের নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা হয়। হস্তসার গ্রন্থে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা আছে। যেমন খৃষ্টানের পুত্র হইলেই সে খৃষ্টান হয় না, তাহাকে বাপ্টাইজ করিলে তবে সে খৃষ্টান হয়, সেইরূপ বৌদ্ধ পিতামাতার পুত্র হইলেও, যতক্ষণ সে ত্রিশরণ গমন না করে, ততক্ষণ তাহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না। বৌদ্ধদের যতগুলি ধর্ম্মকর্ম্ম আছে, তাহার মধ্যে যে গুলিকে তাহারা অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে করিত এবং সকলের আগে সম্পন্ন করিত, সেই গুলিকে আদিকর্ম্ম বলিত। সেই সকল আদিকর্ম্মের মধ্যেও আবার ত্রিশরণ গমন সকলের আদি। বিমলপ্রভায়ও লেখা আছে আগে ত্রিশরণ গমন, পরে এই জন্মেই বুদ্ধ হইবার জন্য কালচক্র মতে লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। রত্নত্রয়ের শরণ লইলেই যদি বৌদ্ধ হয় এবং সেরূপ শরণ লইবার জন্য যদি পুরোহিতের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে জেলে, মালা, কৈবর্ত্তদের বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশের আর বাধা রহিল না। বিনয়পিটকে লেখা আছে যে, যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে তাহাকে ভিক্ষু করিতে পারিবে না ও তাহাকে সঙ্ঘে লইতে পারিবে না; কিন্তু তাই বলিয়া কি সে বেচারী বৌদ্ধ হইতে পারিবে না। শুভাকর গুপ্তের ব্যবস্থায় সে অনায়াসে বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের গুরু কে?

প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। যে সন্ন্যাস লইবে তাহাকে একজন সন্ন্যাসীকে মুরুব্বি করিয়া সন্ন্যাসীর আখড়ায় যাইতে হইত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নাম ভিক্ষু। সন্ন্যাসীর দলের নাম সঙ্ঘ। যেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করিত তাহার নাম সঙ্ঘারাম। সংঙ্ঘারামের মধ্যে প্রায়ই একটি মন্দির থাকিত, তাহার নাম বিহার। সেই মন্দিরের নাম হইতেই বৌদ্ধভিক্ষুদের আখড়াগুলিকে বিহারই বলিয়া থাকে।

শিক্ষানবীস একজন ভিক্ষুকে মুরুব্বি করিয়া সঙ্ঘে উপস্থিত হন। সেখানে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা বুড়া ভিক্ষু, যাঁহাকে স্থবির বা থেরা বলে,

শ্রাবকযানের গুরু

তিনি নবীসকে কতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসার সময় সঙ্গে আর পাঁচ জন ভিক্ষুও থাকা চাই। স্থবির নবীসের নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। তাহার কোন উৎকট রোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজার কোন চাকরী করে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি আরও জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার ভিক্ষাপাত্র আছে কিনা, তাহার চীবর আছে কিনা, অর্থাৎ, ভিক্ষু হইতে গেলে যে সকল জিনিস দরকার, তাহা তাহার আছে কিনা। সে এসব জিনিস আছে বলিলে, তিনি সঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আপনারা বলুন এই লোককে সঙ্ঘে লওয়া যাইতে পারে কিনা। যদি আপনাদের ইহাতে কোন আপত্তি থাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন, যদি না থাকে তবে চুপ করিয়া থাকুন'। তিনি এইরূপ তিনবার বলিলে, যদি কোন আপত্তি না উঠিত, তবে তিনি নবীসকে জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমার উপাধ্যায় কে?" সে উপাধ্যায়ের নাম বলিলে, তাঁহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইত। সে উপাধ্যায়ের নিকট সন্ন্যাসীর কি কি কাজ, সব শিখিত। এখনকার ছেলেরা যেমন মাষ্টারমহাশয়দের মান্য করিয়া চলে, শিক্ষানবীস, শ্রমণের, সেইরূপে আপনার উপাধ্যায়কে মান্য করিয়া চলিত। ক্রমে সে সব শিখিয়া লইলে তাহাতে ও উপাধ্যায়ে কোন প্রভেদ থাকিত না। সঙ্ঘে বসিলে, দুজনের সমান ভোট হইত।

বুদ্ধদেব যখন নন্দকে "প্রব্রজ্যা" দিয়াছিলেন, তখন তিনি উহাকে বৈদেহ মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈদেহ মুনি নন্দকে আপনার বন্ধুর মত দেখিতেন, বন্ধুর মত তাহাকে পরামর্শ দিতেন ও শিক্ষা দিতেন। বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে বৈদেহ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিতেন "কেমন, নন্দ বেশ শিখিতেছে ত?" বৈদেহ মুনি যেমন জানিতেন, সমস্ত খুলিয়া বলিতেন। যেখানে বৈদেহমুনি নন্দকে কোন বিষয় বুঝাইতে অক্ষম হইতেন, বুদ্ধদেব নিজে গিয়া

উদাহরণ

তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতেন। মহাকবি অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যে বৈদেহমুনি ও নন্দের অনেক কথা লেখা আছে। তাহাতে বেশ দেখা যায়, বৈদেহমুনি নন্দের উপাধ্যায় হইলেও দুজনে পরস্পর বন্ধুভাবেই বাস করিতেন, তাঁহারা পরস্পর আপনাদিগকে সমান বলিয়া মনে করিতেন।

মহাযান বৌদ্ধেরা উপাধ্যায়কে "কল্যাণমিত্র" বলিত। কল্যাণমিত্র শব্দ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, সে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, পরলোকের কল্যাণকামনায় গুরু শিষ্যের মিত্র মাত্র। মহাযান-মতাবলম্বীরা দর্শনশাস্ত্রের খুব চর্চ্চা করিতেন। এখানে গুরুশিষ্য অত্যন্ত প্রভেদ হইবারই কথা, কিন্তু তাহা হইত না। সঙ্ঘে অধিকার দুজনেরই সমান থাকিত এবং উভয়ে পরস্পরের মিত্র হইতেন।

মহাযানের গুরু

ক্রমে যখন এত দর্শনশাস্ত্র পড়া, এত যোগ ধ্যান করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যখন ভিক্ষুরা বিবাহ করিতে লাগিলেন; প্রকাণ্ড একদল গৃহস্থভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইল, তখন মন্ত্রযানের উৎপত্তি হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "মন্ত্র জপ করিলেই, পাঠ, স্বাধ্যায়, তপ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মকর্ম্মেরই ফল পাওয়া যাইবে। প্রজ্ঞাপারমিতা পড়িতে অনেক বৎসর লাগে, বুঝিতে আরও বেশী দিন লাগে এবং প্রজ্ঞাপারমিতার ক্রিয়াকর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে আরও বেশী দিন লাগে। এত ত তুমি পারিবে না বাপু, তুমি এই মন্ত্রটী জপ কর, তাহা হইলেই সব ফল পাইবে।" যখন বৌদ্ধধর্ম্মের এই মত দাঁড়াইল, তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা খুব আঁটা আঁটি হইয়া গেল। তখন তিনটী কথা উঠিল—"গুরুপ্রসাদ", "শিষ্যপ্রসাদ", মন্ত্রপ্রসাদ", অর্থাৎ গুরুকে ভক্তি করিতে হইবে, শিষ্যকে স্নেহ করিতে হইবে, এবং মন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকিবে। যে সময় বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে মন্ত্রযান প্রবেশ করে, সে সময়

মন্ত্রযানের গুরু

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে গুরুশিষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানা যায় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আচার্য্য ও শিষ্যের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের মত। বাস্তবিকও যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি পিতার কার্য্যই করিবেন। সন্তানের শিক্ষার ভার ত পিতারই, তবে তিনি যদি না পরেন, তবে একজন প্রতিনিধির হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিয়া দিবেন। শিক্ষক বা আচার্য্য পিতার প্রতিনিধিমাত্র। আচার্য্যের মৃত্যুতে শিষ্যের ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত। এখনও যিনি গায়ত্রী উপদেশ দেন, সেই আচার্য্য গুরু মরিলে, ব্রাহ্মণকে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু শিষ্য গুরুর দাস, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গুরুর, এই যে একটা উৎকট মত ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছে, এ মতের মূলই মন্ত্রযান। মন্ত্রযানের গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আর সেরূপ সমান ভাবটি রহিল না, একজন বড় ও একজন ছোট হইয়া গেল।

বজ্রযানের গুরু

বজ্রযানে গুরু আরও বড় হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজ্রধারী। এই যানের প্রধান কথা এই যে, দেবতাদিগের এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের বজ্রধর নামে একজন পুরোহিত হইলেন। পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে আর একজন বুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে উহারা বুদ্ধগণের পুরোহিত বলিয়া মানিয়া থাকে। বজ্রসত্ত্ব কতকটা আদিবুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এই মতের গুরুদিগকে বজ্রাচার্য্য বলিত। বজ্রাচার্য্যের পাঁচটি অভিষেক হইত, মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক ও পট্টাভিষেক। তাঁহার দেশীয় নাম গুভাজু, অর্থাৎ, তিনি গুরু, তাঁহাকে সকলে ভজনা করিবে। সুতরাং শিষ্য হইতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রযানে গুরুকেও শিষ্যের "প্রসাদ" খুঁজিতে হইত, বজ্রযানে তাহার কোনই দরকার নাই।

সহজযানের গুরু

সহজযানের গুরুর উপদেশই সব। গুরুর উপদেশ লইয়া মহাপাপ কার্য্য করিলেও তাহাতে মহাপুণ্য হইবে। সহজযানের একজন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যে পঞ্চকাম উপভোগের দ্বারা মুর্খলোক বদ্ধ হয়, গুরুর উপদেশ লইয়া সেই পঞ্চকাম উপভোগ করিয়াই মুক্ত হইয়া যায়।

গুরু উবএসেঁ অমিঅরসু হবহিঁ ণ পীঅই যেহিঁ।
বহুসত্তত্থ মরুথলিহিঁ তিসিএ মরিথই তেহিঁ॥

"গুরুর উপদেশই অমৃতরস। যে সকল হাবারা উহা পান না করে তাহারা বহু শাস্ত্রার্থরূপ মরুস্থলীতে তৃষ্ণায় মরিয়া যায়।" গুরুর উপদেশ ভিন্ন সহজপন্থীদের কোন জ্ঞানই হয় না; আগম, বেদ, পুরাণ, তপ, জপ সমস্তই বৃথা; গুরুর উপদেশমাত্রই সত্য।

আগম বেঅ পুরাণে পংডিত্তমাণ বহস্তি।
পক্কসিলিফলঅ অলি বা জিম বহেরিউঁ ভমঅন্তি॥

"যাহারা আগম, বেদ ও পুরাণ পড়িয়া আপনাদের পণ্ডিত মনে করিয়া গর্ব্ব করে তাহারা পক্ক শ্রীফলে অলির ন্যায় বাহিরে বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ায়"।

এইরূপে যতই বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, গুরুর সম্মান বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

কালচক্রযান

কালচক্রযানে যে গুরুর মান্য কত অধিক তাহা একটি কথাতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে। লঘুকালচক্রতন্ত্রের টীকা বিমলপ্রভা যিনি লিখিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীক, অপনাকে অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণকায় বা অবতার বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তিনি স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর, আর কেহ নহেন। কালচক্রযানের পর লামাযানের উৎপত্তি। সকল লামাই কোন না কোন বড় বোধিসত্ত্বের অবতার। সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। লামাযান ক্রমে উঠিয়া দলাইলামাযানে পরিণত হইয়াছে। দলাইলামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার। তিনি মরেন

না, তাঁহার কায় মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ হয়। তিনি এক কায় ত্যাগ করিয়া কায়ান্তর ধারণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথমে যে উপাধ্যায় মিত্রমাত্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার।

বৌদ্ধধর্ম্মের এই দৃষ্টান্ত হিন্দুর সংসারেও প্রবেশ করিয়াছে। তন্ত্র-মতে গুরুই পরমেশ্বর, গুরুর পাদপূজা করিতে হয়, যাহা ব্রাহ্মণের একেবারে নিষেধ, সেই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয়; গুরু শিষ্যের সর্ব্বস্বের অধিকারী, যে শিষ্য ধনজন, আপন স্ত্রীপুত্র ও দেহ পর্য্যন্ত গুরুসেবায় নিয়োগ করিতে পারে সেই পরম ভক্ত। বৈষ্ণবের মতেও তাই। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনেকে এখন কর্ত্তাভজা হইতেছেন। তাঁহারা বলেন "গুরু সত্য, জগন্মিথ্যা, যা করাও তাই করি, যা খাওয়াও তাই খাই, যা বলাও তাই বলি।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব

(শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল কথিত)

যুরোপীয় এবং ভারতীয় সাধনা।

যুরোপ যত বড় হউক না কেন, তার বাহিরেও যে একটা আরও বড় জগত আছে, যুরোপের সভ্যতা ও সাধনাই যে জগতের একমাত্র বা শ্রেষ্টতম সভ্যতা ও সাধনা নয়, অথবা চীনের বা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা যে বিশ্ব-মানবের শৈশব-লীলা মাত্র ছিল, তার পরিপূর্ণ যৌবন-লীলা প্রথম যুরোপেই হইতেছে, এ সকল কথার ভ্রান্তি ক্রমে ধরা পড়িয়াছে। বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর যুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, সমষ্টিগত মানব সমাজের সভ্যতা ও সাধনা একটা সরল রেখার ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। জীব-জগতের ক্রমবিকাশের বা ইভোলিউশনের ধারাকে ফরাসী পণ্ডিত লা মার্ক এই ভাবেই কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ সে ভুল খণ্ডন করিলেও, আজিকালিকার সমাজ-বিজ্ঞান মানব সমাজের ক্রমবিকাশে সেই লামার্ক-কল্পিত ক্রমই দেখিতেছে। চীন একদিন কতকটা পরিমাণে একটা বিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতা ও সাধনা গড়িয়া তুলিয়া ছিল; তারপর চীনের বিকাশক্রম চিরদিনের মতন থামিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালে একটা অত্যদ্ভুত সভ্যতার ও সাধনার প্রতিষ্ঠা কয়িয়াছিল; কিন্তু সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে; তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই। মানবপ্রকৃতির ও মানবের সভ্যতার এবং সাধনার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ দেখিতে হইলে, এখন যুরোপের গ্রীক্-রোমক্ গথিক্-হিব্রু-খৃষ্টীয় সভ্যতা ও সাধনারই আলোচনা করিতে হইবে। যুরোপের

জনসাধারণের ত কথাই নাই, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যেও চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে এই ধারণা প্রবল রহিয়াছে। এই ভ্রান্তিটা দূর করিবার জন্য ভারতের সভ্যতা ও সাধনা বিশ্বমানবের উন্নতি কল্পে কতটা কি করিয়াছে বা না করিয়াছে, তার আলোচনা ও প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশীয়েরাই যে কেবল এ সকল তত্ত্বের সন্ধান্ রাখেন না, তাহা নহে। আমরাও ভাল করিয়া এ সকল কথা জানি না। আমাদের স্বদেশাভিমান, এবং এই স্বদেশাভিমান হইতে যে স্বজাতি পক্ষপাতিত্ব সর্ব্বত্রই জাগিয়া উঠে, সেই পক্ষপাতিত্বের বা পেট্রিয়টিক বায়সের (patriotic bias'এর) প্রভাবে আমরা আমাদের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনাকে জগতের অপর সকল সভ্যতা ও সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি বটে। য়ুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া, য়ুরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না; আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশী করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এ বিষয়ে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। উভয়েই স্বজাতিপক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। উভয়ের বিচারই সেই জন্য সত্য-ভ্রষ্ট। উভয়েই সভ্যাভাস মাত্রকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র সত্যকে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন।

বিশ্বমানব।

সত্য কথা কিন্তু এইযে বিশ্বমানব বিশ্বব্যাপী। ছোট বড়, পুরাতন ও অধুনাতন, য়ুরোপ আসিয়া আফ্রিকা ও মার্কিণ, সকল

জ্ঞাত মহাদেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই বিশ্ব-মানবের অথবা নর-নারায়ণের লীলাভূমি হইয়া আছে। সে লীলা বিশ্বব্যাপী লীলা। এই লীলাময় বিশ্বমানব এক অখণ্ড বস্তু বা তত্ত্ব। সকল মানবে ও সকল মানব সমাজেই ইনি একই সঙ্গে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। অব্যক্তরূপে তিনি কোথাও পরিপূর্ণ নহেন। কোনও সমাজ, কোনও সভ্যতা, কোনও সাধনা, এই বিশ্বমানবের বা Universal Humanity'র আত্মবিকাশধারার একটী বা দুইটী বা তিনটী তরঙ্গ-ভঙ্গ (moments) প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। আর অপর কোনও সমাজ, সাধনা ও সভ্যতা বা তার আর দুই তিনটী তরঙ্গ-ভঙ্গ বক্ষে ফুটাইয়া অনন্তের পানে ছুটিয়াছে। ভারতবর্ষও বিশ্ব-মানবের অঙ্গ, বিশ্ব-মানবের লীলাক্ষেত্র, বিশ্ব-মানবের লীলার সহায় ও সহচর। য়ুরোপও তাহাই। য়ুরোপ তাঁর এই বিশ্ব-ব্যাপী লীলা-নাট্যের দু'একটী অঙ্কের অভিনয় করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতবর্ষ অপর দু'একটী অঙ্ককে আপনার ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে প্রকট করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতের ও য়ুরোপের সত্যের এবং সাধনার আলোচনা করিবার সময় সর্ব্বদা এই কথাটা মনে করিয়া রাখা প্রয়োজন।

সামান্য-মনুষ্যধর্ম্ম।

মানুষ মাত্রেরই কতকগুলি সামান্য লক্ষণ আছে। এই গুণ-সামান্যই মনুষ্যত্বের সার্ব্বজনীন নিদর্শন। সকল মানুষেরই চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। এই সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক ও নিয়ন্তারূপে সকলেরই কতকগুলি সাধারণ মনোবৃত্তি আছে। আর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় একটা রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শময় বর্হির্জগৎও সকলের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। চিরদিনই মানুষ এই সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই বর্হির্জগতে বিচরণ করিয়া আপনার জীবনের অশেষবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। এই সকল অভিজ্ঞতার প্রকৃত ও নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে যাইয়াই মানুষ

সর্ব্বত্র আপনার দর্শন ও বিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানুষের ইন্দ্রিয় সকল মোটের উপরে এক এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় এই রূপরসাদিপূর্ণ বহির্জগতও স্বল্পবিস্তর সমানধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও এই সাধারণ অভিজ্ঞতাকেই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা এবং সাধনা বিভিন্ন ভাবে দেখিয়াছে। একই সময়ের ও একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকেও একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন লোকে একই অভিজ্ঞতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্ম বাহির করিয়া লয়। জগতের ভিন্ন ভিন্ন সাধনাও সেইরূপ মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিচার ও আলোচনা করিয়া, জীব ও জগত, জীব ও জগতের পরস্পরের সম্বন্ধ, জীবের জন্ম ও মৃত্যু, জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি ও পরিণতি, এ সকল সম্বন্ধে কতকগুলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল সিদ্ধান্তকেই দর্শন কহে। এই সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানুষ আপনার জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি ও জ্ঞান-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু একদিকে যেমন মানুষের একটা অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা আছে, অন্যদিকে সেইরূপ তার অনন্ত রসপিপাসা এবং কর্ম্ম-লিপ্সাও রহিয়াছে। কেবল জ্ঞানেতেই মানুষের তৃপ্তি হয় না। যাহাকে সে জ্ঞানেতে লাভ করিল, তাহাকে সে ভোগ করিতে চাহে; তার মধ্যে সে আনন্দ অন্বেষণ করে; তার সঙ্গে সে রসের সম্বন্ধ পাতাইতে যায়, তাহার দ্বারা তার ভাবেরও তৃপ্তি করিবার জন্য সে লালায়িত হয়। ফলতঃ জ্ঞান ও ভাব দুইটা বস্তু নহে; একই অভিজ্ঞতার দুই দিক মাত্র। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই রস বা ভাব জাগে। ভাব জাগিলেই তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও সম্যক্ সার্থকতার জন্য সেই জ্ঞান ও ভাব উভয়ে মিলিয়া কর্ম্মের প্রেরণাকে জাগাইয়া দেয়। জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম—Reason, Emotions, Will—এই তিন পাদে মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই পূর্ণ হয়।

জ্ঞানের পূর্ণতা অপূর্ণতা, ভাবের পরিপক্কতা বা অপরিপক্কতা, কর্ম্মের পটুতা বা অপটুতা,—এ সকল বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ থাকে বটে। কিন্তু যেখানে জ্ঞান সেখানেই ভাব, যেইখানেই ভাব সেইখানেই কর্ম্ম-চেষ্টা,—অনায়ত্তকে আয়ত্ত, যাহা লোভনীয় অথচ আপাততঃ অলব্ধ, তাহাকে লাভ করিবার জন্য বহুবিধ উপায়-উদ্দেশ্যের সংযোজন,—এসকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্ম্মই সাধন। যে পরম-তত্ত্ব ঐ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও ভাবের আশ্রয় তাহাই এই সাধনের নিত্য সাধ্য বস্তু।

মধ্য ও প্রাচ্য আশিয়াখণ্ডে ভারতবর্ষের প্রভাব।

ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সভ্যতা ও সাধনা মানবীয় অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছে, মানব জীবনের কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, মানবসমাজের গঠন ও বিকাশের কতকগুলি বিশেষ তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে এবং মানব জীবনের সার্থকতা লাভের জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট সাধন অবলম্বন করিয়াছে। এইগুলি ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার বিশিষ্ট ও নিজস্ব বস্তু। এইগুলিই বিশ্বমানবের বিকাশে ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট কর্ম্ম। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে পারস্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত, মধ্য-আশিয়ার বিস্তৃত উপত্যকাভূমি হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র প্রাচ্য ও মধ্য আশিয়াখণ্ডে ভারতের এই সাধনা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রায় দুই হাজার বৎসরকাল এই বিশাল মানব সমাজ যে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন, যে সমাজ-নীতির অনুসরণ, জীবনে যে আদর্শের সাধন করিয়াছে, তার গভীরতম মর্ম্ম এবং মূল সূত্রগুলি ভারতের তত্ত্ববিদ্যার, ভারতের সমাজনীতির এবং ভারতের ধর্ম্ম-নীতির ও ধর্ম্ম-সাধনের মধ্যেই কেবল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রোমের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী রোমক-শাসন-যন্ত্র, রোমক-রাষ্ট্র-তন্ত্র, এবং রোমক-ব্যবহার-শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হইয়া পৃথিবীতে একটা

নূতন একতার ও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কোনও দিন আশিয়াখণ্ডে এরূপ কোন পার্থিব সাম্রাজ্যের বা শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা করে নাই, বা করিতে চাহে নাই। কিন্তু রোম যেমন য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার রাষ্ট্র-তন্ত্র, ব্যবহার-বিধি, এবং শাসন-যন্ত্রের সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেইরূপে ভারতবর্ষও সমগ্র মধ্য ও প্রাচ্য আশিয়াখণ্ডের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার আধ্যাত্মিক শক্তির এবং পারমার্থিক সাধনার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছে। পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব রাষ্ট্রীয় প্রভুশক্তি বা পার্থিব সম্পদ ও সাধনার প্রভাব অপেক্ষা যে পরিমাণে গভীরতর হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার উপরে রোমের প্রভাব অপেক্ষা প্রাচ্য আশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার উপরে ভারতবর্ষের প্রভাবও সমধিক গভীর ও স্থায়ী হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে আশিয়ার এই বহুবিস্তৃত ভূভাগে, এই অগণ্য কোটি লোকপুঞ্জের মধ্যে, জাতি-বর্ণ-গত, আচার-অনুষ্ঠান-গত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-গত, অশেষ প্রকারের বৈষম্য ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু এসকল ভেদবিরোধের মধ্য দিয়াই আমরা একটা বিশিষ্ট আকারের সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি আদর্শ এবং সাধন-পন্থাও দেখিতে পাই। আর ভারতের তত্ত্ব-জ্ঞানই প্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সমাজ-তন্ত্র, জীবনাদর্শ, ও ধর্ম্ম-কর্ম্মকে আত্ম-জ্ঞানের ভূমিতে তুলিয়া লইয়া তার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতবর্ষই প্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সভ্যতা ও সাধনাকে আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের যন্ত্র ও সাধনরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষ যে কেবল প্রাচ্য আশিয়ার সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ও আধ্যাত্মজীবনকেই আপনার তত্ত্বজ্ঞান ও সাধন-পন্থার দ্বারা পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহা নহে। যে তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে আশিয়া সত্যের সন্ধানে গিয়াছে, তার মূল উপাদন ও প্রণালী, তার বৈজ্ঞানিক অনুভূতি বা scientific concepts,

যে ভাবে আশিয়া এই প্রত্যক্ষ জগৎকে জানিতে ও ধরিতে গিয়াছে তার শ্রেণীবিভাগ, আর মানুষের সহজজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের যে সকল সূত্র ও সন্ধান ধরিয়া আশিয়া সত্তার বা সত্যংএর এবং চৈতন্যের বা জ্ঞানংএর মূল প্রকৃতির অনুসন্ধানে যাইয়া আপনার বিবিধ তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তৎসমুদায়ই ভারতের নিকট হইতে পাইয়াছে। জাপানের ও চীনের তর্কশাস্ত্র ভারতের ন্যায়ের মূল সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। য়ুরোপের ন্যায়দর্শন গ্রীশীয় ন্যায়ের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রীশীয়দিগের প্রমাণপ্রতিষ্ঠার প্রণালী ভারতের প্রমাণবিজ্ঞানের প্রণালী হইতে ভিন্ন। জাপানের ও চীনের প্রমাণ-বিজ্ঞানে ভারতীয় ন্যায়েরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীশীয় ন্যায়ের নহে। ভারতবর্ষের প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা phioslophy of nature জড় ও গতির, কারণ ও কার্য্যের, দেশ ও কালের যে সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, চীনের মধ্যযুগের বিজ্ঞান তাহারই উপরে গড়িয়া উঠে। হিন্দুর রাসায়ণজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই চীনে কোনও কোনও পণ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। চীন নানা প্রকারের রঙ্গের আবিষ্কার করিয়াছে, আর তার কতকগুলি হিন্দুর রাসায়ণবিদ্যার আশ্রয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এমন কি বিশেষজ্ঞেরা মধ্যযুগের চীনের এবং জাপানের ললিতকলাতেও ভারতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

দর্শনের উপাদান।

ইহজীবনে আপনার শরীর মনের আশ্রয়ে মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে তার নিগূঢ় মর্ম্ম ও চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করিতে যাইয়াই দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়। অভিজ্ঞতা বলিতে এক জন জ্ঞাতা, এই জ্ঞাতার কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় এবং এই জ্ঞাতব্য বিষয়ের যথাযথ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য কতকগুলি শারীরিক যন্ত্র ও মানসিক বৃত্তির প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মানুষই

জ্ঞাতা এবং প্রত্যেকেরই জ্ঞানলাভের জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও কতকগুলি মনোবৃত্তি আছে। এই জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয় মোটের উপরে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ১ম, সে তার নিজকে জানে, আপনাকে জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্ত্তা রূপে জানে, অতএব সে নিজে তার নিজের জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়। ২য়, সে এই বিশাল বিষয়-রাজ্যকে জানে, এই বহির্জগতের রূপরসাদি তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া তার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ৩য়, সে অপর মানুষকে এবং এই মানুষ যে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে তাহাকেও জানে। ঐ বহির্জগত বা বিষয় রাজ্য (আর এখানে আমাদের শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং মনোবৃত্তি সকল পর্য্যন্ত বিষয়পদবাচ্য হয়) এবং অপর মানুষ ও মনুষ্য-সমাজ—এই উভয়ই আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষায় ইদং পদবাচ্য হইয়া থাকে। এই ইদংকে যে জানে, যে ইদংএর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্ম্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বলিয়া, যাহাকে এই ইদংএর সম্পর্কে কর্ত্তাও বলা যায়—সেই মানুষ অহং পদবাচ্য হয়। এই অহং ও এই ইদংকে লইয়া মানুষের যা কিছু লীলাখেলা। এই দুই তত্ত্বের আশ্রয়েই মানুষ তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। এই অভিজ্ঞতার উৎপত্তি কোথায়, স্থিতি কিসে, গতি কোন্ দিকে, নিয়তি কি, ইহার প্রকৃতি ও প্রণালী, মূল্য ও মর্ম্ম কি, এসকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়াই যাবতীয় দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভারতের সাধনা এই মানবীয় অভিজ্ঞতার কি বিশেষ তত্ত্ব ও মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছে? আমাদের দেশে এই বিশ্ব সমস্যার কিরূপ মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে,—সকলের আগে আমি এই প্রশ্নেরই আলোচনা করিব। তারপরে হিন্দু এই বিশাল বিষয় রাজ্যকে কোন্ চক্ষে দেখিয়াছে, মানুষ এবং মানবসমাজ সম্বন্ধেই বা হিন্দু কোন্ বিশেষ সিদ্ধান্তের, তত্ত্বের ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা

করিয়াছে, ক্রমে এসকল বিষয়েরও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমে এই শান্তিবাচন আছে,—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে॥
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

"ওঁ তাহা (অর্থাৎ বিশ্বের অব্যক্ত বীজ) পূর্ণবস্তু। ইহা (অর্থাৎ ঐ বীজের ব্যক্ত আকার) পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পূর্ণ যখন ঐ পূর্ণেতে প্রত্যাগত হয় তখন পূর্ণই কেবল অবশিষ্ট থাকে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

হিন্দুরা কি ভাবে আপনার যাবতীয় অভিজ্ঞতার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এই শান্তিবাচনে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে এই হেঁয়ালির ব্যাখ্যা দেখিতে পাই।

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃত মাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌনামায়মিদংরূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামায়মিদংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নোহি স প্রাণস্যৈব প্রাণেনাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণন্ শ্রোত্রং মন্বানোমনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব। সযোঽত এঁকৈকমুপাস্তে ন স বেদ অকৃৎস্নোহ্যেষোঽত এঁকৈকেন ভবতি আত্মেত্যেবোপাসীতাত্রহেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মাঽনেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ। যথাঽবৈপদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবংবেদ।"

"তখন সেই অব্যাকৃত বা অব্যক্ত ব্রহ্মই কেবল ছিলেন। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তুই নামরূপের দ্বারা ব্যক্ত হইলেন। এই জন্য এখনও লোকে নাম ও রূপের দ্বারাই সমুদায় পদার্থকে বিশিষ্ট করিয়া থাকে—বলে "ইহার এই নাম", "উহার এই আকার"।

"সেই ব্রহ্ম এই ব্যক্ত ও নামরূপের দ্বারা বিশিষ্টকৃত বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট

হইলেন। নখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ক্ষুর যেমন আপনার আধানে নিমেষে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ হইলেন। অথবা সকল বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে যে বায়ুমণ্ডল, তাহা যেমন আপনার মণ্ডলস্থিত সকল জীবের অন্তর্বাহ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেই ব্রহ্ম সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

"কিন্তু যদিও তিনি তাহাদের সকলের অন্তরতর ও অন্তরতম বস্তু, তথাপি অল্পবুদ্ধি লোকে তাঁহাকে দেখে না। তাঁহাদের নিকট তিনি অকৃৎস্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন। তাঁর অনুপ্রাণনেই জীবের প্রাণল ক্রিয়া সম্ভব হয়। এই জন্য ইহারা তাঁহাকে প্রাণ নামে অভিহিত করে। তাঁহারই প্রেরণায় জীবের বাণী উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহারা তাঁহাকে বাক্ বলে। সেইরূপ শ্রবণ জন্য তাঁহাকে শ্রোত্র, দর্শন জন্য তাঁহাকে চক্ষু, মনন জন্য তাঁহাকে মন বলে। কিন্তু এ সকল তাঁর কর্ম্মেরই নাম মাত্র। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্রাদির নাম ও কর্ম্মের মধ্যে তিনি অখণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব যাহারা তাঁহাকে প্রাণাদিরূপে ভজনা করে, তাহারা সমগ্র তত্ত্বের একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া থকে। তাহাদের এই অপূর্ণজ্ঞাননিবন্ধন তারা সচ্চিদানন্দ পুরুষের সম্বন্ধে তত্ত্বতঃ অজ্ঞ থাকিয়া যায়।

"এই আত্মাতেই তাঁর পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও মহিমা বিরাজিত; জ্ঞান, আনন্দ, প্রাণ, সকলই এই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মাতেই এ সকল বহুবিধ নামরূপ এক হইয়া আছে। "ঐ" আর "এই" সকলই আত্মা। "তাহা" ও "ইহা" সকলই আত্মা। যাঁহাকে আত্মা কহে এ সকল তাঁহারই বিবিধ জ্ঞানবলক্রিয়া। আত্মাই এ সকলের বীজ ও আশ্রয়। এই আত্মার উপাসনার দ্বারাই সকল জ্ঞান লাভ হয়। যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ যেমন অবশ্যম্ভাবীরূপে আপনার ইপ্সিত লাভ করে, সেইরূপ এই আত্মাকে যে জ্ঞাত হয় সে কীর্ত্তি এবং পরমানন্দ ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

"এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে প্রথম মন্ত্রে "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ"—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এই সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল আত্মা মাত্র ছিলেন, তিনি চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন আর কেহ ও কিছু নাই, তখন তিনি "অহং" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন—

এই সকল বলিয়া এবং এই পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য, অপর দেবতা উপাস্য নহেন, এই উপদেশ করিয়া, শ্রুতি এখন, এই পঞ্চম ব্রাহ্মণে, এই আত্মা হইতে কিরূপে এই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অনন্ত এবং তিনি নিত্যই পরিপূর্ণ। এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী পরিপূর্ণ ঈশ্বর আংশিক বা অপূর্ণ ভাবে কোনও বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন না। এইরূপ কল্পনা তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বেরই বিরোধী। তিনি যেখানেই থাকেন, পরিপূর্ণ রূপেই থাকেন। অতএব অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাতে তিনি পরিপূর্ণ রূপেই বিরাজ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া অগ্নি বায়ু প্রভৃতিকে ঈশ্বর রূপে ভজনা করা সঙ্গত নহে। এই জন্যই শ্রুতি কহিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পরম পুরুষকে অগ্নি কিম্বা বায়ুরূপে ভজনা করে, তার উপাসনা অপূর্ণ হয়; কারণ এ সকল তাঁর ক্রিয়া বিশেষের বা গুণবিশেষের প্রকাশ মাত্র, তাঁর সর্ব্বগুণ প্রকাশ করে না।

পরমপুরুষ পরমেশ্বর যখন আত্মারূপে উপাসিত হন, তখনই কেবল তাঁর পূর্ণ উপাসনা হয়। এই আত্মা বা "অহং"ই জ্ঞানের ও চৈতন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই জন্যই পরমেশ্বর যখন আত্মারূপে বা "অহং" রূপে উপাসিত হন, তখনই তাঁর সত্য উপাসনা হইয়া থাকে। অপিচ, এই আত্মা বা অহং শব্দ পূর্ণতা জ্ঞাপক। জীব শরীরের আর কোনও চেষ্টা এই অহং প্রত্যয়ের পূর্ণতার সমকক্ষ হইতে পারে না। প্রাণন, শ্রবণ, দর্শনাদি মানুষের ক্রিয়া বিশেষের বিভিন্ন অংশ মাত্র প্রকাশ করে। কিন্তু যখন সে অহং বলে, তখন তার মধ্যে এই সমুদয়ের প্রাণনাদি ক্রিয়া এবং তার অতিরিক্ত আরও অনেক তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকে। অতএব পরম-পুরুষের মধ্যে আমরা যে সকল গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ও পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করি, এই অহং নামে বা শব্দে সর্ব্বাপেক্ষা তাহাকে অধিক ব্যক্ত করিয়া থাকে।"

উপরে মূল শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া তাহার মাধ্বভাষ্যের মর্ম্ম বাঙ্গলা করিয়া দিলাম। আমার বর্ত্তমান প্রয়োজনের জন্য ইহাই যথেষ্ট। এই প্রাচীন ঋষিবাক্যে আমরা তিনটী বিশেষ তথ্য প্রাপ্ত হই;—

১ম,—একটা পূর্ণতত্ত্বের অনুভূতি, আর আত্মাই এই পূর্ণতত্ত্ব। ২য়,—আমরা যাহাকে "আমি" "আমি" বলি সেই অস্মদ প্রত্যয়ের বস্তুই আত্মবস্তু, আর এই আত্মবস্তুই বিশ্বের পরমতত্ত্ব ও পূর্ণ তত্ত্ব। ৩য়,—এই আত্মার অন্বেষণ ও আত্মাকে জ্ঞানেতে প্রাপ্ত হওয়াই পরমানন্দ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণতত্ত্ব।

যাহাতে এই বিশ্ব সমস্যার নির্বিরোধ মীমাংসা হয়, তাহাকেই আমাদের দর্শনের পরিভাষায় তত্ত্ব কহে। এই ঋষি বাক্যেতে আমরা এই পূর্ণতত্ত্বের বা পরমতত্ত্বের একটা গভীর অনুভূতির প্রমাণ প্রাপ্ত হই। এই বিশ্বের বস্তু বা বিষয় অশেষ; চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ও এক নহে। ইহারা প্রত্যেকেই জাগতিক বস্তু সকলের এক একটী গুণ বা ধর্ম্মকে আমাদের জ্ঞানের বিষয় করিয়া থাকে। চক্ষু বস্তুর রূপ, কর্ণ শব্দ, নাসিকা গন্ধ, এইরূপে প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের নিকটে উপস্থিত করে। এখানে একত্বানুভূতির সম্ভাবনা কোথায়? বৃহদারণ্যক শ্রুতি কহিতেছেন, আপাততঃ যাহা বহুরূপে প্রতীত হইতেছে, মূলে তাহা বহু নহে। যাহা খণ্ড খণ্ড বলিয়া দেখা যাইতেছে, মূলে তাহা অখণ্ড। যাহা অপূর্ণ বোধ হইতেছে তাহা পূর্ণ। ব্রহ্মই সেই এক, সেই অখণ্ড, সেই পূর্ণ বস্তু বা পূর্ণ তত্ত্ব। চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সেই পূর্ণবস্তুরই বিবিধ ও বহুমুখী প্রকাশ মাত্র। এই জন্য ইহারা ব্রহ্মেরই নিদর্শন। সেই ব্রহ্মকে, সেই পূর্ণতত্ত্বকেই ইহারা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করে, কেবল মাত্র আংশিক বা খণ্ডবস্তুকে প্রকাশ করে না।

আত্মাই পূর্ণতত্ত্ব।

বাহিরের বিবিধ বিষয় ও জীবের এই সকল ইন্দ্রিয় যে ব্রহ্মের আংশিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়াদি মাত্র প্রকাশ করে, আত্মাই সেই ব্রহ্মের অখণ্ড

পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই আত্মার দ্বারাই "সূত্রে মণিগণা ইব"—হারের মণি সকল যেমন তার সূত্রেতে গাঁথা থাকে, সেইরূপ আমাদের দর্শনশ্রবনাদি নানাবিধ খণ্ডজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া জ্ঞানের বা অনুভূতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমরা চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখি, কর্ণের দ্বারা গন্ধ শুঁকি, ত্বকের দ্বারা স্পর্শলাভ করি; এ সকলই খণ্ডজ্ঞান। রূপ ও শব্দ, শব্দ ও স্পর্শ, স্পর্শ ও গন্ধ, এ সকল ভিন্ন ভিন্ন গুণের বিভিন্ন অনুভূতির বিষয়; আর এই সকল বিভিন্ন অনুভূতি কখনও একই কালেও জন্মিতে পারে না। প্রবল স্রোতবাহী জলপ্রবাহের, কিম্বা প্রবল ব্যাতামুখে বায়ুপ্রবাহের ন্যায় এ সকল অনুভূতি বিদ্যুৎবেগে ইন্দ্রিয়ের ও মনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। চক্ষু রূপই দেখে, কিন্তু এই রূপও অখণ্ড বস্তু নহে। রামের রূপ প্রথমে তার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমাহারে গঠিত; তার এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে যে বর্ণের আভা ফুটিয়াছে, তাহা বিন্দু বিন্দু বর্ণের সম্মিলনে রচিত। রূপ বস্তুও অখণ্ড নহে। চক্ষু কোন রূপই একেবারে ও একই সঙ্গে সমগ্রভাবে দেখিতে পায় না। টুকরা টুকরা করিয়া চক্ষু দেখে, কিন্তু এই খণ্ডগুলিকে একত্র করিয়া আত্মা বস্তুর রূপের জ্ঞান ফুটাইয়া তুলে। শব্দজ্ঞানও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির সংযোগে ও সমাহারে উৎপন্ন হয়। আর আত্মাই এই বিভিন্ন ধ্বনির সংযোক্তা। এই আত্মাই আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতার একত্বের ভূমি ও একীকরণের মূল সূত্র। এই আত্মাই আমাদের সকল অভিজ্ঞতার নিত্য সাক্ষী হইয়া এ সকলকে সম্ভব ও সার্থক করিতেছেন।

এই আত্মার অন্বেষণ, এই আত্ম-জিজ্ঞাসা ও যে আত্মজ্ঞানেতে এই জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়, সেই জ্ঞানই একমাত্র পরিপূর্ণ আনন্দ বস্তু। ইহাই পরিপূর্ণ জ্ঞান। এই আত্মাকে জানিলে আর অপর কোনও কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। হিন্দুর দর্শন চিরদিনই এই একত্বের অন্বেষণ করিয়াছে। এই

একত্বানুভূতিই হিন্দুর অন্তঃপ্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম্ম। এই সহজ বুদ্ধি প্রভাবে হিন্দু সর্ব্বদা বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, বিরোধের মধ্যে মিলন ও সন্ধি, বহুর মধ্যে এক, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে লক্ষ্য করিয়াছে। এই জন্যই বিশাল বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হইয়া হিন্দুর তত্ত্বান্বেষণ ও তত্ত্বপিপাসা চিরদিনই অনন্তের প্রতি একটা গভীর অনুরাগের প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। এই প্রেরণাতেই হিন্দু বলিয়াছে—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" অর্থাৎ যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই। আর এই ভূমাকে হিন্দু কেবল জ্ঞানের অজ্ঞেয় ভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। এই ভূমাই সমুদায় জ্ঞানের ও সমুদায় সত্তার আধার ও সম্ভাবনা রূপে রহিয়াছেন। ইনি কেবল আছেন, এই সাধারণ অস্তিত্ব মাত্র অনুভব করিয়াই হিন্দু ক্ষান্ত হয় নাই। সকল দেশের সকল তত্ত্ববিদ্যা এবং তত্ত্বমীমাংসাই কোন না কোনও আকারে এই অনন্তকে বা ভূমাকে মানিয়া লইয়াছে। হিন্দু কেবল অনন্তকে এই ভাবে মানিয়া লইয়া স্থির থাকিতে পারে নাই, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বহুবিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছে, এবং অপরোক্ষ অনুভূতিতে এই ভূমাকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' রূপে আপনার আত্মার মধ্যে এই আত্মার নিত্য সিদ্ধ একত্বের মূলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই নিগূঢ় একত্বানুভূতিই হিন্দুর নিকটে সাকারের মধ্যে নিরাকারকে, ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্তকে, বাস্তবের মধ্যে আদর্শকে, বুদ্ধির মধ্যেই যাহা বোদ্ধব্য, জ্ঞানের মধ্যেই যাহা নিত্য জ্ঞাতব্য, তাহাকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়াছে। হিন্দুর অস্থি-মজ্জা-গত এই সহজ প্রকৃতিসিদ্ধ একত্বানুভূতিই তাহার সমুদায় জ্ঞানান্বেষণ ও কর্ম্মচেষ্টার প্রেরয়িতা হইয়া হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংরাজীতে এক কথায় হিন্দুর বিশেষত্বের বা হিন্দুত্বের মূল সূত্রটি ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয় যে,—

"The Hindu not only starts from Experience as a homogenous whole, but always in investigating the manyfold in the real world, returns to the actual synthetic unity in the *Atma*."

বারান্তরে এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পৌরাণিকী কথা

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

হিন্দুর গৃহে পুরাণাদি পাঠ করিবার পূর্ব্বে এই শ্লোকটি পাঠ করিতে হয়। নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া তবে জয়োচ্চারণ করিবে; ইহাই হইল এই শ্লোকটির সহজ অর্থ। এই অর্থ বোধগম্য করিতে হইলে নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং সরস্বতী, এই কয়টি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে; পরে, পুরাণ পাঠের সময়ে জয়োচ্চারণই বা কেন করিতে হয়, তাহাও বুঝিতে হইবে; অনুষ্টুপ্‌ছন্দের শ্লোকটি দেখিতে ও শুনিতে আমাদের যত সরল বোধ হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তত সরল নহে; উহার মধ্যে অনেকগুলি কথা, অনেকগুলি সিদ্ধান্ত লুকান আছে। দেখা যাউক, কয়টা গুপ্ত কথা, বা কয়টা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।

প্রথমে দেখা যাউক, নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণুপুরাণের বচন ধরিয়া 'নারায়ণ' শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর সূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

"নারাজাতানি তত্ত্বানি নারানীতি বিদুর্বুধাঃ।
তান্যেব চায়নং তস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপিবা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥
"প্রকৃতেঃ পর এবাত্মাঃ স নরঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তস্যেমানি চ ভূতানি নারানীতি প্রচক্ষতে।
তেষামপ্যয়নং যস্মাত্তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

ইহাই হইল নারায়ণ শব্দের পৌরাণিকী ব্যাখ্যা। ইহা ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে নারায়ণ শব্দের অন্য অর্থ আছে। অপ্ শব্দের অর্থ জল; সমগুসীকৃত শক্তির যে সম্মূঢ়-ব্যাপ্তি তাহাকেও আপঃ বা নারা বলে, তাহাই যাহার অয়ন বা স্থিতির স্থান তিনিই নারায়ণ। প্রলয়কালে যখন সকল বিকশিত শক্তি সংহৃত হইয়া সামগুস্যের ব্যাপ্তিতে বিস্তৃত থাকে, তখন সেই ব্যাপ্তি বা সাগরবক্ষে যিনি ভাসমান থাকেন তিনিই নরায়ণ। জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেও বাহিরে স্থূলে ও সূক্ষ্মে যাহা কিছু আছে—থাকে—বা থাকিতে পারে, সে সকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তিনিই নারায়ণ। অথবা নরত্বের অয়ন যিনি তিনিই নারায়ণ। যাঁহা হইতে নরজাতির উদ্ভব হয়, যাঁহার কৃপায় সেই নর নরোত্তম আখ্যা লাভ করে, তিনিই নারায়ণ। তন্ত্র বলিতেছেন যে, যত জীব, তত শিব; প্রত্যেক জীবেই ভগবানের অংশ নিত্য বিদ্যমান। ভগবান অনন্ত শক্তির অনন্ত-গুণের আধার; তাঁহার অংশও অনন্ত শক্তির ও গুণের আধার; কেন না অনন্তের অংশ কখনই সান্ত হয় না, অনন্তের অংশও অনন্ত। তাই জীবও শিব এক ও অদ্বয়। যখন জীব বুঝিতে পারে যে, আমি শিব তখনই সে শিবত্ব লাভ করে। অনন্ত শিবশক্তির অসীম সাগরের এক একটি বুদ্‌বুদ্ এক একটি সৃষ্টি, যেন এক একটি ব্রহ্মাণ্ড; সেই অনন্তকোটি বুদ্‌বুদ্ খচিত শক্তিসাগরে যিনি

লীন তিনিই নারায়ণ। সুতরাং প্রতি জীবেই নারায়ণের অংশ নিত্য বিদ্যমান; লোকসমাহার জনসঙ্ঘ নারয়ণের একটি রূপ—একটা প্রকট মূর্ত্তি।

নর শব্দের অর্থে বিষ্ণু বুঝায়; স্বয়ং জনার্দ্দনকে নর শব্দে আখ্যাত করা হইয়াছে। সুতরাং তিনিই নরোত্তম যিনি পুরুষোত্তম। নর, নরোত্তম ও নারায়ণ এই তিনই এক, একই তিন। প্রথমে বৈষ্ণবীশক্তিসম্পন্ন সজীব পুরুষ বা নর বা মানুষ; তাহার পর ধরার ভার হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি নরোত্তম বা পুরুষোত্তম; তিনিই আদর্শ পুরুষ, আদর্শ নর। এই নর এবং নরোত্তমের আধারভূত যিনি তিনিই নারায়ণ। এই তিনই যে এক, এবং এক হইতেই তিন, তাহা বলিল কে?—বুঝাইল কে? উত্তরে বলিব,—বাক্, বাণী, সরস্বতী। তিনি কি বলিয়াছেন? একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি আর কি বলিয়াছেন? তত্ত্বমসি। তিনি আরও কি বলিয়াছেন? একোঽহং বহুস্যামঃ। শেষে তিনি দেবীসূক্তে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন,—

"ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ইত্যাদি।

অর্থাৎ "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যাভিধীয়তে"—যে দেবী সর্ব্ব-ভূতে চেতনারূপিণী, যিনি রুদ্র, যিনি ইন্দ্র, যিনি মিত্র, যিনি বরুণ, যিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে, সর্ব্বত্রে সর্ব্বব্যাপারে পরিব্যাপ্তা তিনিই বুঝাইয়া দেন নর, নরোত্তম ও নারায়ণ একই, তিন ভিন্ন নহে। তিনিই বুঝাইয়া দেন যে, নর ইচ্ছা করিলে নরোত্তম হইতে পারে, শেষে নারায়ণে আত্মসংবরণ করিতে পারে; অনন্ত শক্তি সম্পন্ন জীবের উন্নতির অবধি নাই। এই বোধটুকু লাভ হইলে পর নর, নরোত্তম, নারায়ণ এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে। কেন জয়োচ্চারণ করিবে? যেহেতু এই বোধ হইলে জীবের তখন

আর কোন ভয় থাকিবে না,—শোকের ভয়, মোহের ভয়, পতনের ভয়, চিরনৈরাশ্যের ভয়—কোন ভয়ই থাকে না। যাহার দ্বারা ভয় দূর হয়, যিনি অভয় দান করেন, তাঁহাকে দেখিতে বা চিনিতে পারিলে তাঁহারই জয়োচ্চরণ করিতে হয়। পুরাণে তাঁহারই লীলা-ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। তাঁহাকে চিনিবার ও বুঝিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই পুরাণ পাঠের পূর্ব্বে ও শেষে এই ভাবে নর, নরোত্তম নারায়ণ এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া সানন্দে নারায়ণের জয়োচ্চারণ করিতে হয়।

ইহা হইল পৌরাণিকী ব্যাখ্যা। এইবার মুমুক্ষু ও ভক্তের দিক্ দিয়া কথাটা বুঝিতে হইবে। নারায়ণ অব্যক্ত পুরুষ, বেদান্ত মতে "শুদ্ধান্তর্যামিসূত্রবিরাড়াখ্যাঃ"—তিনি শুদ্ধ ও অন্তর্যামিপুরুষ।

"সারূপ্যমুক্তি বচনো নারেতি চ বিদুর্বুধাঃ।
যো দেবোঽপ্যয়নং তস্য স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"
"নারাশ্চকৃত পাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতং।
যতো হি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"
নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতং।
তয়োর্জ্ঞানং ভবেদ্‌যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

পাপের মুক্তি, নরত্বের হীনতা হইতে মুক্তি যাহা হইতে হয় তিনিই নারায়ণ। অথবা যাহা হইতে মোক্ষের জ্ঞান হয়, বন্ধন ভয় দূর হয়, তিনিই নারায়ণ। যাহা ভয় তাহাই পাপ, যাহা অভয় তাহাই পুণ্য। বাধাই ভয়, বাধাই দুঃখ; যাহার বাধা নাই, তাহার দুঃখ নাই; সুতরাং সেই নির্ভয় পুণ্যবান। যিনি বাধা হইতে, দুঃখ হইতে, ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনিই নারায়ণ। ভয় দূর হয় কেমন করিয়া? যিনি ভয়হারী তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে, তিনি যে সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা সদাই অনুভব করিতে পারিলে, তাঁহার রাজ্যে,—খাস্‌তালুকে বাস করিতে পারিলে,

তাঁহার সেবক সহচর হইয়া থাকিতে পারিলে, অথবা তাঁহাতে স্বীয় সত্ত্বা ডুবাইতে পারিলে, আর কোন ভয় থাকে না। সাযুজ্য সামীপ্য, সারূপ্য ও সালোক্য—এই চারি প্রকারের মুক্তির কোন একটি মোক্ষপদ লাভ করিতে পারিলেই নির্ভয় হওয়া যায়। ভক্ত বলেন, আমি তাঁহাতে মিশিতে চাহি না, তাঁহার আকারে আকারিত হইতে চাহি না,—আমি চাহি তাঁহার সেবা করিতে, তাঁহার লীলা-নাট্য দর্শন করিতে, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিতে। পুরাণে তাঁহার লীলা-ব্যাখ্যা আছে, কেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয় তাহার পদ্ধতি ও ক্রম পুরাণে লিখিত আছে, জীবন কি ভাবে পরিচালিত হইলে কোন পথে যাইলে কতকটা নির্ভয় হওয়া যায় তাহাও পুরাণে বিশদ ভাবে, অর্থবাদের আবরণে, লিখিত আছে, অতএব পুরাণ পাঠের পূর্ব্বে সেই ভয়হারী নারায়ণের নমস্কার করিতে হয়। নর কেমন করিয়া নরোত্তম হয়, সেই নরোত্তম কেমন করিয়া নারায়ণের দেহ, হইতে সঞ্জাত তাহা পুরাণের বাণীই প্রকট করিয়াছেন। যে নর নরোত্তম হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে, যে নরোত্তম নারায়ণের অংশ-স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছেন, ইঁহাদের দুইজনকে আমি প্রণাম করি। আর যে পুরাণের বাণী আমাকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছে, তাহাকেও প্রণাম করি। কেবল প্রণামই নহে, সঙ্গে সঙ্গে জয়োচ্চারণ করিব; কারণ, আর ত ভয় নাই, গুরুপুরাণ আমাকে সেবার পথ, কৈঙ্কর্য্যের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। সর্ব্বভয়হর, সর্ব্বতাপ-হর, সর্ব্বপাপহর শ্রীভগবানের আমি কিঙ্করতা লাভের উপায় পাইতেছি, অতএব—জয়-জয়-জয়!

পুরাণ সকল লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যেই লিখিত। সে লোক-শিক্ষাটা কেমন? সংহতিঃ কার্য্য সাধিকা—মনুষ্য সকলের একীকরণেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমে যাহাদের লইয়া সংহতি তাহাদের প্রত্যেককে খাঁটি করিয়া গড়িতে হইবে। ধর্ম্ম শিক্ষা না পাইলে মানুষ মানুষ হয় না, নরাকারে পশুবৎই থাকিয়া

যায়। যাহা নরত্বকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই নরের ধর্ম্ম। জীবত্ব হেতু নরে এবং পশুতে অনেক গুণ-সামান্য আছে। যে সকল গুণের জন্য নরের বিশিষ্টতা রক্ষিত হয়, নর নরোত্তম হইতে পারে, তাহাই নরের বিশেষ গুণ। আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি দেহীর যে সামান্য গুণ আছে তাহা নরেও যেমন আছে, পশুতেও তেমনি আছে। পরন্তু শম দমাদি গুণসকল নরের পক্ষে বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ গুণ সকল বা মানব ধর্ম্মের সম্যক্ উন্মেষ মনুষ্যসমাজে ঘটিলে, তেমন মনুষ্য সংহতিই কার্য্য সাধিকা হয়। তাই পুরাণ আর কাহাকেও নমস্কার করেন না, কেবল 'জগদ্ধিতায় গোবিন্দায় নমোনমঃ' বলিয়া থাকেন। জগতের হিতের জন্য, সমাজের মঙ্গলকামী হইয়া পুরাণ লিখিত এবং পঠিত হয়। নর নরোত্তম হইতে শিথিলে, নরোত্তম নারায়ণের অংশ-স্বরূপ বলিয়া জানিলে, জগতের হিত নিশ্চয়ই হয়। যে বাণী এই হিতসম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন, তিনিই নর ও নরোত্তমের মধ্যগতা হইয়া উভয়ের পরিচয় সাধন করিয়া থাকেন। সে পরিচয়ের কথা পুরাণেই পাওয়া যায়। নরকে নরোত্তম হইতে হইলে কত অসংখ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, কতবার পড়িতে হয়, আবার উঠিতে হয়, তাহারও বিবরণ পুরাণেই পাওয়া যায়। পুরাণ কেবল ইতিহাস বা 'হিষ্টরি' নহে, উহা মানবতার উত্থান-পতনের আখ্যায়িকা মাত্র—মানবতার বিশ্লেষণ ও পরিপোষণের উপাখ্যান মাত্র। শাস্ত্রের হিসাবে কেমন করিয়া মানুষ মানুষ হইতে পারে, তাহারই ইতিহাস পুরাণে পাওয়া যায়। তাই সে ইতিহাস পাঠের পূর্ব্বে নরনারায়ণকে প্রণাম করিতে হয়—দেবী সরস্বতীর অর্চ্চনা করিতে হয়।

আমার পুরাণ কোন দেশের? "গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি,—নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু" বলিয়া যে দেশে পিতৃপিণ্ড অর্পণ করিতে হয়, সেই সপ্তসরিদ্বারা বসুন্ধরাই

আমার পুরাণের দেশ—জন্মভূমি। যে জাতি বা জাতি সকল ঋষি মুনিগণের বংশধর বা বংশরক্ষক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকে, তাহাদেরই পিতৃপরিচয়, পূর্ব্বগামিগণের কীর্ত্তিপরিচয়, নরত্ব উন্মেষের শ্লাঘার পরিচয়, আত্মদানের গৌরব পরিচয় এই পুরাণ সকলের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে লিখিত আছে। পুরাণ নিদ্রিতকে জাগ্রত করে, মূককে সজ্ঞান করে, বিহ্বলকে শান্ত করে, মরণভয় ভীতকে অমর করিয়া তুলে। পুরাণ দুর্ব্বলদৃষ্টি নরের ঈক্ষণ যন্ত্র, পুরাণ অন্ধের যষ্টি, বিষণ্ণের তুষ্টি, প্রমত্তের তৃপ্তি ও শান্তি। কেননা, পুরাণ আমাদের দেশের আমাদের জাতির এবং নরনারায়ণের গাথায় পরিপূর্ণ। তাই আমার বাণী, আমার মেধা, আমার স্মৃতি আমার চিত্ত, আমার বুদ্ধি—আমার সরস্বতী—আমার অনুকূল না হইলে আমার পুরাণ আমি বুঝিতে পারি না। আমার পুরাণ আমি বুঝিতে না পারিলে আমি তীর্থচ্ছিন্ন নৌকার ন্যায় অনন্তকাল সমুদ্রে মৎস্যযন্ত্রহীন হইয়া, বিক্ষিপ্তের ন্যায়, কেবল ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াই, আমার জাতিগত, ধর্ম্মগত, বংশগত কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমাতে থাকে না। পুরাণ বিশ্বমানবতা বা নারায়ণের ভূমা ভাব সংসারী জীবকে বুঝাইয়া দেন না; কারণ পুরাণ বলেন যে, বংশের ধারার প্রভাব এবং দেশবিশেষের জলবায়ুর এবং সেই দেশের বিন্যাস প্রভাব মানুষ এড়াইতে পারে না। যতদিন মানুষের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল থাকে, ততদিন মানুষ জন্মের ও জন্মভূমির ভাব এড়াইয়া স্বতন্ত্র ও অভিনব জীবে পরিণত হইতে পারে না। তাই এই দুই সংস্কারের গণ্ডীর ভিতরে রাখিয়া নরকে নরোত্তম করিবার পথ পুরাণ দেখাইয়া দিতেছেন। আমার জন্মভূমি কেবল সপ্তসরিদ্বরাই নহেন; যিনি আমার জননী, আমার জাতির জননী, আমার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদরী, তাহারই সতীদেহের একান্ন খণ্ডের দ্বারা আমার জন্মভূমি খচিত—পবিত্রীকৃত। তাই বিশ্বজননী, আমার জননী এবং আমার জন্মভূমি,—এই তিনই এক, একই তিনে পরিব্যাপ্ত। পক্ষা-

স্তরে আমি নর, আমার নরোত্তম এবং আমার নারায়ণ এই তিনই এক, একেই তিন পরিব্যাপ্ত। এই ত্রয়ীর বিশ্লেষণ ও সমীকরণ যাহাতে আছে তাহাই পুরাণ। সেই পুরাণ জগদ্ধিতায়—গোবিন্দায় বিনিযুক্ত।

এইবার পুরাণ শব্দের পারিভাষিক অর্থের আলোচনা করিব। পুরাণ ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, উহার অর্থ "ব্যাসাদি-মুনি-প্রণীত-বেদার্থবর্ণিত-পঞ্চলক্ষণান্বিত শাস্ত্রম্"। অর্থাৎ পঞ্চলক্ষণযুক্ত বেদার্থ প্রকাশক এবং ব্যাসাদি মুনি প্রণীত যে শাস্ত্র তাহাই পুরাণ। পুরাণের পঞ্চ-লক্ষণ এই,—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।"

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত—ইহাই পুরাণের পঞ্চলক্ষণ। ব্যাসাদিমুনিপ্রণীত যখন বলা হইল, তখন একা ব্যাসই অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ "ব্যাস" শব্দটা উপাধিবাচক; যাহারা শাস্ত্রব্যাখ্যাতা কথক এখনও রাজপুতানা ও পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে তাহাদিগকেই "ব্যাস" বলা হইয়া থাকে। অষ্টাদশ পুরাণ ভাল করিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে "ব্যাস" একজন ছিলেন না। অনেকগুলি ব্যাসের কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। আবার ইহার মধ্যে আরও একটু মজার কথা আছে।" "ইতিহাসো ভারতঞ্চ বাল্মীকং কাব্যমেবচ"—অর্থাৎ মহাভারত গ্রন্থকে ইতিহাস বলা হয়; বাল্মীকীরামায়ণ পুরাণও নহে, ইতিহাসও নহে, উহা কাব্য মাত্র। প্রত্যেক পুরাণে যেটুকু বংশানুচরিত আছে সেইটুকুই ইতিহাস, বাকী সব সল্প-গাছা, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, অর্থবাদ, রোচক মাত্র। কিসের অর্থবাদ?

"ধর্ম্মাধর্ম্ম-পরিজ্ঞানং সদাচার প্রবর্ত্তনং।
গতিশ্চ পরমা তদ্বদ্ভক্তির্ভবতি প্রভো।
তানি তে কথয়িষ্যামি সপ্রমাণানি ভূতলে।"

অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিজ্ঞান, সাদাচারের প্রবর্ত্তন এবং ভগবানে পরমা ভক্তি যাহার দ্বারা ভূতলে প্রমাণসহ প্রচারিত হয় তাহাই পুরাণ। শাস্ত্র তিন রকমে সাধকগণের সহিত কথা কহিয়া থাকেন। প্রথম—রাজবাণী; যথা বেদ ও গৃহ্য সূত্র। এখানে কেবল হুকুম, কেবল আদেশ; সে হুকুম অনুসারে কাজ করিতেই হইবে, না করিলে পাপভাগী হইতেই হইবে। দ্বিতীয়—মিত্রবাণী; যথা দর্শন শাস্ত্র। মিত্রের সহিত কথা কহিতে হইলে যেমন যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া কথা কহিতে হয়; তাহাকে তর্কে হারাইয়া স্বীয় মতানুকুল করিতে হয়, তেমনি দর্শন শাস্ত্রে কেবল বিচার, কেবল তর্ক আছে। রাজাদেশের ন্যায় কোন আদেশ দর্শন শাস্ত্র করেন না,—'আমি বলিতেছি' বলিয়া কোন কথা মান্য ও গ্রাহ্য করিতে কাহাকেও বলেন না। ইহাই মিত্রবাণী। তৃতীয়—কান্তাবাণী; যথা পুরাণোতিহাস স্ত্রীকে কোন কথা বুঝাইতে হইলে যেমন গল্পগাছা করিয়া বুঝাইতে হয়, যেমন কাহারও তুলনা দিয়া বলিতে ও বুঝাইতে হয়; পুরাণ শাস্ত্রও তেমনি বেদ এবং তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল আখ্যায়িকা ও উপাখ্যানের সাহায্যে জন সাধারণকে বুঝাইয়া থাকেন। তাই পুরাণের কথাকে কান্তাবাণী বলে। পুরাণ ব্যাখ্যান শাস্ত্র, সিদ্ধান্তের শাস্ত্র নহে; বেদ, উপনিষদ, তর্কশাস্ত্র যে সকল সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদি সম্মত বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন, গল্পের ছলে পুরাণ তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পুরাণের আবার তিন শ্রেণী আছে; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন ভাগে অষ্টাদশ মহাপুরাণ বিভক্ত। সাত্ত্বিক পুরাণে মোক্ষের ও ভগবদ্ভক্তির কথাই প্রশস্ত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং শ্রীভগবানের লীলা-নাট্যেরই বর্ণনা হইয়াছে। বিষ্ণু, নারদ, শ্রীমদ্ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই ছয়টিই সাত্ত্বিক পুরাণ। রাজসিক পুরাণে সমাজ রক্ষা, সমাজ বিন্যাস, রাজধর্ম্ম, প্রজাপালন, জাতিরক্ষা প্রভৃতি সমাজ-তত্ত্বের কথা পরিষ্কার করিয়া বলা আছে। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত;

মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম পুরাণসকলকে রাজসিক পুরাণ বলে। যাহাতে ব্যক্তিগত ঋদ্ধি সিদ্ধির কথা আছে, ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রবল ভাবে ফুটান হইয়াছে তাহাই তামস পুরাণ। মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, অগ্নি ও স্কন্দ, এই কয়টীকে তামস পুরাণ বলে। সাম্প্রদায়িকতার হিসাবেও পুরাণ সকলকে উত্তম মধ্যম ও অধম, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বৈষ্ণব বিষ্ণু নারদাদি পুরাণ সকলকে শ্রেষ্ঠ বলেন; শাক্ত ও শৈব, মার্কণ্ডেয়, শিব, স্কন্দাদি পুরাণ সকলকে শ্রেষ্ঠ পদ দিয়া থাকেন। তবে বাঙ্গালার শাক্ত এক মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ছাড়া পুরাণের আর কোন অংশ লইয়া তেমন ব্যস্ত নহেন। পুরাণের হিসাবে বল, আর ইতিহাসের হিসাবেই বল, বাঙ্গালার শাক্ত কেবল মহাভারত পাঠই শুনিতেন, আর নিত্য চণ্ডি পাঠ করিতেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কেবল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই পাঠ করিতেন। ইংরেজের আমলের পর, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে পর বাঙ্গালার শ্রীমদ্ভাগবত গীতার আদর বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে উহা পশ্চিমের দশনামী দণ্ডী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত চিল; গৃহস্থ গৃহে কদাচিৎ উহা পঠিত হইত। আচার্য্য রামানুজ গীতাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত-বাদ প্রচারক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রমাণবচন উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বাল্মিকীর রামায়ণ পুরাণও নহে ইতিহাসও নহে; উহা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধানকাব্যগ্রন্থ। বাল্মিকী কবিগুরু, একজন মুনি মাত্র, ঋষিও নহেন। তবে রামানুজাচার্য্যের সময় হইতে শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার মান্য করিয়া তাঁহার পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। রামানন্দ এবং পরে তুলসীদাস রামপূজার পথ উত্তর ভারতে সর্ব্বজনমান্য করিয়া যান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময়ে বাঙ্গালার দ্বিভুজমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের পূজার প্রবর্ত্তনা করেন, সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে অযোধ্যায় এবং চিত্রকুট প্রদেশে সাধারণ ভাবে রামপূজা

পদ্ধতি প্রচলিত হয়। রাম ইষ্টদেবতা নির্দ্দিষ্ট হইবার পর তবে রামায়ণ ধর্ম্মগ্রন্থ রূপে গ্রাহ্য হইয়াছে। পশ্চিমের রামসেবকদিগের ব্যবহার দেখিলে বলিতে হয় যে, উহারা তুলসীকৃত রামায়ণকেই ধর্ম্মগ্রন্থ রূপে গ্রাহ্য করে, বাল্মিকীরামায়ণকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তেমন মান্য করে না। বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য বৈদিকগণ আসিয়া বাস করিলে এবং গুরুর আসন প্রাপ্ত হইলে পর, রামপূজা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ভট্টপল্লির বৈদিকগণ সবাই রামাত বৈষ্ণব; তবে তাঁহারা বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বাধ্য হইয়া তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাঁদের চেষ্টাতেই বাঙ্গালায় এক কালে রামকথার প্রচার হইয়াছিল। এই ত গেল পুরাণের কথা। ইহা ছাড়া উপপুরাণ আছে; তাহাদেরও সংখ্যা অষ্টাদশ। শাস্ত্র কোনখানে পুরাণকে গল্প গাছার গ্রন্থ ছাড়া অন্য কিছু বলেন নাই।

পুরাণাখ্যানকং বিপ্র নানাকল্প সমুদ্ভবম্।
নানা কথা সমাযুক্তমদ্ভুতং বহুবিস্তরম্॥"

কিন্তু পুরাণের স্তুতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে,—

'চতুর্ব্বর্গস্য বীজঞ্চ শতকোটী প্রবিস্তরম্।
প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণাদভবত্ততঃ॥"

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের বীজ পুরাণে সমাহিত, পুরাণ পাঠ করিলে সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবৃত্তি জন্মে। সুতরাং পুরাণ রোচক শাস্ত্র; উহার সাহায্যে নরনারী সাধন শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরাণ সমাজের ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণপ্রদ; ব্যষ্টি বা ব্যক্তিকে সাধন পথ দেখাইয়া দেয়, তাই উহা কল্যাণপ্রদ; সমষ্টিকে মধুরভাবে বিভোর করিয়া রাখে, তাই উহা সমষ্টির মঙ্গল-সূচক। পুরাণ একলা শুনিতে নাই; আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব, প্রতিবেশী পল্লিবাসী সকলকে সঙ্গে করিয়া, একস্থানে সমবেত হইয়া পুরাণ পাঠ শুনিতে হয়। প্রত্যেক পুরাণেরই দুই দিক্ দিয়া অর্থ করা

যায়; এক সমাজতত্ত্বের দিক্ দিয়া, অপর দেহতত্ত্বের দিক্ দিয়া। দেহতত্ত্বের একটা সিদ্ধান্ত ধরিয়া বহু পুরাণে এমন এক একটা আষাঢ়ে গল্পের সৃষ্টি করিয়া ইঙ্গিতে গুপ্তকথা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তাহা একটু তলাইয়া বুঝিতে গেলেই বিস্ময়ে অবিভূত হইতে হয়। ইংরেজি বুদ্ধির মাপ কাটি লইয়া পুরাণ বুঝিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। আবার বলি, পুরাণ হিষ্ট্রী নহে, তোয়ারীখ নহে—গাথা, কথা উপাখ্যান আখ্যায়িকার সমাহার মাত্র। পুরাণ সমাজ শিক্ষার যন্ত্র, সাধকের ইঙ্গিতের গ্রন্থ, সাধনার রোচক মাত্র। তাই পুরাণকে নারায়ণী শাস্ত্রও বলা হইয়া থাকে, —নরসমাজ রক্ষার—নরত্ব রক্ষার শাস্ত্র যাহা তাহাই নারায়ণী শাস্ত্র। গরুড় পুরাণ পাঠ করিলে মনে হয় নর-সমাহারকে—নরত্বকে নারায়ণ বলা হইয়াছে। ইংরেজিতে নারায়ণকে super-man এবং humanity দুই বলা যায়। সেই নর-নরোত্তম-নারায়ণকে বার বার প্রণাম করিয়া, নারায়ণ পরায়ণ হইয়া আজ "নারায়ণের" সেবাব্রতে দীক্ষিত হইলাম। যুগে যুগে তুমি কত রূপ ধারণ করিয়াছ, কত ভাবের প্রচার করিয়াছ; আজ নারায়ণের অঙ্গীভূত হইয়া বাঙ্গালার তথা ভারত ভূমির নর-নারায়ণের পুষ্টিকল্পে অবতীর্ণ হও,—আমাদের নরদেহ ধারণ সার্থক হউক।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃন্দাবন।

'নারায়ণ' পত্রের সম্পাদক মহাশয় আমার উপর এক অতি কঠিন কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনি যদি আমাকে তাঁহার পত্রে 'যা-হয় একটা কিছু' লিখিবার জন্য ফরমাইস করিতেন, তাহা হইলে আমি নিঃসঙ্কোচে লেখনী ধারণ করিতে পারিতাম। অনেক বাজে জিনিস বাঙ্গালা মাসিক পত্রগুলির মারফৎ সাহিত্যের হাটে হাজির করিয়াছি,—আর একটা না হয় বাড়িবে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় প্রচলিত সম্পাদকীয় মামুলী 'যা-হয় একটা কিছু' চান না,—তিনি চান ভ্রমণ-বৃত্তান্ত! আমি সঙ্কুচিত ভাবে বলিলাম, "ভ্রমণ ত করি না, বৃত্তান্ত আসিবে কোথা হইতে?" আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, সম্পাদক মহাশয় সুধু কবি ও সাহিত্যিক নহেন, তিনি ব্যবহারাজীব—বড় বারিষ্টার—জেরায় পঞ্চমুখ। তিনি একেবারে তিন চারিটি প্রশ্ন ডিঙ্গাইয়া বলিলেন "আপনি কি কখন বৃন্দাবনে যান নাই"? অস্বীকার করিতে পারিলাম না, বলিলাম "অনেকবার গিয়াছি"। তিনি অমনি বলিয়া বসিলেন "তাহারই একবারের কথা লিখিয়া দিতে হইবে"। আমি মৌন রহিলাম, তিনি বুঝিলেন উহা সম্মতির লক্ষণ। কিন্তু আমি যে কি জন্য মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা ত তিনি বুঝিতে পারিলেন না, আমিও তখন বলিতে পারিলাম না;—যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাঁহাদের কাছে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারি না, কথা যেন কেমন বাধিয়া যায়,—আমি ঐ প্রকার অবস্থায় পড়িলে প্রায়ই চুপ করিয়া থাকি।

তখন আমার মনে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তখন বলিতে পারি নাই, এখন একেলা বসিয়া লিখিতে পারি। আমার মনে হইয়াছিল আমার বয়স যে দুই যুগের উপর বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা কি ইহাঁরা ভুলিয়া গেলেন? যখন 'হিমালয়' 'প্রবাসচিত্র' 'পথিক'

লিখিয়াছিলাম, তখন আমি যে পৃথিবীতে বাস করিতাম, যে ভাবের ঘোরে অভিভূত ছিলাম, সে পৃথিবীর উপর দিয়া মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে, সে ভাবের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, সে বীণার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সে মুক্তপক্ষ বিমানবিহারী বিহঙ্গ এখন লৌহপিঞ্জরে বসিয়া প্রতিপালকের শিখান 'রাধাকৃষ্ণ' বলে,—মনের আবেগে কথা বলিবার শক্তি সামর্থ্য তাহার নাই! সে দিন নাই, বন্ধু, সে দিন নাই!

কথাগুলি সে সময় বলিতে পারিলে হয় ত আমি এ দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতাম; কিন্তু কাজের সময় ঠিক ঠিক মত কথা বলিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয় জানিয়াও কথা বলিতে পারিলাম না। অতএব আমাকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতেই হইবে; পারি আর নাই পারি, অনুরোধ প্রতিপালন করিতেই হইবে।

তাহার পর আর একটা কথা সকলে ভাবিয়া দেখিবেন। দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ লাহোর প্রভৃতি স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভাল হউক আর মন্দ হউক লেখা সহজ। অনেকে শুনিয়াছি স্থান না দেখিয়াও লিখিয়া দিতে পারেন। আমি সে বিদ্যা শিক্ষা করি নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারি না, কত ত্রুটী থাকিয়া যায়, —না দেখিয়া লেখা ত বহু দূরের কথা। তবুও না হয় দিল্লী লাহোর এক রকম করিয়া বলিয়া দিতাম; কিন্তু এ ত দিল্লী লাহোর নহে—এ বৃন্দাবন—এ ব্রজভূমি—এ কিশোর কিশোরীর লীলা নিকেতন—এ গোপগোপীর আনন্দ ভবন—এ প্রেমের নন্দন কানন—এ বৃন্দাবন! কত কত প্রেমিক ভক্ত যে স্থানের নাম স্মরণ করিয়াই প্রেমপুলকে অধীর হইয়া পড়েন, কঠোর শুষ্কহৃদয় ভজন-পূজন বিহীন আমি সেই বৃন্দাবনের কথা কেমন করিয়া বলিব। যে বৃন্দাবনের ক্রোড়বাহিণী যমুনার কথা মনে হইলেই উচ্চস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে—

"যমুনে, এই কি গো সেই যমুনে প্রবাহিনী।
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমনি।"

—সে যমুনার কথা আমি কেমন করিয়া বলিব? বৈষ্ণব কবিগণ যে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া লেখনী ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে বৃন্দাবনের কথা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব —সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তবুও বৃন্দাবনের কথা বলিতে হইতেছে। আমি তিন চারি বার বৃন্দাবন দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। প্রথমবার যখন যাই তখনকার কথাই আজ বলিব, কারণ সেই আমার প্রথম শ্রীধাম দর্শন। আমি তখন পশ্চিম দেশে থাকিতাম; কাজ কর্ম্মের মধ্যে ভ্রমণ। এই ভ্রমণ উপলক্ষে একবার আগ্রার তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম। আগ্রার কথা বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং তাহা আর বলিয়া কাজ নাই।

আমি যখন তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম সেই সময়ে সেখানেই একটি ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত আমার আলাপ হয়। যুবকটি আগ্রা কলেজে বি, এ, শ্রেণীর ছাত্র। তাঁহার বাড়ী মথুরায়। তাঁহার সহিত কথা বলিতে বলিতে আমি মথুরা বৃন্দাবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি যখন শুনিলেন যে, আমি মথুরা বা বৃন্দাবন দর্শন করি নাই, তখন তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিলেন যে, তিনি সেই রাত্রির গাড়ীতেই বাড়ী যাইতেছেন; আমি যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে মথুরা বৃন্দাবনে যাইতে পারি। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে গেলে আমার থাকিবার খাইবার ও দেখাশুনার কোন অসুবিধাই হইবে না। এ সকল অসুবিধার কথা আমার কোন দিনই মনে হয় নাই; কি খাইব, কোথায় থাকিব, কি হইবে, এ সকল ভাবনা আমার মনে স্থান পাইলে আমি এ পথে পদার্পণ করিতাম না। কষ্ট, অসুবিধা, অনাহার, এ সকল কোন দিনই আমি গ্রাহ্য করি নাই, আমি সকলই সহ্য করিতে শিখিয়াছিলাম। তাই হিমালয়ের মধ্যে আমি মারা যাই নাই, তাই তখন আমার ভোগের শেষ হয় নাই।

মথুরা বৃন্দাবন আগ্রার অতি নিকট, আর আমারও অন্য কোথাও কাজ বহিয়া যাইতেছে না। সে সময় আমার যে প্রকার মনের অবস্থা ছিল, তাহাতে কোন রকমে দিনের পর দিন কাটিয়া গেলেই আমি বাঁচিতাম—একেবারে সকল দিনগুলি যদি একদিনে আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহাতেও আমার আপত্তির কোন কারণ ছিল না—তাহার জন্য আমি তখন প্রস্তুতই ছিলাম। সময়ের যে কোন মূল্য আছে, জীবনের যে কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহা আমি তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আর এখন—এখন সেই পরিপূর্ণ অপব্যয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য দিবানিশি খাটিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাক্—নিজের দুঃখের কথাই পাঁচ কাহন করিয়া আর কাজ নাই।

আমি যুবকের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলাম। তখন দুইজনে তাজমহল হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে সহরের দিকে আসিতে লাগিলাম। আমি আগ্রা কেল্লার নিকট রেল ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী একটা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার সঙ্গে যে জিনিসপত্র ছিল তাহা সেখানেই রাখিয়া আহারান্তে তাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। জিনিসপত্রের কথা শুনিয়া পাঠক পাঠিকাগণ যদি ট্রঙ্ক, বাক্স, বিছানা প্রভৃতি বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার কথা আমি ফিরাইয়া লইতেছি। পথে চলিতে গেলে যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই জিনিসপত্র। আমার তখন প্রয়োজন হইত দিনের মধ্যে একবার স্নান করা, আর এক বেলা হউক বা দুই বেলা হউক দুইটা আহার করা। ইহা ব্যতীত আমার কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। আহারটা কখনও বা হোটেলে হইত, কখনও বা কাহারও বাড়ীতে 'নমো নারায়ণ' বলিয়া উঠিয়াই হইত; সুতরাং থালা গ্লাস ঘটি বাটি প্রভৃতির প্রয়োজন কোন দিনই হয় না,—লোকালয়েও না, হিমালয়েও না। এক স্নানের প্রয়োজন; তাহার জন্য একখানি কাপড় ও একখানি গামোছা সঙ্গে থাকিলেই হইত। তাহারা দুইজনে স্নানের ব্যবস্থা করিত এবং শয়নের সময় তাহাদের মধ্যে কাপড়খানি তোষক এবং গামোছাখানি বিছানার চাদরের কাজ করিত—আমি রাজা মহারাজার মত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতাম। এখন বুঝিলেন আমার জিনিসপত্র কি?—একখানি কাপড় আর একখানি গামোছা। লোকালয়ে ইহাই আমার জিনিসপত্র ছিল, হিমালয়ে উহাও থাকিত না। সে কথা এখন থাকুক্।

যুবকটির সহিত আসিবার সময় তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলাম। তিনি বলিলেন তাঁহার পিতামাতা বর্ত্তমান আছেন; পিতা মথুরার জজ আদালতের উকিল, বেশ পয়সাকড়ি পান। তাঁহার আর ভাই নাই; দুইটি ভগিনী আছেন। একটি বিধবা, তাঁহাদের বাড়ীতেই থাকেন, আর একটি সধবা, তিনি শ্বশুরগৃহেই থাকেন। যুবকের বিবাহ হয় নাই; লেখাপড়া যাহা হয় একরকম শেষ না হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিবাহিত করিবেন না। তিনি আমার পরিচয়ও গ্রহণ করিলেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে আমরা ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে তাঁহাদের ছাত্রাবাসে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম। তখন ঠিক হইল যে, আমি রাত্রিতে ষ্টেশনে যাইব এবং সেখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। রাত্রি তিনটার পর একখানি গাড়ী আগ্রা হইতে মথুরার দিকে যায়, সেই গাড়ীতে যাওয়াই স্থির হইল। যুবক আমাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর জলযোগ শেষ করিয়া আমার 'জিনিসপত্র' লইয়া ষ্টেসনে গেলাম। ধর্ম্মশালায় থাকিলে অত রাত্রিতে কে আমাকে জাগাইয়া দিবে? তাই ষ্টেসনে যাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মুসাফিরখানার বিস্তৃত কক্ষে কাপড়খানির অর্দ্ধাংশ বিছাইয়া এবং অপরার্দ্ধ জড়াইয়া তাহার উপর গামোছাখানি দিয়া একটি পরম সুন্দর উপাধান প্রস্তুত পূর্ব্বক সুখশয্যায় শয়ন করিলাম। দেখিতে দেখিতেই নিদ্রাদেবী

আমাকে তাঁহার শান্ত ক্রোড়ে স্থান দান করিলেন। কি শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে তখন দিন কাটিত!

শেষরাত্রিতে যুবকের ডাকাডাকিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি উঠিয়া বসিতেই যুবক বলিলেন "গাড়ী প্লাটফরমে আসিয়াছে, ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, চলুন"। আমি বলিলাম "আমাকে একটু পূর্ব্বে ডাকেন নাই কেন"? তিনি বলিলেন "আপনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া এতক্ষণ ডাকি নাই; এখন চলুন"। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার 'জিনিসপত্র' গুছাইয়া বলিলাম "আপনি একটু দাঁড়ান, আমি একখানি টিকিট কিনিয়া আনি। আপনি টিকিট কিনিয়াছেন কি? কোন্ ক্লাশের টিকিট কিনিব"? তিনি হাসিয়া বলিলেন "আপনাকে সে সব কিছু করিতে হইবে না। আমি আপনার টিকিটও কিনিয়াছি। এখন গাড়ীতে চলুন"। আমি বলিলাম "বহুৎ খুব্, চলুন"।

তিনি আগে আগে চলিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি কয়েকখানি গাড়ী অতিক্রম করিয়া একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। আমি তখন বলিয়া উঠিলাম "মাই ফ্রেণ্ড, ইয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী!" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন "ইয়েস্ সার, ম্যায় জান্তা হুঁ। আপ্ উঠিয়ে"। আমি বলিলাম "এ যে একেবারে ডবল প্রোমোসন"! তিনি তখন বলিলেন "আপনাকে যদি সন্ধ্যার সময় বলিয়া দিতাম যে, আপনি সেকেণ্ড ক্লাশের ওয়েটিং রুমে বিশ্রাম করিবেন, তাহা হইলে থার্ড ক্লাশের মুসাফিরখানায় আর আপনাকে কষ্ট পাইতে হইত না। কৈ আপনার চিজবাস্ কাঁহা।" আমি আমার জিনিসপত্র—ধুতি ও গামোছা—দেখাইয়া বলিলাম "ইহাই আমার চিজবাস্"। যুবক বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন; বোধ হয় তাঁহার এই বাইশ বৎসর বয়সের অভিজ্ঞতায় এমন লগেজ্‌হীন ভদ্রলোক ভ্রমণকারী দেখেন নাই।

আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে তিনি বলিলেন "আপনি কোন কিছু সঙ্গে না লইয়া কেমন করিয়া বেড়ান, আপনার অসুবিধা হয় না"? আমি বলিলাম "কিছু না। অভাব বাড়াইলেই বাড়ে, কমাইলেই কমে"। যুবক আর উত্তর করিলেন না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এইবার মথুরা বৃন্দাবনে চলিয়াছি। যুবক বিছানা ঝাড়িয়া আমাকে শয়নের জন্য অনুরোধ করিলেন; আমি বলিলাম "আর ঘুমাইব না; আমি বসিয়াই থাকিব"। যুবকও শয়ন করিল না, বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

এতকাল পরে এখনও মনে আছে, সে রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। পশ্চিমাকাশ হইতে তখন চন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণধারা ধরণীর উপর নিঃশেষে ঢালিয়া দিতেছিলেন; সেই কিরণে স্নাত হইয়া অদূরবর্ত্তী গ্রামগুলির বৃক্ষ সকল হাসিতেছিল, প্রশস্ত মাঠের উপর সোনার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। আর কি হইতেছিল, তাহা এতকাল পরে অকবি আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব। সে যে অনেক দিনের কথা—সে যে আর একটা মানুষের স্মৃতি! সেই মানুষের স্মৃতিটুকুই আমার সম্বল আছে বলিয়া এখনও দুই এক কথা বলিতে পারিতেছি—বর্ণনা করিবার শক্তি নাই।

একটা কথা কিন্তু আমার বেশ মনে আছে—সে একটী গান। সে গানটী আমি ভুলি নাই। এখনও যখনই সেই গানটী আমার মনে পড়ে, তখনই আমার সেই প্রথম বৃন্দাবন যাত্রার কথা, সেই চন্দ্রমাশালিনী যামিনীর কথা মনে হয়। আমি সেই নিশাবসান কালে গাড়ীতে বসিয়া দাশারথি রায়ের গানটী গুণ গুণ করিয়া গাহিয়াছিলাম—

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি!
ওগো ভক্ত-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।

ধর ধর জনার্দ্দন, (আমার) পাপভার-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংশ-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ;
যদি বল রাখাল প্রেমে, বদ্ধ আছ ব্রজধামে,
দীন হীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথি।"

এত গান থাকিতে এই গানটা তখন কেন মনে হইয়াছিল, তাহা এতকাল পরে কেমন করিয়া বলিব। তখন ত ডাইরী লিখিতাম না। তখন কি আর জানিতাম যে, লেখকের মুখোস পরিয়া, সাহিত্যিকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমাকে এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে হইবে। তবে, আমার মনে হয়, বৃন্দাবনে যাইতেছি, যদি কমলাপতির বসিবার জন্য হৃদয়টাকে বৃন্দাবন করিতে পারি ; তাহারই জন্য গানটা গাহিয়াছিলাম। কিন্তু তখন যে হৃদয় একটা প্রকাণ্ড মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তখন যে সেই মরুভূমির মধ্যে শুধু চিতার আগুন জ্বলিতেছিল! চুপ্—ও কথায় আর কাজ নাই—বৃন্দাবনের কথা বলিতে হইবে।

অতি প্রত্যূষে আমাদের গাড়ী মথুরায় পৌঁছিল, আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম। গাড়ীর মধ্যে বসিয়াই স্থির করিয়াছিলাম, মথুরায় আজ আর অপেক্ষা করিব না, বরাবর বৃন্দাবনে চলিয়া যাইব। সেখান হইতে ফিরিবার সময় মথুরায় যুবকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব। গাড়ীর মধ্যে যুবককে আর সে কথা বলি নাই। ষ্টেসনে নামিয়া আমি যুবকের নিকট আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। যুবক কিছুতেই ছাড়িবেন না, অন্ততঃ এক বেলার জন্যও তাঁহার গৃহে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম "আজ আমি বৃন্দাবনে যাই, আগামী কল্য এখানে ফিরিয়া আসিব এবং যে কয়দিন আপনি বলিবেন সেই কয়দিনই আপনাদের বাড়ীতে থাকিব"। আমার বিশেষ উৎসুক্য দেখিয়া যুবক অগত্যা তখনকার জন্য আমাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলেন।

যে রেলগাড়ী বৃন্দাবন যায় তাহা ছাড়িতে দেড় ঘণ্টা বিলম্ব। এত বিলম্ব আমার সহিল না। যুবককে বলায় তিনি আমার জন্য একখানি ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। গাড়োয়ান তাঁহার পরিচিত। যুবক তাহাকে বলিলেন আমাকে যেন তাহাদের পাণ্ডা ব্রজবাসীর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়। আমি ব্রজবাসী কাহারও গৃহে যাইতে অস্বীকার করায় তিনি বলিলেন যে, বৃন্দাবনে তাঁহার পরিচিত একজন বাঙ্গালী বাবাজী আছেন। তিনি অতি সাধু ব্যক্তি, ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত ; তাঁহার আশ্রমে গেলে আমার কোনই অসুবিধা হইবে না, তিনি আমাকে পরম যত্নে রাখিবেন। তিনি গাড়োয়ানকে সেই বাঙ্গালী বাবাজীর বাড়ীতে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে তিনি তখনই আমার সঙ্গে যাইতে পারিতেন, কিন্তু বাড়ীতে তাঁহার মায়ের অসুখ ; তাঁহাকে না দেখিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। তিনি বলিলেন, তিনি অপরাহ্নকালে বৃন্দাবনে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি তখন আমার 'জিনিস পত্র' লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। যুবক আমাকে অভিবাদন করিয়া বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সত্য সত্যই আমি বৃন্দাবনে চলিয়াছি? আমার ত তাহা বিশ্বাস হয় না। ভক্ত বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থাদিতে যে বৃন্দাবনের বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, যে বৃন্দাবন দর্শনের জন্য কত সাধু মহাত্মা পার্থিব যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে পাগলের মত বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছিলেন, জ্ঞানশূন্য হইয়া পথ অতিবাহন করিয়াছিলেন, আমিও কি সেই বৃন্দাবনে যাইতেছি? কিন্তু সে আগ্রহ কই? হৃদয়ের মধ্যে সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা কই? কিছুই নাই ; কিছুই নাই। আমার মত মানুষের পক্ষে তীর্থ ভ্রমণ বিড়ম্বনা। আমার পক্ষে বৃন্দাবন দর্শন অসম্ভব।

প্রাতঃকালে একাকী গাড়ীতে বসিয়া এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। এই ত বৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশীর মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছি, ঐ ত সম্মুখে বৃন্দাবন! কিন্তু সে ধবলী শ্যামলী কৈ? সে গোপনারীবৃন্দ কৈ? সে শ্যামের মধুর মুরলী-ধ্বনি কৈ? যে বাঁশীর স্বরে যমুনা উজান বহিত, সে বাঁশীর স্বর কৈ? যে বাঁশীর স্বর শুনিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—

"ঐ শুন বাঁশী বাজে
বন মাঝে কি মন মাঝে।"

বাঁশী কোথায় বাজে?—বন মাঝে, কি মন মাঝে? যে শুনিতে পায়, যাহার কর্ণ শুনিবার উপযুক্ত হইয়াছে, যে সাধন বলে দিব্য কর্ণ লাভ করিয়াছে, তাহার মন মাঝেই বাঁশী বাজে; তাহার ভিতরের শ্রবণেন্দ্রিয়ে অবিশ্রান্ত বাঁশী বাজে; বাঁশী 'রাধা রাধা' বলে, বাঁশী 'আয় আয়' বলে। তাই শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন—

ওরে বাঁশী, বাজ ধীরে ধীরে,
এত কেন গভীর গরজ তোমার;
বাঁশী রবে গৃহে জাগে
কাল ননদী আমার।"

বাঁশী, তুমি একটু ধীরে বাজ। বাঁশী এখনও তেমনই করিয়া বাজে, এখনও যমুনা পুলিনে বংশীধারীর বাঁশী বাজিয়া থাকে; এখনও রাধা নামে সাধা বাঁশী তেমনই 'আয় আয়' বলিয়া ডাকে। কিন্তু শুনিবার মানুষ কৈ? তেমন সাধনা কার? তেমন হৃদয় ভরা প্রেম লইয়া কে বৃন্দাবনে যায়? কানুর বেনু শুনিবার জন্য কে উৎকর্ণ হয়? যে সে ভাবে যায়, তাহার বৃন্দাবন দর্শন সার্থক হয়? তাহার জীবন ধন্য হয়, সে বাঁশীর স্বর শুনিতে পায়। বলিও না এ সকল ঝুটবাত্—বলিও না এ সকল বাজে sentiment —বলিও না এ সকল প্রলাপ! বৈষ্ণব সাধকগণ এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে; আর তাঁহাদের অপেক্ষাও যদি বড় সাক্ষী চাও, তবে, নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুসন্ধান কর, কাতরভাবে প্রার্থনা

কর, এক মনে তাঁহাকে ডাক,—তারপর—তারপর একদিন নিশ্চয়ই সেই বাঁশীর স্বর শুনিতে পাইবেই—পাইবে—পাইবে।

না—আমি এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে পারিলাম না—এ সকল কথা লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমি গোছাইয়া কথা বলিতে পারিনা, সব গোলমাল হইয়া যায়; কিসের মধ্যে কি বলিয়া বসি। তবুও আর একবার চেষ্টা করিব—আর একবার দেখিব।

গাড়ী ধীরে ধীরে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। চারিদিকে কত কি দেখিলাম! কি দেখিলাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? যাহা দেখিলাম তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তাহা অনির্ব্বচনীয়; তাহা শুধু অনুভব করিতে হয়, তাহার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতে হয়। সে কথা পারি ত পরে বলিব। তখন আমার গাড়ী কত মন্দির, কত আখড়া পার হইয়া একটী বাড়ীর সম্মুখে লাগিল। গাড়োয়ান নামিয়া আমাকে বলিল যে, এই সেই বাঙ্গালী বাবাজীর আশ্রম। আমি হঠাৎ আশ্রম বা কুঞ্জে প্রবেশ না করিয়া গাড়োয়ানকে পাঠাইয়া দিলাম। একটু পরেই গাড়োয়ান ফিরিয়া আসিল এবং তাহার সঙ্গে আসিলেন—কে? আমি অবাক্ হইয়া গেলাম, আমি প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলাম, আমি সম্ভাষণ করিতে ভুলিয়া গেলাম। বাবাজীও অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বালকের ন্যায় দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। আমার তখন হুঁস হইল, আমি অতি ধীরে বলিলাম "আমি ত আপনার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই একদিন হিমালয়ের মধ্যে দুই তিন ঘণ্টার জন্য দেখা হইয়াছিল"। তিনি বলিলেন "তাতে কি হয়, ঘণ্টা মিনিটে কি সময়ের পরিমাণ হয়; এক মিনিটের পরিচয় যে আজীবন স্থায়ী হয়। তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমাদের কথা ভুলি নাই"। যাঁহারা

আমার 'হিমালয়' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন হিমালয়ের মধ্যে এক বাঙ্গালী সাধুর সহিত একদিন একটা চটীতে আমাদের দেখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুপুত্রের অনুসন্ধানে বদরিকাশ্রমে যাইতেছিলেন। ইনি সেই বাঙ্গালী বাবাজী। বৃন্দাবনে হাজার হাজার আশ্রম কুঞ্জ আছে; হাজার হাজার বাঙ্গালী এখানে বাস করিয়া থাকেন। আমার যুবক বন্ধু তাঁহাদের মধ্যে আর কাহারও কুঞ্জে আমাকে পাঠাইলেন না, পাঠাইলেন আমারই পরিচিত এই সাধুর আশ্রমে। আমার যে তখন কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব।

গাড়োয়ান ভাড়া না লইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি তাহাকে ভাড়ার টাকা দিবার জন্য ডাকিলাম। সে বলিল সে ভাড়ার টাকা মথুরায় পাইবে, চৌবে বাবুজী তাহাকে ভাড়ার টাকা লইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমি ত অবাক্! চারিদিক হইতে আমার মত পাপীর উপর এ ভাবে অযাচিত কৃপা বর্ষিত হয় কেন? কি জানি কেন?

এবার এই স্থানেই আমাকে চুপ করিতে হইতেছে। বাজে বকুনিতেই স্থান জুড়িয়া যায়। কি করিব বলুন। বদি বলিবার মত করিয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে পরে একবার চেষ্টা করিব, নতুবা এই স্থানেই বিদায়।

শ্রীজলধর সেন।

আমার শিল্প।

শীত কাটিয়া গেল, বসন্ত আসিল। বসন্ত বাতাসে আবার সেই তিরোহিত পরিমল। ধরণীর অঙ্গে আবার সেই পরিত্যক্ত আভরণ। কুসুম কলিকাতে আবার সেই উপভুক্ত শোভা। শিশুর বদনে আমার শৈশবের প্রথম হাসি, যাহা মিলাইয়া গিয়াছে। যুবকের প্রাণে আমার প্রথম যৌবনের অরুণ আশা, যাহাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি। শীতের অবসানে প্রকৃতি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু এ পরা পোষাকে আমাকে আর মুগ্ধ করিতে পারিলেন না। বসন্ত সমীরণ একদিন এ জীবনে বহিয়াছিল, সে বাতাসে কত সোনার স্বপন ভাসিয়া আসিল, স্বপ্নঘোর চক্ষে ধরিত্রী সুন্দর দেখাইয়াছিল। কিন্তু আজ এই বহা বাতাসে আমার মোহ আসে না। বিশ্ব ছবি তেমন সুন্দর হইয়া আমার নয়নে ভাসে না।

কিন্তু সে রঙ্গীন আভা না আসিলেও এ বাতাসে এক সঞ্জীবনী শক্তি আছে। এ বাতাস সুখে হোক, দুঃখে হোক, চেতন অচেতন সকল পদার্থকে জাগাইয়া তুলিতে জানে। সকলকে ক্লীবতা পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আমিও আজ উত্থিত হইয়াছি।

আমি মরি নাই। আমি যেন গতবর্ষের একটি শুষ্ক পত্রের ন্যায় সরোবরপ্রান্তে পড়িয়াছিলাম। যেন আমার প্রাণ অঙ্গারস্থিত প্রচ্ছন্ন অগ্নিকণার ন্যায় আমার মধ্যে মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। বসন্তঋতুর আবাহনে সবাই জাগিয়াছে, তাই আমিও জাগিয়াছি। তাহারা বসন্ত উৎসবে মাতিতে উঠিয়াছে, আমি দুঃখ লইয়া বেদনাতে জাগিয়াছি।

আজ যেন কোন মহাপুরুষের বোধনের নিমিত্ত কোন মহাসভায় বহুবিধ রাগিনীর আলাপ সূচনা হইতেছে। আমি যেন বীণার ছিন্নতন্ত্রীর ন্যায় সুরভ্রষ্ট হইয়া একপার্শ্বে পড়িয়া আছি। উৎসব বাদ্যের নহবদে আমার তান মিলাইতে পারিলাম না।

তাই আজ একপ্রান্তে এই শিলাতলে উপবেশন করিয়া জীবনের পূর্ব্বকাহিনী অনুরাগভরে কল্পনা করিতে করিতে প্রাণ করুণরসে সিঞ্চিত হইয়া আসিল। একটি পূর্ব্বশ্রুত সুর কাণে বাজিতেছিল—

কিসের কুহকে মন
মরণের বিমোহন
ছায়া করে আলিঙ্গন
আবেগ ভরে।
সাধ কিরে হবে পূর্ণ,
পরাণ যে শক্তিশূন্য,
আশারে করেছি চূর্ণ
নিরাশার ভারে!

এমন সময়ে অভ্যন্তর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল,—কেন কাঁদ? যাহা কালসাগরে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার ছায়াময়ী কল্পনার দ্বারা কি জীবনসমস্যার ভঞ্জন হইবে?

আমি কেন কাঁদি! শুনিবে কেন কাঁদি? আমার প্রাণের রূপ দেখিতে পুনরায় সাধ হইয়াছে। কুসুমে কমনীয়তা আছে, কোকিলে কুহুস্বর আছে, সলিলে স্বচ্ছতা আছে, সমুদ্রগর্ভে মুক্তা আছে, আকাশে নক্ষত্র আছে, বসুন্ধরায় সম্পদের অভাব নাই; এত থাকিতেও এ প্রাণের দর্পণ মিলিল না, তাই এ ক্রন্দন। প্রাণের স্বরূপ মিলিল না যদি, তবে কেন বিশ্ব অসুন্দর হইল না। কেন বা চিরশ্রান্তিবোধ আসিল না, বিরাগ জন্মাইল না। কই, তাহা ত হইল না।

আজও কেন তনু মম যৌবনেতে ভরা,
শ্যামল-পল্লব-লতা-প্রস্ফুটিত ধরা!
পূর্ণিমা রজনী কেন, আকাশে চাঁদিনী,
কুলুস্বরে কেন বহে অদূরে তটিনী!

তারা দেখিয়া দেখিয়া নয়ন আজও দৃষ্টিরহিত হয় নাই, কুসুমের কমনীয় পরশে অঙ্গ অবসন্ন হয় নাই, নারসিসাসের (Narcissus) মতন স্বচ্ছ স্বভাবদর্পনে আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে আপনাকে ক্ষয় করিতে পারি নাই। হুতাশনে পতঙ্গের ন্যায় বিশ্বানলে আপনাকে দগ্ধসাৎ করিতে পারিলাম কই? অবিনাশী অমর আমি। অনন্ত জীবন সম্মুখে। অনন্ত পিপাসা প্রাণে। আমার অক্ষয় অমৃত ভাণ্ডার কোথায়? অনন্ত দ্রষ্টা আমি, আজীবন দেখিব কাহাকে? অনন্ত জ্ঞাতা আমি, আমার অনন্ত জ্ঞেয় কই?

যদ্যপি বিনষ্ট হইলাম না, তবে প্রাণের স্বরূপকে স্থায়ী করিতে পারিলাম না কেন? নতুবা প্রাণের রূপ দেখিব কেমনে? প্রাণের প্রতিরূপকে নির্ব্বাতনিষ্কম্পদীপশিখার ন্যায় ধরিয়া রাখিব কি প্রকারে? প্রাণময়ের স্থিতিস্থাপকতা ঘুচিবে কিসে? প্রাণ থাকিতে ধৃতি কোথায়?

কৈলাসে মহাদেবও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, রূপবাসনা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু মহাপুরুষ মূর্ত্ত বাসনার প্রতিরূপ মনসিজকে চিরতরে ভস্মীভূত ও আত্মরতিকে অনাথা করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। মধ্যযুগের দান্তকবি (Dante) দান্তেরও প্রাণকে জানিবার সাধ হইয়াছিল। তিনি স্বর্গের (Beatrice) বিয়াট্রিস কল্পনা করিয়া অপার্থিবে পার্থিব তৃষ্ণা মিটাইলেন। কিন্তু কৈলাসের সে যোগবল, মধ্যযুগের সে কৌশল, আজ কোথায়? ধ্যানে বা অপার্থিব কল্পনায় প্রাণের রূপ দর্শন করিয়া থাকিতে পারি কৈ? আজ এ যুগের যাত্রীদের সে প্রাচীন মার্গ রুদ্ধ হইয়াছে। এখন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ ঘটিলে আমরা শান্তিভঙ্গ করি, প্রত্যক্ষ ও কল্পনায় সংগ্রাম বাঁধিলেই বিগ্রহের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলি। আর আমরা অসত্যের সহিত রফা করিতে রাজী নই। সর্ব্বসত্যকে, সর্ব্বদেবতাকে, আমরা ইচ্ছাময় রূপে জানিয়াছি। আজ আমিই বিশ্বের কেন্দ্র। বিশ্বে লীন হইতে পারি না। আকাশের চাঁদ যেমন কিরণ-

ধারা বিস্তারে শূন্যের সকল দিক, সকল প্রান্ত, ছাইয়া ফেলিলেও শূন্যে বিলীন হইতে অসমর্থ।

এই বিশ্বরূপ ও আত্মচৈতন্যের পরস্পর সম্বন্ধ অনির্বচনীয়। কৃষ্ণপক্ষে আঁধার রাতে খদ্যোতপুঞ্জের সন্তরণ দেখিয়াছ কি? মনে কর সেই ঘোরতমসাচ্ছন্ন খদ্যোতসঙ্কুল শূন্যসাগরই বিশ্বরূপ, ও অগণন খদ্যোতের প্রত্যেকটিই যেন সেই আঁধার সাগরে সন্তরনকারী জীব। খদ্যোতের দেহনিঃসৃত তেজঃপদার্থ যেন জীবের চৈতন্য। মাঝে মাঝে খদ্যোত জ্বলিয়া উঠে ও আপনার প্রদীপ্ত প্রাণের আগুনে স্বসত্তা ও স্বাধারকে একাকার করিয়া দেয়। আবার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, স্ফুলিঙ্গ হইতে পুনরায় খদ্যোতে পরিবর্ত্তিত হয়। অথবা বাষ্পীয় পোতের চক্র যেমন মগ্নোত্থিত হইতে হইতে সমুদ্রের ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া চলিয়া যায়, বিশ্বরূপ ও জীবচৈতন্যের সম্বন্ধও সেইরূপ।

হে আমার বিশ্ব, একদিন জ্বলিয়া উঠিয়া তোমার সহিত একাকার হইয়াছিলাম। সেদিন যেন আকস্মিক উল্কাপাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আলোকময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কই, সর্ব্বদা ত জ্বলিতে পারি না। প্রাণের আগুন যে ক্ষণে ক্ষণে নিবিয়া যায়। না জ্বলিলে তোমার সহিত মেশা যায় না। আজ প্রাণের আগুন নিবিয়া গেছে। তাই আঁধারে ফিরিয়া আসিয়াছি। তাই তুমিও আমি উভয়েই আঁধারে। সেই ভাল। আঁধারে থাকিয়া আলোকের মহিমা বোঝাই ত ভাল। সব যদি আলোকময় হয়, আঁধার থাকিবে কোথায়? আঁধার না থাকিলে জ্বলিবে কে? চক্ষু ফুটিবে কার? হে বিশ্ব, তোমার আঁধার রাতে খদ্যোত যদি বারে বারে জ্বলিয়া না উঠিত, তবে অমাবস্যার নিশাকে আলোক প্রদান করিত কে? শুধু আগুনে চলে না ইন্ধনও চাই। শুদ্ধপ্রেম উদ্দীপক অভাবে অনাথ হইয়া কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায়? প্রেমিকপ্রেমিকার হৃদয়সংঘর্ষণে মান অভিমানের অভাবে প্রেম কোথায় অবস্থান করে? সূর্য্যের কিরণ

যদি তুষার-মণ্ডিত হিমাদ্রিশিখরকে চুম্বন না করিত, তবে বর্ণ-ভঙ্গিমা কোথায় ফুটিয়া উঠিত?

এই বর্ণ-ভঙ্গিমাই সকল সৃষ্টির মূলে। এই যে ভগবান অক্ষয় সংসার পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই যে ভবের হাট বসিয়া গিয়াছে, এই যে বিচিত্র রঙ্গ বেরঙ্গ মেলা, ইহা কবে, কোথা হইতে আসিল! কেমনে এক অনির্চ্চনীয়, অবর্ণ, অরূপী, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণরূপে প্রতিভাসিত হইল! যেমন সমান্তরাল সমান আয়তনের দুইখানি দর্পণের মধ্যে কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মাণ হইলে, সেই ব্যক্তির আকৃতি একখানি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, পরে দর্পণগত বিম্ব অপর দর্পণে প্রতিফলিত হয়, এবং এই বিম্বপ্রতিবিম্বের প্রতিভাসক্রিয়া অনন্ত ধারায় অনন্তকাল চলিতে থাকে, ভগবান ও জীবের ভবলীলাও কি সেইরূপ?

আজ আমি এই দর্পণে নিজের প্রাণের প্রতিরূপ দেখিতে চাই। আমার প্রাণের রূপ মিলিল না বলিয়া আমি কাঁদি।

আমার প্রাণের রূপ দেখিতে আমার সাধ হইয়াছে। কেন, সে রূপ কি আমার মুখচ্ছায়ায়, অঙ্গকান্তিতে, প্রকাশিত নয়? আমার আকৃতিতে, অঙ্গসৌষ্ঠবে, অঙ্কিত নহে? তাই যদি হয়, তবে একখানা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়।

কিন্তু কই, তাহা ত হয় না, নয়ন নিজের রূপ দেখিয়া তৃপ্তি পায় না। নয়ন কখনও পশ্চাদ্দর্শী নয়, আনতপল্লবও নয়, সদাই সম্মুখদর্শী। বর্ত্তমানের বেষ্টনী? এ জীবনে যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, সমাজের যে রীতিনীতি সংস্কার প্রণালীতে বর্দ্ধিত হইয়াছি, আমার সমসাময়িক ভাবস্রোত যাহা রক্তপ্রবাহের ন্যায় অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে, সে সকলই ত আমার অন্তর্গত। অতীতের ইতিহাস? আমিই ত অতীতের প্রতিনিধি, সেই অতীতের আশ্রয় ত আমারই কল্পনা, আমারই স্মৃতি। তবে তাহাতে আর জানিবার আছে কি? দেখিবার আছে কি? যাহা দেখিয়াছি তাহা

আর দেখিব না; যাহা শুনিয়াছি, তাহা আর শুনিব না। সে যে নিজেরই উপাসনা, নিজেরই ভজনা। নয়ন অপরের নয়নে, অন্তর অপরের অন্তরে, আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিতে চাহে। কেবল প্রকৃতিদর্পণ, কেবল অতীতের স্ফটিক গোলক, লইয়া চলে না। প্রত্যেকেই তাহার স্বজাতির রূপে আপন স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। তাই স্বজাতির সহিত না মিলিলে প্রাণের রূপ দেখিব কেমন করিয়া?

বসন্তের ফুল ফোটে ও ঝরিয়া পড়ে, আকাশের চন্দ্র সূর্য্য মাসের পর মাস, বরষের পর বরষ, আসে যায়, সৌরজগতের পর সৌরজগত জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠে, ভাসে ও মিলায়। কিন্তু এ আবর্ত্তও এক চিরন্তন ধারার অন্তর্ভূত। অনাদি অনন্ত কালপরম্পরায় যে ধারা আছে, মাস, ঋতু, বর্ষ তাহারই অঙ্গ। বসন্তের ফুল তাহারই অলঙ্কার। আমি কোন্ ধারা হইতে অংশে অংশে নিত্য নূতন বেশে গমনাগমন করিতেছি? আমার ধারা কোথায়!

প্রাণই প্রাণের স্বজাতি। তবে প্রাণবিশিষ্টের সমষ্টিই কি আমার ধারা? কে সে বিশ্বপ্রাণ? কোথায় সে প্রাণময়?

সাংখ্য দর্শনে বলে যে একই শক্তি বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া, পরে সেই বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চেতনের প্রেরণায় সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ করে, ও ক্রমনিয়মানুসারে অণুপরমাণু তৃণলতা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী প্রভৃতির ভিতর দিয়া সর্ব্বশেষে মানব দেহে প্রাণের প্রাণরূপে অবস্থান করে। এবং পুনরায় স্বভাবের নিয়মে বিপরীত ধারায় জড়ে পরিণত হয়। মানব সেই মহাশক্তির আবর্ত্তনে আদি ও অন্তের সংশ্লেষস্থল। জানি না কোন স্রোতে কোন পথে ভাসিয়া আসিয়াছি, তবে একদিন আমার জাগ্রত চৈতন্য বিপরীত গতিতে সেই প্রাণময়ের সন্দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছিল। সাংখ্য যোগে যাহাকে "প্রকৃতিলয়" বলে আমার কি সেই যোগাবস্থা ঘটিয়াছিল? না—সেদিন প্রকৃতি আমায় গ্রাস করে

নাই। প্রাণময়েই প্রাণ লয় প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিতে নয়। আমারও তাহাই ঘটিয়াছিল।

আজ সেই অতলস্পর্শ হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছি। আজ বন্যাস্রোতে ভাসমান হইয়া কিনারায় ঠেকিয়াছি, এই মাত্র পারে উঠিয়াছি।

সম্মুখে দেখি নূতন জগৎ, যেন এক বিরাট হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে। এই বিরাট প্রাণীসমষ্টি বক্ষে ধারণ করিয়া এ কোন মহাপ্রাণী কালপথে মহাযাত্রা করিয়াছে। এই মানব ইতিহাসের ধারা, কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় চলিতেছে? ব্যোমমার্গে ঐ তারকামণ্ডলের ধারা, আর মর্ত্তে এই সমাজজীবনের ঐতিহাসিক ধারা। ইহাই মহাপ্রয়াণের প্রশস্ত পথ। আমি এই মহাযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই দিশাহারা, বিভ্রান্ত, হইয়াছিলাম।

আজ বুঝিতেছি এই বিচিত্র বিশ্ব ধারার সহিত অন্তরের আদর্শের সামঞ্জস্যে দর্পণদ্বয়গত প্রতিবিম্বপরম্পরার ন্যায় একটী জীবনধারা সৃজন করিতে হইবে। এমনি করিয়াই বিশ্বদর্পনে প্রাণের রূপ প্রতিফলিত হয়, ও এক অখণ্ড অনন্ত ধারা সৃজন করে। ইহাই প্রাণের শিল্প-কৌশল। এতদিন বসিয়া বসিয়া স্বভাব লীলা দেখিলাম, আজ আর রঙ্গাভিনয়ে দর্শক নহি। আজ আমি অভিনয়ে সূত্রধার। অথবা আজ আমি শিল্পী। ভাঙ্গিতে আসিয়াছি। ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইতে আসিয়াছি। আজ এই ভগবদ্দত্ত বিশ্বস্তূপের পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি ইহাদ্বারা কোন অপূর্ব্ব বস্তু রচনা করি। চিত্রকর পটে রং ফলাইবার জন্য তুলি ধারণ করেন। ভাস্কর খনিজ পদার্থ দিয়া মূর্ত্তি গঠন করেন। আমার এই অভিনব শিল্পে অচেতন পদার্থ উপকরণ নয়। বিশ্বপ্রাণই আমার উপাদান। আমি এই চেতন পদার্থ দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিতেছি, তাহা কেহ দেখিবে না, কেহ বুঝিবে না, তাহার রস কেহ উপভোগ করিবে না। আমি সাকার পদার্থ দিয়া নিরাকার গড়িয়া তুলিতেছি। তাহা বিশ-

মানবের জন্য নহে। তাহা বিশ্বপতির স্থপত্যাগারে এক কোণে স্থান পাইলেই আমার শিল্পচেষ্টা সার্থক হইবে।

রসই শিল্পীর প্রাণ। কিন্তু এই রস, এই প্রাণ, যে নিরাকার। শিল্পী যখন তাহার শিল্পবস্তুটিকে গড়িতে থাকে, তখন সে ত রসের কথা, প্রাণের স্বরূপ, একেবারেই ভাবে না, ধ্যান চক্ষেও দেখে না। সে যে জ্ঞানান্ধ। চিত্রকর ও রং যে আলাহিদা, চিত্রকরের সে জ্ঞানও থাকে না। সে শুধু ঐ রংএর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং নানা রং লইয়া মিলাইতে থাকে; কখনও সাদা, কাল, লাল, কখন নীল, সবুজ, হল্‌দে, কখন মেটে, কমলা, গোলাপী, আর এই মিলাইতে মিলাইতে পটের উপর তুলি দিয়া আঁচড় কাটিতে থাকে, আঁচড়ের পর আঁচড়, টিপের পর টিপ, ও এইরূপে আগে দেহের কাঠাম, তারপর মুখ, ও পরে হাত পা যোগ করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে চোখ নাক ফুটাইয়া তুলে, ও অবশেষে কেমন করে কোথা হোতে এক ছন্দোবদ্ধ পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি ওই পটের উপর প্রাণময় হইয়া জাগিয়া উঠে। আমিও আজ নানা রং মিলাইয়া এক নূতন রং সৃষ্টি করিতেছি। তাই আমাকে রংএর সহিত রং সাজিতে হইবে। রঙ্গীন না হোলে রংরাণী হইব কেমনে? এই জগতের সকল রং লইয়া, সাদা ও কাল, মেটে ও উজ্জ্বল, সৎ ও অসৎ, কুৎসিত ও সুন্দর, সকল রংএ আমার রং মিলাইয়া, সকল রাগ আমার রক্তে রঞ্জিত করিয়া, এক অভিনব চিত্রকলা সাধন করি।

তাই বলি বর্ণভঙ্গিমাই সকল সৃষ্টির মূলে। শুধু আমি রঙ্গীন নই। সৃষ্টিও যে লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপা। চিত্রকর যেমন চিত্রের রং রং'এ প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বশ্ব-ছবির বর্ণে বর্ণে, রেখায় রেখায়, নীলে সবুজে, সাদায় কালোয়, ফিকে ঘোরে, মেটে উজ্জ্বলে সেই শিল্পী রংএ রং মিলাইয়া আছেন। তিনি যে রংরাজ!

মন, কর সেই শিল্পের সাধন। একদিন এই শিল্প সাধনা করিতে করিতে এমন এক মুহূর্ত্ত আসিবে, যখন

বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার শিল্পপ্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবেন। তখন আমার শিল্পাগারের কাজ হইতে অবসর মিলিবে। সেই দিন এই ভাঙ্গাগড়ার ভার, এই গড়িয়া তোলার ভার, সেই বিশ্ব-শিল্পীর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিব। তিনি ভাঙ্গিতে থাকুন, গড়িতে থাকুন, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া এই বিশ্বব্যূহ রচনা করিতে থাকুন। আমি কেবল বসিয়া বসিয়া সেই বিশ্বকর্ম্মার হাতের কৌশল দেখিব।

তাই আজ বিশ্বস্তূপের একপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি ইহার দ্বারা কোন অপূর্ব্ব শিল্পবস্তু রচনা করি।

শ্রীসরযুবালা দাসগুপ্তা।

'সুগন্ধ সুমন্দ বায়ু দিল মোরে পেলব পরশ'

সদ্যপ্রস্ফুটিত স্নিগ্ধ কুসুম-সৌরভ দেহে নূতন জীবন আনয়ন করে, শ্রান্তি ক্লান্তি দূরে যায়। কিন্তু সদ্য-প্রস্ফুটিত সৌরভ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে পাওয়া যায় না, এই জন্য আমরা বহু আয়াসে নানা জাতীয় কুসুম-সুরভি সংগ্রহ করিয়া এই "আতরিন" প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা সম্পূর্ণরূপে স্পিরিটবর্জ্জিত এবং সাধারণ এসেন্স হইতে ত্রিশ চল্লিশ গুণ সৌরভ বিশিষ্ট। আতরিনের গন্ধ সাধারণ এসেন্স অপেক্ষা অনেক অধিক দীর্ঘকাল স্থায়ী। আতরিন অতি সুন্দর গ্লাসের ছিপিযুক্ত শিশিতে রক্ষিত। রুমালে অথবা কাপড়ে ব্যবহারের সুবিধার জন্য গ্লাস-ষ্টপারের সঙ্গে একটী কাচ-শলাকা সংযুক্ত আছে। আতরিন একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন, আর সাধারণ এসেন্স ব্যবহারের প্রবৃত্তি হইবে না।

আতরিনের মূল্যাদি—

১নং আতরিন, সুদৃশ্য পিতলের কেসে, মূল্য প্রতি শিশি—১৲ গোলাপ, যুঁই, লিলি, ভায়োলেট, অপরাজিতা ও কুন্দকুসুম

২নং আতরিন, সুদৃশ্য কার্ড-বোর্ড বাক্সে, মূল্য প্রতি শিশি—৷৷৵০। পার্শিয়ানরোজ, খস, বেলা বকুল, জুইচম্পা ও হেনা,

পারফিউমার,
এইচ বসু, দেলখোস হাউস, কলিকাতা।
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

B. B.

COVER PRINTED BY U. RAY & SONS, 100, GURPAR ROAD, CALCUTTA.

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

নারায়ণ

নৃপেন্দ্র ফ্রী লাইব্রেরী
প্রতিষ্ঠাতা—
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
বি, এ, কবিভূষণ
পোঃ মালুচি, জিলা ঢাকা।

পৌষ
সন ১৩২১।

সম্পাদক-
শ্রীচিত্তরঞ্জন দা

১৮।১ ও ১

শেট এণ্ড কোং জুয়েলার্স

২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইয়ারিং

১৫৲ হইতে ৫০৲

বাজারে জঘন্য পাণেভরা গহনা করাইয়া পয়সা নষ্ট করিবেন না। যদি বিনা পাণে মনের মতন নূতন নূতন গহনা গড়াইতে চান— তবে আমাদের দোকানে আসুন। এখানে সকল রকম গহনা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। বিবাহের গহনা তিন দিনের মধ্যে তৈয়ারি করিয়া থাকি।

প্রোপ্রাইটার বলাইচাঁদ শেট—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাদুর
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ, মহীশূর, বরদা, ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, ভরতপুর
পাতিয়ালা ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অন্যান্য স্বাধীন
রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষিত—
কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

জবাকুসুম তৈল

শিরোরোগের মহৌষধ।

গুণে অদ্বিতীয়! গন্ধে অতুলনীয়!

জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিলে মাথাঠাণ্ডা থাকে, অকালে চুল পাকে না, মাথায় টাক পড়ে না। যাঁহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে জবাকুসুম তৈল নিত্যব্যবহার্য্য বস্তু। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন এবং সকলেই জবাকুসুম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুসুস তৈলে মাথার চুল বড়, নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া রাজরাণী হইতে সামান্য মহিলারা পর্য্যন্ত অতি আদরের সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।৵০
ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা

পৌষ, ১৩২১ সাল।

সূচী পত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ফাঁকা ...	শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তা	১১৯
২।	অন্তর্যামী (কবিতা) ...	...	১২৯
৩।	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ...	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ...	১৩৩
৪।	ভাষার কথা ...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ...	১৪৬
৫।	"ডালিম" (গল্প) ...	...	১৫৯
৬।	শক ও শকাব্দ ...	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ...	১৭২
৭।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ...	১৮৫
৮।	বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের পূর্ব্ব-কথা	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল ...	২০১
৯।	বিশ্ব-দর্পণে (কবিতা) ...	শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী	২১২

কার্য্যালয়—১৪৮ নং রসা রোড (সাউথ), কালীঘাট, কলিকাতা।
বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷০ টাকা।
এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

বিজয়া প্রেসে, ২০ নং পটুয়াটোলা লেনে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

১ম বর্ষ—২য় সংখ্যা] [পৌষ, ১৩২১ সাল

ফাঁকা

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

চলাই আমার ধর্ম্ম। তাই ক্রমাগত চলিতেইছি। নদীর স্রোত যেমন বহিয়া যায়, শূন্যে বায়ু যেমন অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকে, সময় যেমন আর ফুরায় না, তেমনি আমারও আর চলার শেষ হয় না। কিন্তু ইহারা অবিরাম একভাবেই চলিয়া যায়; আমি তাহা পারি না। আমি চলিতে চলিতে এক একবার থামিয়া লই। কাব্যের ছন্দে ছন্দে যেমন যতি, রাগিণীর তালের পর সম, হৃৎপিণ্ডের ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে একটি বিরাম, আমার গতিতেও তেমনি এক একটি অবকাশ। তাই আমি থেকে থেকে থেমে থেমে চলি। নহিলে আমার তাল কাটিয়া যায়।

কিন্তু কবিতাটির ঝঙ্কার আস্বাদ করিতে যেমন তাহার স্বরবিন্যাস ও যতি গুলিকে ছন্দের সুরে গাঁথিয়া লই, গানের সুরটি আয়ত্ত করিতে হইলে যেমন তাহার স্বরপরম্পরার এককালীন মানস অনুভূতি আবশ্যক, সেইরূপ জীবনটিকে পূর্ণ করিয়া পাইতে হইলে তাহার গতি ও অবকাশগুলিকে মিলাইয়া বুঝিতে হয়। তাই আজ আমার জীবনের গতি ও অবকাশগুলিকে মিলাইয়া দেখিতে বসিয়াছি। এই গতি ও অবকাশ উভয়ই যে আমার জীবনের অঙ্গস্বরূপ।

যখন হইতে চলিতে শিখিয়াছি, তখন হইতেই একটু জ্ঞানের আভাস আসিয়াছে। কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই আমার একটা মস্ত অবসর ছিল। এবং সেই অবসর ছিল মাটির মত অসাড়, আকাশের মত অবাধ, অনন্তকালের মত স্থির। আর সেই তল-হীন অসাড়তার অতলে, সেই চির আঁধারে, আগুন যেমন চক্‌-মকির ঘর্ষণের অপেক্ষায় অথবা তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রিশিলা যেমন সূর্য্যোদয়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে, আমার প্রাণশক্তিও সেইরূপ নিয়তির ভবিষ্যবাণীর প্রতীক্ষায় নিঃসাড়ে অকালনিদ্রায় মগ্ন ছিল কিন্তু একদিন সেই অকাল-নিদ্রার অবসানে চৈতন্য কালজ্ঞানরূপে ভাসমান হইল, তথাপি জড়তার খনিতে যাহার উৎপত্তি তাহার জড়তা দূর হইল না। সে আপনাকে কিছুকাল সর্ব্বকর্ম্মের অতীতে রাখিয়া শুধু মূক সাক্ষীরূপে অবস্থান করিল। কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন বিনা কাজে বৃত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন, সেও সেদিন একপার্শ্বে বসিয়া বিশ্বের কৌতুকময় বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া রহিল।

কে বলিবে কেমনে সেই চিরপুরাতন জড়তায় শক্তির আবেশ আসিল। দেখিতে দেখিতে দূর হইতে এক কল্লোলময় প্রবাহ আসিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া সেই শূন্য জড়রাজ্যকে যেন এক উদ্বেলিত কারণসাগর করিয়া তুলিল। সেই কত যুগের অলীক স্বপ্ন, সেই অঘোর ঘুমঘোর, তমসার আবেশ, কোথায় ভাসিয়া গেল। এবং সেই কারণসাগর হইতেই 'আমি'র উদয় হইল। কে যে আমাকে "আমি আছি" বলিতে শিখাইল জানি না, কিন্তু সেদিন আমি স্বেচ্ছায় সজোরে বলিয়া উঠিলাম "আমি আছি"।

তখন দেখি আমারও সেই প্রবাহের ন্যায় ছুটিয়া চলিবার শক্তি আছে। আমি এখন চলিতে আরম্ভ করিলাম। এবং আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ও আকাশের বিভাগ হইল, মাটিতে কত নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব হইল, আকাশ সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্ররাশিকে বুকে

করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল, আর সময় খরচের হিসাব না রাখিয়া দৌড়াইতে লাগিল। গিরি-কন্দর-বহির্ভূত নবীন প্রস্রবণের ন্যায় আমিও আমার স্বচ্ছ প্রাণটির সহিত নানা ছলে নানা কৌশলে খেলিতে খেলিতে ছুটিতে লাগিলাম। নদীর স্রোত বহিতে বহিতে সাগর-সঙ্গমে প্রাণ হারাইয়া ফেলে; আমি কিন্তু লীলা করিতে করিতে মধ্যপথে আসিয়া ঠেকিয়া গেলাম। সেদিন আমার সকল শক্তি—যাহা সেই শক্তি-প্রদায়িনী ধারা হইতে অর্জ্জন করিয়াছিলাম —তাহা সব নিঃশেষ হইয়া গেল। জলাভূমিতে মরাগাঙ্গের ন্যায় আমি সেই মধ্যপথে প্রাণ হারাইলাম। আমার চলা বন্ধ হইলে, সেদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে সকল পার্থিব বস্তুর গতির রোধ হইল। আকাশেরও ঘোরা বন্ধ হইয়া গেল। এই হইল আমার গতিতে প্রথম বিরাম, জীবনে প্রথম অবকাশ।

আমি থামিয়া রহিলাম। বীজটি রোপণ করিবার পর অঙ্কুর হইয়া দেখা দিবার আগে কিছুদিন মাটিতে থামিয়াই থাকে। ধানটি পাকিলে কাজে লাগিবার আগে অন্ততঃ কয়েক মাস কৃষকের গোলা ভরিয়াই থাকে। বাষ্প পুনরায় বারিধারা হইয়া বর্ষিত হইবার পূর্ব্বে কিয়ৎকাল আকাশে অদৃশ্য হয়। তাই, বিশ্বে চেতন অচেতন সকল পদার্থে, এমন কি অণু-পরমাণুর মধ্যেও গতির পর বিরাম দেখা যায়। আর আমি যেমন সকল শক্তি খোয়াইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়াছিলাম, তাহাদেরও এক সময় আসে যখন হায়রাণ হইয়া তাহারা মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া যায়। আর সেই কারণেই মাটির এমন সৃজনী শক্তি, সে যে সকল শক্তির আশ্রয়স্বরূপ, লয়ভূমি।

আমার সেই শক্তি-প্রদায়িনী প্রবাহিণী, সে কোন শূন্যে থাকে? সেই শূন্যে, সেই কারণ-সাগরে, না ডুবিলে শক্তি সঞ্চয় করিব কেমনে? এ জগতে সবাই যেখান হইতে আসে সেখানেই ফিরিয়া যায়। সেই স্থানটি মূলাধার। তাহাই বিরামভূমি। তাই বিরামের

পর সকল বস্তুই প্রাণময় হইয়া উঠে। তাই কাব্যের ছন্দে ছন্দে যতিই প্রাণ, তাই রাগিনীর তালের মাঝে মাঝে সমই সঙ্গীতজ্ঞের মাতন। আমার গতিতেও সেইরূপ অবকাশই শক্তি, অবকাশই মুক্তি।

কিন্তু এই বিরামের ক্রোড়ে কোথায় থাকি, কি ভাবে অবস্থান করি, তাহা আমার অনির্ব্বচনীয়। যেন পাখীর ডিমের ভিতর থাকা। অথবা যেমন চিত্রটি অঙ্কিত হইবার পূর্ব্বে চিত্রকরের কল্পনায় সেই চিত্রের চাক্ষুষ আভাস ভাসে ভাসে—ভাসে না, অথবা রচনাটি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে লেখকের কাণে তাহার সুরটি বাজে বাজে—বাজে না। আমার অবকাশগুলিও ঠিক সেইরূপ। যেন শক্তির বীজ গর্ভে ধারণ করিয়া থাকে। সেই অবসর হইতেই আজ আমি পুনরায় চলিবার শক্তি পাইয়াছি।

"চল্ চল্ চল্, সাম্নে চল্"।

অবসর কাটিয়া গেল। আমি সেই শূন্যের মাঝ হইতে ভাসিয়া উঠিলাম। এখন আমি কেবলই ভাসিয়া যাইতেছি। দূরে, দূরে, আরও দূরে। ক্রমেই আকাশের পর আকাশ পার হইয়া ভাসিয়া যাইতেছি।

অনাদি কাল হইতে এই শূন্যের মাঝে পথ কাটিয়া কাটিয়া, কোথায়, কোন আদর্শের কল্পনা লইয়া চলিতেছি! শুধু আমি নয়; আমার বিশ্বগোলকও আমাকে যুগে যুগে অনুধাবন করিতেছে। কিন্তু কই আদর্শের রহস্য ঘুচিল কই? দিনে দিনে ত আদর্শ বাড়িয়া যাইতেছে। জ্ঞান যতই বাড়িতেছে, আদর্শের রহস্য ততই জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে।

যেমন দ্রষ্টা কোনও স্থান অধিকার করিয়া চতুর্দ্দিকে যতদূর দেখে তাহাই তাহার দিঙ্‌মণ্ডল। সে যদি উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়ায়, তবে তাহার দিঙ্‌মণ্ডলের আয়তন পূর্ব্বের তুলনায় প্রসারিত হয়। কিন্তু দ্রষ্টা পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া দেখে, পৃথিবীকে ছাড়াইয়া যায় না। তাই সে পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা এখন যাহা

দেখিতেছে তাহার অন্তর্গত হইয়া থাকে। তাহার দিঙ্‌মণ্ডলের সীমানা বৃহত্তর হইলেও, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বৃত্তের সহিত একই সমতলের অন্তর্ভুক্ত। আমার কিন্তু তাহা নয়। যদিও আমার আকাশ দিনে দিনে বাড়িয়া যাইতেছে, তবু আমি যাহা পূর্ব্বে দেখিতেছিলাম এখন আর তাহা দেখি না;—আমি ক্রমেই ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতরে উঠিতেছি। ধরাতল আমার পদতল হইতে খসিয়া যাইতেছে। বায়স্কোপ যন্ত্রের পরতগুলি যেমন এক একটি করিয়া চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, সেইরূপ কত বিচিত্র দৃশ্যাবলী ভাসিয়া গেল, কত ক্ষেত্র, কত অরণ্যানী, কত নদী, কত হ্রদ, কত উপত্যকা, কত অধিত্যকা, কত শিখরের পর শিখর, বায়ুমণ্ডলের পর বায়ুমণ্ডল, কত গোলকের পর গোলক, আমার দৃষ্টি হইতে সরিয়া গেল। কত সৌরজগতের পর সৌরজগৎ, কত তারকামণ্ডলের পর তারকামণ্ডল, একে একে পার হইয়া কোথায় উঠিতেছি। কত লোকের পর লোক, স্বর্গলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক সেই সপ্তলোক অতিক্রম করিয়া আসিলাম। কত আলোক আঁধার, আঁধার আলোক, কত রং বেরং, সেই শুক্ল লোহিত কৃষ্ণ, সেই লোহিত কৃষ্ণ শুক্ল, সেই কৃষ্ণ লোহিত শুক্ল, কতবার কতভাবে মিলাইয়া যাইতে যাইতে যেন আজ সব সাদা, ফাঁকা হইয়া আসিতেছে।

এই ব্যোমমার্গই কি সত্যাদর্শের পথ? আমি আজ সেই পথেরই পথিক, কিন্তু কৈ এ পথ ত চলিয়া শেষ করিতে পারি না! যতই উঠি না কেন, সে নিত্যধাম ত নিকটে আসে না। বালক যেমন মাঠে দাঁড়াইয়া অদূরে মাটি ও আকাশের সীমানা দেখিয়া তাহার দিকে ছুটিতে থাকে, আমিও তেমনি যে আদর্শের পিছে ছুটিয়া আসিলাম, আজ বুঝিতেছি সে স্থানে পৌঁছিবার শক্তি আমার নাই। সে আদর্শ আমার জ্ঞানে একটি পরপারের রহস্য হইয়াই থাকিবে। সে যে পরব্যোম, অনাদি, অনন্ত, ভূমা, তুরীয়, আমার সকল শক্তি সকল জ্ঞানের অতীতে। তাহাকে ত সীমানার

মধ্যে আনা যায় না, তাই সে যেমন তেমনি রহিল, মাঝ থেকে পৃথিবী ও বৈকুণ্ঠধামের ব্যবধানটাই বাড়িয়া গেল। পৃথিবী পাতাল হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। আর সেই বৈকুণ্ঠধাম মাঝের আকাশ ছাড়িয়া উর্দ্ধাৎ উর্দ্ধে উঠিয়া গেল!

আমি নীচে ঐ পাতালে আঁধারেই ছিলাম। শুনিয়াছিলাম বৈকুণ্ঠধাম নাকি আলোকময়, তাই পাতাল ছাড়িয়া পাতাল ও বৈকুণ্ঠধামের মাঝখানে মর্ত্যে একটুখানি জায়গা দখল করিলাম। উপরের অজ্ঞেয় রহস্য ও নীচে পাতালের কথা ভাবিতে ভাবিতে দুঃখময়ের সেবায় কাল কাটাইতাম। কিন্তু সে মর্ত্যের টান ছাড়া হইয়া আজ যেখানে আসিয়াছি সেখান হইতে কিছুই দেখিতে পাই না। "আরও আরও আলোকের" আশায় এত পথ চলিয়া আসিলাম, কিন্তু কৈ আলোক ত পাইলাম না, এ যে আঁধার হ'য়ে এল। এখন দেখিতেছি যত আলোকের মেলা, যত রংএর ছটা, ওই মাঝ পথেই। মাঝপথ ছাড়িলে সব আঁধার।

আমি সেই মাঝপথ ছাড়িয়া আসিয়াছি। তাই আমার বিশ্বছবি মুছিয়া গেল। সেই হরিদ্বরণ শোভা, সেই নীলাকাশ, সেই শুভ্রফেন অতল জলধি, কোথায় কোন শূন্যসাগরে মিলাইয়া গেল। আমার নয়নের দৃষ্টি ঘোলা হইয়া আসিতেছে। আমার বর্ত্তমান সেই অনতীত অতীতের নিশায় মিলাইয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতের আশা একদিন প্রত্যক্ষ-জীবন বর্ত্তমান হইয়া উঠিবে ভাবিয়া ছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি বর্ত্তমান শেষে অতীতেই মিলায়।

ইহাই জগতের নিয়ম। বীজ হইতে ফলের সৃষ্টি, কিন্তু ফলের পরিণতি পুনরায় সেই বীজে। ভাব হইতে ভাষা, কিন্তু ভাষার উদ্দেশ্য পূর্ব্বজ ভাবকে জাগাইয়া তোলা। অরূপ হইতে রূপের বিলাস, কিন্তু রূপের লয় সেই পুরা-তন অরূপেই। ইহাই বিলোম-গতি। এই বিলোম পথ অনুসরণ করিয়াই দেহী প্রাণ একদিন বিদেহ প্রাণময়ের রাজ্যে উপস্থিত হয়।

আমি ত এই পথেই আসিলাম। এখন দেখি যে প্রাণময়ের রাজ্য ফাঁকা। আমি সেই ফাঁকারাজ্যেই আসিয়াছি। সব আলোক আঁধার মিশাইয়া গিয়াছে। কোথাও ছায়ার লেশ মাত্র নাই, যেন উপর হইতে নিরাবরণ আবরণ নামিয়া আসিয়া আমায় ঘেরিয়া ফেলিল। এই কি পথের শেষ? চক্ষু বুজিয়া আসিল, হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে, সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে। সেই যে আদিতে "আমি আছি" বলিয়া স্বেচ্ছায় স্থানটি অধিকার করিলাম, সে স্থানে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম কৈ? সকল আকর্ষণ বিকর্ষণের উপরে আমার যে একটি নিজের শক্তি ছিল, আজ সে শক্তি অবসন্ন হইয়া আসিতেছে; আজ সে শক্তি অনাথা, এই টানাটানির ঝোঁকে নিজের টানটি হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছি। আর পারি না, আর সামলাইতে পারিলাম না। এ কিসের করাল টানে শূন্য অম্বরে উল্কার ন্যায় পড়িতেছি। পড়িতেছি, ক্রমাগত পড়িতেইছি। গেলাম গেলাম বুঝি পাতালেই পড়িয়া গেলাম। কোথায় পড়িলাম কিছুই জানি না।

চক্ষু মেলিয়া দেখি, আমি যে মর্ত্যে আমি সেই মর্ত্যে। দিবালোকে আমি অস্বপ্নের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

চল্ চল্ চল্, সাম্নে চল্।

কিন্তু কৈ এত পথ চলি স্বপ্নের ঝোঁক ত যায় না। যেন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিশিপাওয়া ব্যক্তির ন্যায় পথ চলিতেছি।

চল্ চল্ চল্, সাম্নে চল্।

প্রত্যেক প্রাণীর চক্ষের অন্তরালে ভাসে এম্নি একটি আভাস, এম্নি একটি স্বপ্ন। কবে যেন একখানা বিশ্বদর্পণ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই প্রত্যেক জীবে, সকল স্থাবর-জঙ্গমে, এক একটি খণ্ড আদর্শ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তাই আজ ভুবনে আদর্শের প্রতিভাস নানা; নানা ভঙ্গিমায় নানা রঙ্গিমায় বিচ্ছুরিত। চরমে যে বস্তুর সহিত যাহার সঙ্গমলিপ্সা, যে যাহাকে ধ্রুবতারার

মত লক্ষ্য করিয়া তাহার কক্ষস্থিত গ্রহের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেই পরম বস্তুর আভাসই তাহার জীবনের আদর্শে প্রতিফলিত। সে আদর্শে ভালমন্দ বিচার নাই, সুন্দর কুৎসিতের বিচার নাই, সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই। সে যে সকল বিচারের উপরে। গ্রহ যেমন মন্দোচ্চ গতিতে তাহার নিজ কক্ষে ভ্রমণ করে, আদর্শ-প্রতিভাসও সেইরূপ মর্ত্ত্যদৃষ্টিতে কখনও ঊর্দ্ধগামী, কখনও অধোগামী। সে কিন্তু ঊর্দ্ধাধোবিভাগের বাহিরে। সে খণ্ড আদর্শ প্রত্যেক প্রাণে স্বতন্ত্র। আর জগতের আদর্শ সেই খণ্ড আদর্শের সমষ্টি বই কিছুই নয়। সকল তারকামণ্ডলই ত একটি কেন্দ্রতারার অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। সেইরূপ মানবসমাজরূপী মহাপ্রাণীর লক্ষ্য হইল সকল জীবের লক্ষ্যসমষ্টির লক্ষ্যমাত্র। এবং সেই কারণে মনুষ্যচরিত্রে যাহা সম্ভব, মনুষ্যস্বভাব যে যে উপাদানে গঠিত, সে সকলই, অর্থাৎ ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, প্রণয় অপ্রণয়, আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সকলই এই ভগবৎ আদর্শের অন্তর্গত হইয়া আছে। বৈকুণ্ঠে ভগবান যাহাই হউন, বিশ্বের ভগবান, তোমার আমার উপাস্য, মুক্ত পুরুষ নহেন। তিনি আমাদেরই মত, আমাদেরই সহিত,—নিরন্তর সিদ্ধির জন্য সাধনা করিতেছেন! আর এই সিদ্ধির পথে উত্থান পতন আছে! তাই বিশ্বপথ ত সোজাপথ নয়। সে যে ভুজঙ্গগতি (curvi-linear), কুণ্ডলাকৃতি (spiral)।

এই সমষ্টিরূপী আদর্শই বিশ্বচক্ষে স্বপ্নের ন্যায় ভাসিতেছে, কোন অলীক শিবসুন্দরের স্বপ্ন নহে। এই বাস্তব ভগবানই জগৎরূপী মহাপ্রাণীর জীবনের গতির কারণ। আর এই বাস্তব আদর্শ অনুধাবন করিতে করিতেই জগৎ দিনে দিনে নূতন মার্গে আসিয়া পড়িতেছে, কত নূতন তত্ত্ব, নূতন জ্ঞান, নূতন ইচ্ছা, নূতন শক্তি, নূতন প্রাণ, দিনে দিনে এই বাস্তব ভগবানে বাড়িয়া উঠিতেছে। ইহাই ঐতিহাসিক আদর্শ মার্গ।

চল্ চল্ চল্, সাম্নে চল্।

আমার চলায় জগৎও চলে। যেমন কোন নাবিক সাহসমাত্র সম্বল করিয়া আপন জাহাজে এক অজানা পথে উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরু অভিমুখে—যে দিকেই হউক, কোন এক দিকে মুখ রাখিয়া বরাবর সোজাসুজি যাত্রা করে; এবং সে যদি চিহ্নিত উত্তরেরও উত্তরে বা দক্ষিণেরও দক্ষিণে, কোনও নূতন দ্বীপ বা সাগর প্রণালী, কোনও নূতন উত্তম আশাপথ আবিষ্কার করে,—তবে তাহার ইতিবৃত্ত ভূগোল-ইতিহাসে সর্ব্ববাদী সত্য হইয়া চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকে; এবং সেই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর মাটি ও জলের অংশও যেন কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ আজ সেই শূন্যসাগরে ভাসিতে ভাসিতে যে দেশে আসিয়াছি, যে তত্ত্বভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাকে কি জগৎ তাহার তত্ত্ব, তাহার জ্ঞান, বলিয়া গ্রহণ করিবে না? আমার জ্ঞান, আমার ভগবান, কি আজ জগতের জ্ঞান, জগতের ভগবান, হইবে না? আমার রহস্য কি জগতের রহস্য নয়? আজ আমি যেখানে আসিয়া থামিয়া গেলাম—এই জগৎও কি সেখানে আসিয়া থামিয়া গেল না? আমার বিরামে জগৎও কি বিশ্রাম লাভ করিল না?

আজ বুঝিলাম জীবনে অবকাশের মূল্য কি?—বসনে যেমন ছিদ্র টানা ও পড়েনের দরুন, কার্য্যে যেমন কারণ, সেইরূপ জীবনের গতিতে অবকাশ। সকল সৃষ্টির মূলেই এই অবকাশ, এই ফাঁকা রাজ্য। সকল ধাতু যেমন খনিতে, সকল তাপ যেমন বস্তুসকলের গর্ভে, সেইরূপ যত উৎপাদনী যত সৃজনী শক্তির মূল এইখানেই, এই ফাঁকে। শিল্পী এখান হইতেই রস সংগ্রহ করিয়া মাটিতে রসান দিয়া শিল্পমূর্ত্তি গঠন করে। এই যে স্বভাব-শোভা, এই যে রাশিচক্র, এই যে বিশ্বের রাসমণ্ডল, ইহা সব ফাঁকারাজ্যের রসেই গঠিত। এই ফাঁকা হইতেই যত আঁকাজোকা। এই ফাঁকা হইতেই কায়ার সৃষ্টি, নীরূপ হইতেই রূপের বিভ্রম। যাহা ব্যক্ত তাহার স্বরূপ অব্যক্ত, যাহা নির্ব্বচনীয় তাহার মূলে একটি অনির্ব্ব-

চনীয়। যে ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে, রূপ হইতে অরূপে না যায়, যাহার গতির পর অবকাশ না আসে, সে তত্ত্বের সন্ধান পায় না, রসের স্বাদ জানে না। পরব্যোমে যেমন অনাহত শব্দ আছে, তেমনি যাহা স্বপ্রকাশ তাহারও পশ্চাতে একটি শূন্য আছে। এই শূন্যটিই সৃষ্টি-স্থিতির সন্ধিস্থল। এই ফাঁকার ভিতর দিয়াই যত যাওয়া আসা, যত নিঃশেষ করা ও ভরিয়া তোলা, যত আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ, যত জোয়ার ভাঁটা, যত আলোক আঁধার। এই ফাঁকাটি না থাকিলে দুনিয়া ফাঁক হইত। এই ফাঁকার ভিতর দিয়াই আমি কেবলই যাওয়া আসা করিতেছি।

চল্ চল্ চল্, সাম্নে চল্।

শ্রীসরযুবালা দাসগুপ্তা।

অন্তর্যামী

[১]

এ পথেই যাব বঁধু? যাই তবে যাই!—
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল!
পথের তুলিব ফুল, কাঁটা ফেলি দিব,
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব!
গুন্ গুন্ গাহি গান পথে চলি যাব,
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব!
দরশন নাহি দিলে কাছে কাছে থে'ক
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডে'ক!

[২]

ভরা প্রাণে আজ আমি যেতেছি চলিয়া
তোমারি দেখান এই বনপথ দিয়া!
কত না সোহাগভরে তুলিতেছি ফুল,
কত না গরবে মোর হৃদয় আকুল!
কত না বিচিত্ররাগে পরাণ কাঁপিছে,
কত না আশার আশে হৃদয় নাচিছে!
কে যেন কহিছে কথা, হৃদয় মাঝারে
কে যেন আঁকিছে আলো নিশীথ আঁধারে!
কে যেন কি জানি মোরে করায়েছে পান
বাতাসে পত্রের মত মর্ম্মরে পরাণ!

যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
যেন কার গানে গানে ভরেছি জীবন!
তোমারি মোহিনী এ যে তোমারি মোহিনী
ভাবে ভোর তাই বঁধু বুঝিতে পারিনি।

[৩]

কেমন্ করে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর
বুকের মাঝে কেমন্ করে চোখে বহে লোর!
দিবস্‌নিশি কতই তব কথা শুনি কাণে
প্রাণের মাঝে তোলাপাড়া মানে অভিমানে!
পরশ্ তব স্বপনসম প্রাণে আনে ঘোর
নিশাস্ তব মুখে লাগে কাঁপে প্রাণ মোর!
তোমার প্রেমে এত জ্বালা আগে নাহি জানি
চোখের জলে ভেসে ভেসে আজি হার মানি!
ছেড়ে দাও'ত চলে যাই, তুমি থাক পিছে,
দরশ্ যদি নাহি দিলে সোহাগ্ করা মিছে!

[৪]

ক্ষম অভিমান, বঁধু, ক্ষম অভিমান
আঁধারে তোমার লাগি ঝরিছে নয়ান!
বাহু বাড়াইয়া দিলে কিছু নাহি পাই
শূন্য মনে ভূমিতলে কাঁদিয়া লুটাই!
বুঝি এই প্রেমে লাগে অনেক সাধনা!—
তবে ছেড়ে দিনু আজ! কর গো রচনা
আমার জীবন লয়ে যাহা তুমি চাও!
পরাণের তারে তারে আপনি বাজাও!
কাঁদিব না আমি আর কথা নাহি কব
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে পড়ে রব!

[৫]

কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে
পরাণে কেমন করে পরাণ্ই তা জানে!
রাগ করিও না বঁধু আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে!
এত করে চাপি বুক তবু হাহাকার
ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বার বার!
সে শুধু তোমারি তরে তোমা পানে ধায়
তোমারে না পেয়ে, মোর বুকে গরজায়!
এই অশ্রু, এই ব্যথা, এই হাহাকার,
তুমি না লইবে যদি কারে দিব আর?

[৬]

মরম আঁধারে বঁধু প্রদীপ জ্বালাও!
আমার সকল তারে বাজাও, বাজাও,
আপনি বাজাও! আমি কথা নাহি কব,
নয়ন মুদিয়া আমি শুধু চেয়ে রব!

[৭]

কোন্ ছায়ালোক হ'তে প্রাণের আড়ালে
এমন সোহাগভরে প্রদীপ জ্বালালে!
ওগো ছায়ারূপী! কোন্ ছায়ালোকে তুমি
তুলিতেছ গীতধ্বনি হৃদি-তন্ত্রী চুমি
মোহন পরশে? আমি কথা নাহি কই
বঁধু হে! নয়ন মুদি শুধু চেয়ে রই!

[৮]

কোথা ওই ছায়ালোক, কোথা প্রাণখানি!
এই প্রাণ-প্রান্ত হ'তে কতদূর জানি!
কতদূর, কত কাছে, ভেবে নাহি পাই
আঁধারের মাঝে শুধু আঁখি মুদে চাই!
একি মোর মরমের অজানিত দেশ?
এই প্রাণ-প্রান্ত কিগো পরাণের শেষ?
একি গো তোমার বঁধু গোপন আবাস?
হোথা হ'তে মাঝে মাঝে দিতেছ আভাস?
আমি'ত জানিনা কিছু তুমি সব জান,—
কোথা হ'তে এত করে মোরে তুমি টান!

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

২। নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝিতে হয়; এবং সেই সকল কথা বুঝিয়া উঠাও অতি কঠিন। মোটা-মুটি ধরিতে গেলে নির্ব্বাণ শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়, তেমনই মানুষ নিবিয়া গেল। প্রদীপ নিবিয়া গেলে কিছু থাকেনা; মানুষ নিবিয়া গেলেও কিছুই থাকে না। এ কথাটা, শুনিতে যত সোজা, ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে তত সোজা নয়। প্রদীপ নিবিয়া গেল, আর কিছু নাই, একেবারে শেষ হইয়া গেল; কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায়? একেবারে 'নিহিল' হইয়া যায়? একেবারে 'এনিহিলেসন' হইয়া যায়? একেবারে 'নাস্তি' হইয়া যায়? এই-খানেই গোল বাধিল। আমি একেবারে থাকিব না, এবং সেইটিই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে? আমি তপ জপ, ধ্যান ধারণা করি, শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি বিলোপ করিবার জন্য? এ ত বড় শক্ত কথা।

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন। এইজন্য অনেক পাদরী সাহেবেরা বলেন বৌদ্ধেরা নিহিলবাদী বা বিনাশবাদী। বুদ্ধ নিজে কি বলি-য়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নির্ব্বাণের পাঁচ শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার বক্তৃতার যেরূপ রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহাও, আবার তিনি ঠিক যে ভাষায় বলিয়াছিলেন, সে ভাষার ত কিছুই পাওয়া যায় না। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল, সেই

রিপোর্টমাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও ঐরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার সহিতই নির্ব্বাণের তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নির্ব্বাণের পর কি থাকে। সুতরাং নির্ব্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহার শিষ্যেরা সেটা ভাবিতেও যেন ভয় পাইত। বুদ্ধদেব সে কথার কি জবাব দিলেন, আমরা পরে তাহা বিবেচনা করিব।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত বৎসরের পর, কনিষ্ক রাজার গুরু অশ্বঘোষ সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য একখানি কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যেমন তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কবিরাজেরা মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়ায়, সেইরূপ আমি এই কঠিন বৌদ্ধধর্ম্মের মতগুলি কাব্যের আকারে লিখিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছি। তিনি নির্ব্বাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার রিপোর্ট নহে, তাঁহার নিজেরই কথা। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একজন প্রধান প্রচারক, প্রধান গুরু এবং প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার কথা আমাদের মন দিয়া শুনা উচিত। তিনি বলিয়াছেন :—

দীপো যথা নিবৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
এবং কৃতী নিবৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিদ্বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

"প্রদীপ যেমন নির্ব্বাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও যায় না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যায় না; তৈলেরও শেষ, প্রদীপটারও শেষ; সাধকও তেমনই ভাবে, নির্ব্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান

না, আকাশেও যান না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যান না। তাঁহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহারও সব ফুরাইয়া গেল, সব শান্ত হইল।"

এখানে কথা হইতেছে "উপৈতি শান্তিম্"—'সব শেষ হইয়া গেল' —ইহার অর্থ কি নিহিল? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? অশ্বঘোষও নির্ব্বাণের পর আর কিছু থাকিল কি না, কিছুই বলিলেন না। এই দুইটি কবিতার পরই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু এই কবিতা দুইটির পূর্ব্বে যে তিনটি কবিতা আছে, তাহা পড়িলে, নির্ব্বাণ যে অস্তিত্বের লোপ, এরূপ বোধ হয় না। সে তিনটি কবিতা এই,—

তজ্জন্মনো নৈকবিধস্য সৌম্য
তৃষ্ণাদয়ো হেতব ইত্যবেত্য।
তাংশ্ছিন্ধি দুঃখাদ্‌যদি নির্ম্মুমুক্ষা
কার্য্যক্ষয়ঃ কারণসংক্ষয়াদ্ধি॥
দুঃখক্ষয়ো হেতু-পরিক্ষয়াচ্চ
শান্তং শিবং সাক্ষিকুরুদ্ধ ধর্ম্মম্।
তৃষ্ণাবিরাগং লঘনং নিরোধং
সনাতনং ত্রাণমহার্য্যমার্য্যম্॥
যস্মিন্নজাতির্জরা ন মৃত্যুঃ
ন ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সম্প্রযোগঃ।
নেচ্ছাবিপন্ন প্রিয়বিপ্রযোগঃ
ক্ষমং পদং নৈষ্টিকমচ্যুতং তৎ॥

"অতএব তৃষ্ণা প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু এইটি মনে মনে বুঝিয়া, তোমার যদি মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষ্ণাকে ছেদ কর। যেহেতু, কারণের ক্ষয় হইলে, কার্য্যেরও ক্ষয় হইবে।

"এখানে তৃষ্ণাদি হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখেরও ক্ষয় হইবে। অতএব তুমি "ধর্ম্ম"কে প্রত্যক্ষ কর। এ "ধর্ম্ম" শান্তিময়, মঙ্গলময়,

ইহাতে তৃষ্ণার উপর বিরাগ হয়, ইহা গুহার মত, ইহাতে সর্ব্বধর্ম্মের নিরোধ হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, ইহাতেই পরিত্রাণ, ইহা কেহ হরণ করিতে পারে না, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"ইহাই চরম ও অচ্যুত পদ। ইহাতে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই, শত্রুসমাগম নাই, নৈরাশ্য নাই, প্রিয়-বিরহ নাই, ইহাই পাইবার মতন জিনিস।"

যখন অশ্বঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্ব্বাণের ঐ দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্ব্বাণশব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে, নির্ব্বাণের পর আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না।

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কি উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক্। "নির্ব্বাণের পর কিছু থাকিবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "থাকিবে না কি?" উত্তর হইল "না"। "থাকা না থাকার মাঝামাঝি কোন অবস্থা হইবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "কিছু থাকা না থাকা এদু'য়েরই বাহিরে কোন বিশেষ অবস্থা হইবে কি?" আবার উত্তর হইল "না"।

তবে দাঁড়াইল কি? এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবস্থায় "অস্তি"ও বলিতে পরিনা, "নাস্তি"ও বলিতে পারিনা। এদু'য়ে জড়াইয়া কোন অবস্থা নয়, এদু'য়ের অতিরিক্ত কোন অবস্থাও নয়। ইহাতে পাওয়া গেল কোন অনির্ব্বচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে।

এই অবস্থাকেই মহাযানে "শূন্য" বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। "শূন্য" বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাই বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বলেন "আমরা করি কি? আমরা যে ভাষায় শব্দ পাই না। নির্ব্বাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহা যে বাক্যের অতীত। ঠিক্ কথাটি পাইনা বলিয়াই আমরা উহাকে

"শূন্য" বলি। কিন্তু শূন্যশব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা অস্তিনাস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার অবস্থার অতীত। 'অস্তিনাস্তিতদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্'।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার তর্কপাদে শূন্যবাদীদের নানারকমে ঠাট্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যাহাদের মতে সবই শূন্য, তাহাদের সঙ্গে আর বিচার কি করিব?" তিনি বৌদ্ধদের "বিনাশবাদী" বলেন। তাঁহার মতে নৈয়ায়িকেরা "অর্দ্ধবিনশন" অর্থাৎ আধখানা বিনাশবাদী। কেননা, নৈয়ায়িকেরাও বলেন, "অত্যন্ত সুখদুঃখ-নিবৃত্তি"র নামই "অপবর্গ। সুখদুঃখ যদি একেবারেই না রহিল, তবে আত্মা ত পাথর হইয়া গেল। তাই শঙ্করের পর মহাকবি শ্রীহর্ষ গৌতম ঋষিকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিশ্ব তথৈব সঃ॥

অর্থাৎ যে গোতম জীবন্ত প্রাণীকে পাথর করিয়া দিবার জন্য শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নামটী সার্থক হইয়াছে, তিনি গোতমই বটেন—তাঁহার মত গরু আর দ্বিতীয় নাই।

সাধারণ লোকে বলিবে পাথর হওয়াও বরং ভাল। কেননা, কিছু আছে দেখিতে পাইব। শূন্য হইলে ত কিছুই থাকিবে না।

যাহাহোক অশ্বঘোষ যে নির্ব্বাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষার পুস্তকে উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে নির্ব্বাণ একটি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। সুধু বাক্যের অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কাণ্ট ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল বলিয়া গিয়াছেন? কেননা, ইহা মানুষের বুদ্ধি ছাড়াইয়া যায়, মানুষে ইহা ধারণা করিতে পারে না।

এরূপ অনির্ব্বচনীয় না বলিয়া, অশ্বঘোষের মতে যে চরম ও অচ্যুতপদ আছে, তাহাকে অস্তি বলিয়া স্বীকার করনা কেন?

কিন্তু অস্তি বলিলে, একটা বিষম দোষ হয়। যতক্ষণ আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ "অহং" এই বুদ্ধিটি থাকিবে। অহংজ্ঞান থাকিলেই অহঙ্কার হইল। অহঙ্কার থাকিলেই সকল অনর্থের যা মূল, তাই রহিয়া গেল। সুতরাং সে যে আবার জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। আরও কথা, আত্মা যখন রহিলই, তখন তাহার ত গুণগুলাও রহিল। অগ্নি কিছু রূপ ও উষ্ণতা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আত্মা থাকিলে তাহার একত্ব-সংখ্যা থাকিবে। একত্ব-সংখ্যাও ত একটি গুণ। সে আত্মার জ্ঞান থাকিবে? না, থাকিবেনা? যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থও থাকিবে, জ্ঞেয় পদার্থ থাকিলেও আত্মার মুক্তি হইল না। আর, আত্মার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে আত্মা আত্মাই নয়। সেইজন্যই অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "আত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মুক্তি হইবে না"। তাঁহার প্রথম গুরু অরাড় কালামের সহিত বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে ইহারা বলে আত্মা দেহনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহ-নির্ম্মুক্ত হইলেই, মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আত্মাকে "চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত" করিয়া, তবে তৃপ্ত হইলেন।

তাঁহার শিষ্যেরা, আত্মাকে শূন্যরূপ, অনির্ব্বচনীয়রূপ, চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্তরূপ, মনে করিলেও ক্রমে তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার নির্ব্বাণকে অভাব বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মতে সংসার হইল ভাব পদার্থ এবং নির্ব্বাণ অভাব। ভাবাভাব বলিতে তাহারা ভব ও নির্ব্বাণ বুঝিতেন। তাহারও পরে আবার যখন তাহারা দেখিল, যে প্রকৃত পক্ষে ভব বা সংসার সেও বাস্তবিক নাই, আমরা ব্যবহারতঃ তাহাদিগকে "অস্তি" বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবিক সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধর্ম্ম অতি সহজ হইয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল—

অপণে রচিরচি ভব নির্ব্বাণা।
মিছা লোক বন্ধাবএ অপণা॥

অর্থাৎ ভবও শূন্যরূপ, নির্ব্বাণও শূন্যরূপ। ভব ও নির্ব্বাণে কিছুই ভেদ নাই। মানুষে আপন মনে ভব রচনা করে, নির্ব্বাণও রচনা করে। এইরূপে তাহারা আপনাদের বদ্ধ করে। কিন্তু পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয়। সবই শূন্যময়।

তাহা হইলে ত বেশ হইল। ভবও শূন্য, ভাবও শূন্য, আত্মাও শূন্য, সুতরাং আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত, স্বভাবতঃই মুক্ত, "শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ"। তবে আর ধর্ম্মেই কাজ কি? যোগেই কাজ কি? কঠোরেই বা কাজ কি? ধ্যানেই বা কাজ কি? সমাধিতেই বা কাজ কি? ধর্ম্ম অধর্ম্মেই বা কাজ কি? যার যা খুসি কর। তোমরা স্বভাবতঃই মুক্ত, কিছুতেই তোমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। পরম যোগীও যেমন মুক্ত, অতিপাপিষ্ঠও তেমনই মুক্ত।

এই জায়গায় সহজিয়া বৌদ্ধ বলিল যে মূঢ় লোক ও পণ্ডিত লোকের মধ্যে একটি ভেদ আছে। সকলেই স্বভাবতঃ মুক্ত বটে, কিন্তু মূঢ় লোকে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা আপনাদের বদ্ধ করিয়া ফেলে, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহার পর পঞ্চকামোপভোগ করিলে, কিছুতেই বদ্ধ হয় না।

"যেনৈব বধ্যতে বালো বুধস্তেনৈব মুচ্যতে"। যে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা বালজাতীয় অর্থাৎ মূর্খ লোকে বদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া তাহাতেই মুক্ত হয়।

আর এক উপায়ে নির্ব্বাণ ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের জন্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে বোধিচিত্ত বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সৎপথে বা ধর্ম্মপথে বা সদ্ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে যেমন তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হইতে অধিক উচ্চ উচ্চ লোকে উঠিতে লাগিল। যদি তাহার

উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তবে সে এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে সে এই জন্মেই বোধি লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধদের বিহারে যে সকল স্তূপ দেখা যায়, সেই স্তূপগুলিতে এই উন্নতির পথ মানুষের চোখের উপর ধরিয়া দিয়াছে। স্তূপগুলি প্রথমে একটি গোল নলের উপর খানিক দূর উঠিয়াছে। তাহার উপর একটি গোলের অর্দ্ধেক। তাহার উপর একটি নিরেট চারকোণা জিনিস। তাহার উপর একটি ছাতা। তাহার উপর আর একটি ছাতা, এটি প্রথম ছাতা হইতে একটু বড়। তাহার উপর আর একটি ছাতা, দ্বিতীয় ছাতার চেয়ে আর একটু বড়। চতুর্থটি তৃতীয় ছাতার অপেক্ষা একটু ছোট, পঞ্চমটি আরও ছোট। এইখানে এক সেট ছাতা শেষ হইয়া গেল। তাহারও উপর ছাতার খানিকটা বাঁট মাত্র। এই বাঁটের পর আবার আর এক সেট ছাতা, কোন মতে ১৩টি, কোন মতে ১৬টি, কোন মতে ২১টি, কোন মতে ২৩টিও দেখা যায়। ছাতাগুলি ক্রমে ছোট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার খানিকটা ছাতার বাঁট। ইহার উপর আবার মোচার আগার মত আর একটা জিনিস। মোচার আগাটি বেড়িয়া উপরি উপরি চার পাঁচটি বৃত্ত আছে। মোচার আগাটি একেবারে ছুঁচের মত।

বোধিচিত্ত প্রণিধিবলে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি এই স্তূপে উঠিতে লাগিলেন। স্তূপের নীচের দিক্‌টা ভূত-প্রেত-পিশাচ-লোক ও নরক। তাহার উপর যে গোলের আধ-খানা আছে, সেটি মনুষ্যলোক। বোধিচিত্ত মানুষেরই হয়। সুতরাং সে চিত্ত এইখান হইতেই উঠিতে থাকে। প্রথমে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা সে ঐ নীরেট চারিকোণায় উঠিল। এটি চারিজন মহারাজার স্থান, তাঁহারা চারিদিকের অধিপতি। তাঁহা-দের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বৈশ্রবণ ও বিরূপাক্ষ। তাহার উপর ত্রয়স্ত্রিংশ ভুবন। এখানকার রাজা ইন্দ্র এবং ৩৩ জন দেবতা

এখানে বসবাস করেন। ইহার উপর তুষিত ভুবন। বোধিসত্ত্বেরা এইখান হইতে একবারমাত্র পৃথিবীতে গমন করেন এবং সেখানে গিয়া সম্যক্ সংবোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হন। ইহার পর যামলোক। ইহার পর নির্ম্মাণরতিলোক, অর্থাৎ, ইঁহারা ইচ্ছামত নানারূপে নানা ভোগ্যবস্তু নির্ম্মাণ করিয়া উপভোগ করিতে পারেন। ইঁহা-দের পরে যে লোক, তাহার নাম পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, অর্থাৎ, তাঁহারা নিজে কিছুই নির্ম্মাণ করেন না, পরে নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত আসিয়া কামধাতু শেষ হইয়া গেল, অর্থাৎ, এইখানে আসিয়া বোধিচিত্তের আর কোন ভোগের আকাঙ্ক্ষা রহিল না।

এইখান হইতে রূপলোকের আরম্ভ। কাম নাই, রূপ আছে, আর আছে উৎসাহ। সে উৎসাহে ধ্যান, প্রণিধি ও সমাধিবলে বোধিচিত্ত ক্রমশঃই উঠিতে লাগিলেন। রূপধাতুতে, প্রধানতঃ, চারিটি লোক; অবশিষ্ট লোকগুলি এই চারিটিরই অধীন। এই চারিটি লোক লাভ করিতে হইলে, বৌদ্ধদের চারিটি ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক ও বিবেক থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে বিত-র্কের লোপ হইয়া যায়, প্রীতি ও সুখে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি লোপ হইয়া যায়, কেবল মাত্র সুখ থাকে। চতুর্থ ধ্যানে সুখও লোপ হইয়া যায়, তখন বোধিচিত্ত রূপ অর্থাৎ শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চান।

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধিচিত্ত আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। এবার তিনি রূপলোক ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। রূপলোক ছাড়াইয়া অরূপলোকে উঠিয়াছেন। তখন তিনি আপ-নাকে, সমস্ত বস্তু, এমন কি নীরেট জিনিসটি পর্য্যন্ত তিনি আকাশ মাত্র দেখেন, অর্থাৎ সকলই তাহার নিকট অনন্ত ও উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর আত্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় যে কিছুই কিছু নয়। এই যে অনন্ত দেখিতেছি, ইহা

কিছুই নয়। ইহারও উপর বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলে তখন তাহার চিন্তা হইল এই যে কিছুই নয়, ইহার কোন সংজ্ঞা আছে কিনা। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞীও আছে। কিন্তু সংজ্ঞী ত নাই, সে ত অকিঞ্চন। সুতরাং সংজ্ঞাও নাই, সংজ্ঞীও নাই। ইহার পর বোধিচিত্ত সেই মোচার আগায় উঠিলেন। এই যে স্তূপ ইহাই "ত্রৈধাতুক লোক" তিনি এখন ইহার মাথার উপর। তাঁহার চারিদিকে অনন্তশূন্য, আর তাঁহার উঠিবার জায়গা নাই। তিনি সেইখান হইতে অনন্তশূন্যে ঝাঁপ দিলেন। যেমন নুণের কণা জলে মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না। সেইরূপ বোধিচিত্তও আপনাকে হারাইয়া অনন্তশূন্যে মিশিয়া গেলেন। যেমন সমুদ্রের জলে একটু লোনা আস্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্তশূন্যে বুদ্ধের একটু প্রভাব রহিয়া গেল। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম ও বিনয় অনন্তকালের জন্য ত্রৈধাতুক-লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নির্ব্বাণ বলিতে 'নাই' 'নাই'ই বুঝায়। প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা এই 'নাই' 'নাই' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। নির্ব্বাণ হইয়া গেল, একটা অনির্ব্বচনীয় অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল শূন্য হওয়াই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উহার সঙ্গে আর একটা জিনিস আনিয়া ফেলিলেন; উহার নাম 'করুণা'। ইহা যেমন তেমন করুণা নয়, সর্ব্বজীবে করুণা, সর্ব্বভূতে করুণা। রূপধাতু ত্যাগ করিয়া অরূপধাতুতে আসিয়া যেমন সকল পদার্থকেই আকাশের ন্যায় অনন্ত দেখিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ করুণাকেও অনন্ত দেখিতে লাগিলেন। শুষ্ক 'শূন্যতা' লইয়া যে নির্ব্বাণ, প্রাণশূন্য, নিশ্চল, নিস্পন্দ, কতকটা পাথরের মত, কতকটা শুকনা কাঠের মত হইয়াছিল; করুণার স্পর্শে, তাহাতে যেন জীবন সঞ্চার হইল; নিজ্জীবে জীবন আসিল, উদ্দেশ্যশূন্যে উদ্দেশ্য আসিল, সত্য সত্যই শুষ্কতরু যেন মুঞ্জরিয়া

উঠিল। যাঁহারা অর্হৎ হওয়াই, অর্থাৎ কোনরূপে আপনাদের মুক্ত করাই, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, সমস্ত জগৎ যাঁহাদের চক্ষে থাকিলেও হইত, না থাকিলেও হইত। জগতের পক্ষে যাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধরা এখন হইতে আপনার উদ্ধারটা আর তত বড় বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, জগৎ উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। আমার আমিত্বটুকু লোপ করিব, আমি মুক্ত হইব, আর আমার চারিদিকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব বদ্ধ থাকিবে, একি আমার সহ্য হয়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সংসারের সকল গণ্ডী পার হইয়া ধ্যান-ধারণাদি বোধিসত্ত্বের যা কিছু কাজ, সব সাঙ্গ করিয়া, এমন কি ধর্ম্মস্তূপের আগায় উঠিয়া শূন্যতা ও করুণাসাগরে ঝাঁপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারিদিকে কোলাহল শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার আমিত্ব চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার আয়তন আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণাও আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব দুঃখে আর্ত্তনাদ করিতেছে; জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিসের কোলাহল'। তাহারা উত্তর করিল 'আপনি করুণার অবতার আপনি যদি নির্ব্বাণ লাভ করেন, তবে আমাদের কে উদ্ধার করিবে?' তখন অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন 'যতক্ষণ জগতের একটিমাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণ লইব না।'

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতে বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে এই মত লইয়াই চলিত। ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বলিত। তাহারা মনে করিত এত বড় মত আর হইতে পারে না। যখন বোধিসত্ত্বেরা করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহারা জীবের উদ্ধারের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বুদ্ধদেব যে পঞ্চশীল দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভঙ্গিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্য্যদেব 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণে' বলিয়া গিয়াছেন 'যে জগৎ উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, তাহার যদি কোন দোষ হয়, সে দোষ একেবারে ধর্ত্তব্যই নয়।'

এই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন যেমন গভীর, ধর্ম্মমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করিয়া এইমতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তখন বড় বড় রাজ্য ছিল, নানারূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল, ধর্ম্মেরও যথেষ্ট আদর ছিল। তাই এত লোকে এতশত বৎসর ধরিয়া একই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

চাণক্য শ্লোকে বলে 'ধন উপায় করা বড় সহজ, কিন্তু ধন রাখা বড় কঠিন।' জ্ঞানেরও তাই, জ্ঞান উপার্জ্জন সহজ, কিন্তু জ্ঞানটি রক্ষা করা বড় কঠিন। মহাযানেরও এই জ্ঞান বেশীদিন রক্ষা হয় নাই। দেশ ক্রমে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য লোপ হইয়া আসিল, লোকেও দেখিল যে বহুকাল চিন্তা করিয়া বহুকাল যোগসাধনা করিয়া মহাযান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, সুতরাং একটা সহজ মত বাহির করিতে হইবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজার দত্ত বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া যজমানদিগের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের আর চিন্তা করিবার সময়ও রহিল না, সে স্বাধীনতাও রহিল না।

কিন্তু নির্ব্বাণের কথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক বাহিরের কথা বলিয়া ফেলিলাম। বোধ হয় এগুলি না বলিলে হইত না। মহাযানের নির্ব্বাণ 'শূন্যতা' ও 'করুণায়' মিশামিশি। এ নির্ব্বাণের একদিকে 'করুণা', আর একদিকে 'শূন্যতা', করুণা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু যে সকল যজমানের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেশী নির্ভর করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে শূন্যতা বুঝান বড়ই কঠিন। তাঁহারা শূন্যতার বদলে আর একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন—সেটি "নিরাত্মা"। নিরাত্মা শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধা যায় না, কিন্তু

এসময় বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যজমানদিগকে বুঝাইলেন যে, বোধিসত্ত্ব যখন স্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাঁহারা চারিদিকে অনন্ত শূন্য দেখিতেছেন। এই শূন্যকে তাঁহারা বলিলেন 'নিরাত্মা', সুধু নিরাত্মা বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন "নিরাত্মাদেবী", অর্থাৎ নিরাত্মা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বোধিসত্ত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সে কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল; কেননা সেটা বুঝিতে ত কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না। এখন নির্ব্বাণের অর্থ কি দাঁড়াইল, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর ঠিক ঐ সময়েই, যজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের মন কত নরম হয়, কত করুণায় অভিভূত হয়। সে কথাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইল না। সুতরাং নির্ব্বাণ যে শূন্যতা ও করুণার মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল। এ নির্ব্বাণেও সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ভাষার কথা

বহুদিন পূর্ব্বে মফঃস্বলের এক সহরে একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের ইংরাজি লেখার সখটা যত ছিল, ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান ততটা ছিল না। পদে পদেই তাঁর লেখায় ব্যাকরণ ভুল হইত। এইজন্য বন্ধুবান্ধ-বেরা তাঁহাকে তম্বি করিলে, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে স্কুলের ছেলেরাই ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিবে, লেখকেরা ব্যাকরণের বাঁধা-পথ ধরিয়া চলেন না, ব্যাকরণই তাঁদের লেখার অনুসরণ করিয়া আপনার সূত্র সকল রচনা করে। তাঁর উদ্ভট সাহিত্য সৃষ্টির সম্বন্ধে থাটুক আর নাই থাটুক, কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা, এমনও বলা যায় না। ব্যাকরণের কাঁটা-কম্পাস ধরিয়া লিখিতে গেলে, রচনা বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু এসকল বাঁধাধরার ভিতরে কোথাও কোনও সরস ও শক্তিশালী জীবন্ত-সাহিত্য গড়িয়া উঠে না।

কিন্তু ব্যাকরণের বাঁধাধরার ভিতর না থাকিলেও, কোনও লেখকই, যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন, ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতিকে উলট-পালট করিয়া দিতে পারেন না। ব্যাকরণ যতটা পরিমাণে ভাষার এই মূল গঠন ও প্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততটুকু পর্য্যন্ত সকল লেখককেই ব্যাকরণের শাসন মানিয়া চলিতে হয়। এগুলি ব্যাকরণের মূল কথা। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার সকল ব্যাকরণেই অনেকগুলি অবান্তর বিষয়ও মিশিয়া যায়। এই অবান্তর বিষয়গুলিই ভিন্ন ভিন্ন যুগের সাহিত্য-রথীদের লেখার উপরে গড়িয়া উঠে। এসকল অবান্তর নিয়মের কোনও বিশেষ বাধ্যবাধকতা নাই। রামমোহন রায়ের সময়ে "আমারদিগের" "তাঁহারদিগের" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইত। ক্রমে "আমাদিগের" "তাঁহাদিগের" প্রভৃতি চলিয়া গেল। এখন আমরা "আমাদের", "তোমাদের" "তাঁহাদের" লিখিয়া

থাকি। এটা একটা অবান্তর পরিবর্ত্তন। এক সময় সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষাতেও বিশেষ্য পদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে তার বিশেষণ পদেও স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। কোনও কোনও স্থলে আমরা এখনও এই নিয়ম মানিয়া চলি, কোন কোনও স্থলে বা ইহাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া থাকি। শক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া, বাঙ্গালাতেও যে "এব্যক্তির কি বিপুলা শক্তি আছে"—এরূপ লিখিতে হইবে, এখন আর কেহ একথা শুনেনা; প্রায় সকলেই "বিপুল শক্তি" বলেন ও লিখেন। আবার অন্যত্র এই শক্তি শব্দের বিশেষণেও স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, অন্যথা তাহা শিষ্ট-প্রয়োগ হয় না। এই জন্য একদিকে যেমন "বিপুল শক্তি" বলি, অন্যদিকে সেইরূপ "মহৎ শক্তি" বলিনা, কিন্তু "মহতী শক্তি"ই বলিয়া থাকি। এইরূপে আজিকালিকার বড় বড় বাঙ্গালা লেখকেরা নানাদিক্ দিয়াই পুরাতন ব্যাকরণের বাঁধনগুলি আল্‌গা করিয়া দিতেছেন। ইহাতে কোনও দোষ হয়না। এরূপ করা সর্ব্বতোভাবেই সঙ্গত। লেখক-দের এই স্বাধীনতাটুকু না থাকিলে, ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায়না। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও ভাষার মূল গঠন বা প্রকৃতিকে উলট-পালট করিয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই।

যুগে যুগে প্রত্যেক জীবন্ত ভাষারই অশেষবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যেখানে এ পরিবর্ত্তন-ধারা বন্ধ হইয়া যায়, সেখানে হয় যে জাতি বা সমাজ ঐ ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল তাহাদের নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির ও জ্ঞানার্জ্জনের শক্তি লোপ পাইয়াছে, না হয় তাহাদের প্রতিদিনের বিষয়কর্ম্মের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ও উচ্চশিক্ষার ভাষার একটা অলঙ্ঘ্য প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রভেদ যেখানে দাঁড়ায়, সেইখানেই সাহিত্যের ভাষা মৃত আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই লোকের প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষা ছিল এক, আর সাহিত্যের ভাষা ছিল আর এক। স্ত্রীলোকেরা ও জনসাধারণে আটপহরিয়া ভাষাই সর্ব্বদা ব্যবহার

করিতেন, পণ্ডিতেরাই কেবল সাহিত্যের পোষাকী ভাষাতে কথাবার্ত্তা কহিতেন ও গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। এই আটপহরিয়া ভাষার সাধারণ নাম ছিল প্রাকৃত, আর ঐ পোষাকী ভাষার নাম ছিল সংস্কৃত। প্রতিদিনের কর্ম্মাকর্ম্মের ভিতর দিয়াই মানুষের নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। এই কর্ম্মক্ষেত্রেই একভাষাভাষী লোকের সঙ্গে অন্যভাষাভাষী লোকের সাক্ষাৎকার ও আদানপ্রদানের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। সুতরাং এক নিজেদের ভিতরকার অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন বৃদ্ধির এবং অপর বাহিরের লোকের সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের কর্ম্মজীবনের ভাষাতে নূতন নূতন ভাব আদর্শ জ্ঞান ও রস সঞ্চিত হইয়া, নানাদিক দিয়া তাহাকে ফুটাইয়া তুলে। আর যেখানে লোকের এই প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য ভাষা হইতে তাদের লেখাপড়ার, শিক্ষাদীক্ষার, বিজ্ঞান-দর্শনের এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মকর্ম্মের ভাষা পৃথক হইয়া পড়ে, সেইখানেই শেষের ভাষাটা মৃত পদবী প্রাপ্ত হয়। এইভাবেই আমাদের সংস্কৃতভাষা ও ইউরোপের গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ এই দুই প্রাচীন ভাষা মৃত আখ্যা পাইয়াছে। এ সকল মৃতভাষাতে ব্যাকরণের বাঁধন বড় শক্ত। যে জীবনীশক্তি থাকিলে জীব প্রাচীনকে অতিক্রম করিয়া নূতনকে আপনার করিয়া লইতে পারে, সেই জীবনীশক্তির অভাবেই এই সকল পুরাতন মৃতভাষা এমন কঠিন বাঁধাবাঁধির ভিতরে পড়িয়া আছে। প্রতিদিনের কর্ম্মের সঙ্গে এসকল ভাষার কোনও বিশেষ সম্পর্ক নাই বলিয়া, এই বাঁধন কাটিয়া মুক্তিলাভ করিবার কোনও প্রেরণাও এক্ষেত্রে উপস্থিত হয়না। কিন্তু চল্‌তি ভাষাকে এরূপ বাঁধাবাঁধির ভিতরে আটকাইয়া রাখা যায়না। যে চল্‌তে চায়, যাকে চল্‌তে হয়ই, সে কোনওরূপ অলঙ্ঘ্য বিধি-বাঁধন মানিয়া চলিতে পারেনা। সে আপনার বিধি আপনি গড়িয়া তোলে, আপনার বাঁধন আপনি ছিঁড়িয়া ফেলে। ইহা জীবনেরই ধর্ম্ম।

জীবন্তভাষা কতকটা জীবন্ত মানুষেরই মতন। জীবন্ত মানুষকে

সর্ব্বদাই আপনার চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি করিয়া চলিতে হয়, না চলিলে তার জীবন-রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রত্যেক জীবকে এই যে তার চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সর্ব্বদা মিশ খাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হয়, এই চেষ্টাকেই আধুনিক জীব-বিজ্ঞান জীবন-সংগ্রাম বা ইংরাজিতে struggle for existence বলে। সকল জীবকেই যেমন আপনার জীবন-রক্ষার জন্য আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধন করিতে যাইয়া, নিজেকে তাদের প্রয়োজন অনুরোধে কতকটা বদলাইয়া লইতে হয়, জীবন্ত ভাষাকেও সেইরূপ না করিলে চলেনা। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নূতন নূতন শব্দের, নূতন নূতন ভাবের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন রসের উপাদানের, নূতন নূতন সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিচার যুক্তির, আর এই সকল বিচার যুক্তির প্রয়োজনে নূতন নূতন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি হইবেই হইবে। এই নূতন সৃষ্টি প্রবাহের দ্বারা সাহিত্যের ধরণধারণের বা এবারতেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এক যুগের এবারত বা style এই কারণেই অন্য যুগের এবারত হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। মহারাণী-এলিজাবেথের সময়ে যে ইংরাজি এবারত ছিল, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সমকালে তাহার ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটে। আবার ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংরাজ লেখকেরা যে ধরণের ইংরাজি লিখিতেন, এই অল্প দিনের মধ্যেই তাহা বদলাইয়া গিয়া, আজিকালিকার ইংরাজি সাহিত্যে একটা নূতন এবারতের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতেই রামমোহন রায়ের এবারতে আর বিদ্যাসাগরের এবারতে, বিদ্যাসাগরের এবারতে আর বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের এবারতে এবং তার পরে রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালা গদ্য এবারতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ সকলের মধ্যে কত প্রভেদ দেখিতে পাই। কোনও জাতির মানস ও সমাজ-জীবনে

নূতন সৃষ্টিপ্রবাহ যতদিন অপ্রতিহত থাকে, জ্ঞানের ধারা যতদিন না বন্ধ হইয়া যায়, অভিনব অভিজ্ঞতা লাভের পথ যতদিন না রুদ্ধ হইয়া পড়ে, ততদিন প্রত্যেক জীবন্ত জাতির জীবন্ত ভাষাতে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবেই ঘটিবে। এ সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। এ সকল অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তনকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াও কোনও ফল নাই। তবে পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যে একটা নিত্যত্ব আছে, সকল পরিবর্ত্তনই যে ভাল ও ইষ্টকর নয়, এই সকলের যে ইষ্টানিষ্ট, উৎকর্ষাপকর্ষ, আবশ্যক-অনাবশ্যক, ভিতরের প্রেরণার ও বাহিরের আক্রমণের, স্বাধীনতার ও স্বেচ্ছাচারের ভেদাভেদ আছে,—এই কথাটাও ভুলিয়া গেলে চলিবেনা। যার হাতে কলম, দোয়াতে কালী ও ঘরে পয়সা আছে, জীবন্ত ভাষা বলিয়া এই জীবনের অজুহাতে সে-ই যে বাঙ্গালা ভাষাটাতে যা' তা' পরিবর্ত্তন চালাইয়া দিবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে, ইহার প্রশ্রয় দিলে চলিবেনা। জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ স্বাধীনতাকেই বরণ করিতে হইবে, স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা স্ব-বস্তু আছে, প্রত্যেক ভাষারও সেইরূপ একটা স্ব-বস্তু আছে। আমাদের বিশিষ্ট প্রকৃতিকেই আমরা আমাদের এই "স্ব" বলিয়া থাকি। এই "স্ব" আমাদের নিজস্ব বস্তু, ইহাতেই আমাদিগকে জগতের অপর সকল জীব ও সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। রাম যে শ্যাম নহে, তার এই "স্ব"ই তার প্রমাণ। এই যে "স্ব" বস্তু—তার অধীনতাই স্বাধীনতা। স্বেচ্ছা বস্তু এই "স্ব"এর ইচ্ছা, তার একটা ক্ষণিক চাঞ্চল্য মাত্র, এই সকল ইচ্ছা জাগে আর যায়, এই ইচ্ছার সঙ্গে "স্ব"এর কোনও নিত্য সম্বন্ধ নাই। শত শত পরস্পর বিরোধী ইচ্ছা বা বাসনা আমাদের মনে জাগে। আর যখন যে বাসনা এরূপভাবে প্রাণে জাগিয়া উঠে, আমরা যদি তখনই নিজেদেরে তার

হাতে সমর্পণ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবনে কোনও প্রকারের স্থৈর্য্যলাভ ও শক্তিসাধন অসাধ্য হইয়া উঠে। জীবনের খেই রাখাই সে অবস্থায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্যই স্বেচ্ছাচার আর স্বাধীনতা এক কথা নহে। জীবনের মৌলিক একত্বের বা নিজত্বের বা ব্যক্তিত্বের বা বৈশিষ্টের অনুগত হইয়া, আপনার সম্পূর্ণ সার্থকতা অন্বেষণ করাই স্বাধীনতা; আর ক্ষণিক বাহ্যপ্রেরণাধীন বাসনার বশ্যতা স্বীকার করিয়া কখনও এদিকে কখনও ওদিকে ছিন্নাভ্রের মতন ভাসিয়া বেড়ানই স্বেচ্ছাচারিতা। স্বাধীনতা যেমন জীবনকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করে, এই স্বেচ্ছাচারিতা সেইরূপ তাহার সকল অর্থকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

আমাদের প্রত্যেকের যেমন একটা স্ব-বস্তু আছে, যাহার উপরে আমাদের জীবনের একত্ব প্রতিষ্ঠিত, যাহা আমাদের নিজস্ব ও সর্ব্বস্ব, যাহার দরুণে আমরা জগতের অপর সকল লোক হইতে পৃথক হইয়া আছি, সেইরূপ প্রত্যেক ভাষারও একটা "স্ব-বস্তু" আছে, এই বস্তুই তার নিজস্ব ও সর্ব্বস্ব। এই 'স্ব'এর উপরেই ভাষার সকল প্রকারের পরিবর্ত্তন ফুটিয়া উঠে। যেমন মানুষের মধ্যে নিত্যই অশেষবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, অথচ এই সকল পরিবর্ত্তনে তাহাদের একত্ব বা নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব একটুও নষ্ট হয় না, সেইরূপ প্রত্যেক জীবন্ত ভাষাতেও প্রতিদিনই বহুবিধ পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তনে তার নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্টকে ফুটাইয়াই তুলে, কদাপি নষ্ট করে না। এই যে ভাষার স্ব-বস্তু, তাহার অধীনতাই সাহিত্যিকের সত্য স্বাধীনতা। সাহিত্যিক যতক্ষণ ভাষার এই স্ব-বস্তুর অধীনে থাকেন, অর্থাৎ যতক্ষণ তিনি যে ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাহার মূল, নিজস্ব, বিশিষ্ট প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলেন, ততক্ষণ তিনি যত ইচ্ছা পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করুন না কেন, তাহার অন্য দোষগুণ যাহাই থাকুক না, তাহাকে কখনও স্বেচ্ছাচারিতা বলা যাইবে না। কিন্তু এসকল পরিবর্ত্তন ঘটাইতে যাইয়া যখন তিনি

ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত উলট-পালট করিয়া দিতে চেষ্টা করেন, তখনই তাঁর এ চেষ্টাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলিতে হইবে।

জীবন্ত ভাষার অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহা জীবনেরই লক্ষণ। ইহাতে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন বলিলেই যে তার মূলে একটা নিত্যত্ব আছে, ইহা বুঝায়,—এই গোড়ার কথাটাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। যেখানে কিছু নিত্য নাই, সেখানে পরিবর্ত্তন হয় না। খোল ও নাড়িচা সবই যদি বদলাইয়া যায়, তাকে পরিবর্ত্তন বলে না। যেখানে কিছু অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় থাকে না, সেখানে আমরা কোনও পরিবর্ত্তনের কল্পনাও করিতে পারি না। রামের জ্বর হইয়াছে, যদু ঔষধ খাইতেছে, শ্যাম আরোগ্য লাভ করিয়াছে, মাধব স্নান-আহার করিয়া আফিসে গেল। এইগুলিকে পরিবর্ত্তন বলে কি? অথচ যে রামের জ্বর হইয়াছে, সেই রামই ঔষধ খাইতেছে, সেই রামই আরোগ্য লাভ করিল, সে'ই স্নানাহার করিয়া আফিসে গেল—এখানে জ্বর হওয়া অবধি আফিসে যাওয়া পর্য্যন্ত যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও কর্ম্মের প্রকাশ হইল, তাহাকে পরিবর্ত্তন বলি। কারণ এখানে রামরূপ ব্যক্তিটী সকল অবস্থার ও সকল কর্ম্মের মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি জন্মিয়াছিলাম একদিন, আমি বালক ছিলাম, আমি যুবক ছিলাম, আমি প্রৌঢ় ছিলাম, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—জন্ম, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা পর পর ঘটিয়াছে বলিয়াই এগুলিকে পরিবর্ত্তন বলি না, কিন্তু এই "আমি" বস্তুটা এসকলের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান ছিল ও আছে বলিয়াই এগুলিকে পরিবর্ত্তন বলিতে পারি। সেইরূপ যুগে যুগে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে ও ঘটিতেছে, ইহা বলিলে বা মানিয়া লইলেই, এই ভাষার যে একটা নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপ আছে, ইহাও মানিতেই হইবে। ঐ নিত্য স্বরূপের উপরে, ঐ স্বরূপের আশ্রয়েই, ভাষার যাহা কিছু বিভিন্ন রূপ ফুটিয়া উঠে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষারও এরূপ একটা নিত্য স্ব-রূপ আছে। ঐ স্বরূপটাই তার প্রাণ। ঐটী গেলে তার সব গেল।

মনের ভাব ব্যক্ত করাই ভাষার ধর্ম্ম। আর এই ধর্ম্মের প্রেরণায় প্রত্যেক ভাষাই মনের অনুগমন করিয়া চলে। আমাদের মন যেরূপ প্রণালীতে চিন্তা করে, ভাষা সেই ছাঁচে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। আমাদের চিন্তার উপাদান তিনটী, এক জ্ঞাতা বা বিষয়ী, ইংরেজিতে ইহাকে সব্‌জেক্ট subject বলে; দ্বিতীয় জ্ঞেয় বা বিষয়, ইংরেজিতে ইহাকে অব্‌জেক্ট object বলে; আর তৃতীয় এই জ্ঞাতা বা বিষয়ীর সঙ্গে এই জ্ঞেয় বা বিষয়ের সম্বন্ধ, ইহাকেই ইংরেজিতে প্রেডিকেট্ predicate কহিয়া থাকে। মানুষ যখনই কোনও মনন করে, তখনই সে এই তিনটী বস্তুকে লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকে। এই সব্‌জেক্ট subject, অব্‌জেক্ট object, এবং প্রেডিকেট্ predicate'কে কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং ক্রিয়াও বলা হয়। জ্ঞানের সম্বন্ধে যে বিষয়ী, কর্ম্মের সম্পর্কে সেই কর্ত্তা। জ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বিষয়, কর্ম্মের সম্পর্কে তাহাই কর্ম্ম। আর জ্ঞানের দিক্ দিয়া যাহাকে বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ বলা যায়, কর্ম্মের দিক্ দিয়া তাহাকেই ক্রিয়া বলিতে হয়। মূলবস্তু এক হইলেও, জ্ঞানের বিশ্লেষণে তাহার এক নাম ও কর্ম্মের বিশ্লেষণে অন্য নাম ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ ও বস্তুতঃ যাহা বিষয়ী তাহাই কর্ত্তা, যাহা বিষয় তাহাই কর্ম্ম, যাহা বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ তাহাই ক্রিয়া। আর এই তিনটী তত্ত্বই আমাদের সকল প্রকারের চিন্তার বা মননের বা ধারণার বা জ্ঞানের মূল উপাদান। এগুলির কোনওটিকে ছাড়িয়া কোনও প্রকারের চিন্তন বা মনন বা জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। জ্ঞানের এই তিনটী মূল উপাদান সকল ভাষাতেই পাওয়া যায়; তবে কোনও ভাষাতে বা কর্ত্তার, কোনও ভাষাতে বা কর্ম্মের, আর কচিৎ কোনও কোনও অপেক্ষাকৃত অপরিণত ও বর্ব্বর জাতির ভাষায় বা ক্রিয়ারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ত্তা, কর্ম্ম, ও ক্রিয়াপদ এই তিনটীর কোথায় কিরূপ সমাবেশ হয়, তাহার দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতিটা যে কি, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের

সংস্কৃত ভাষায় কর্তৃপদেরই প্রাধান্য বেশী। প্রত্যেক বাক্যের সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের আসনটা আমরা কর্ত্তাকেই দিয়া থাকি। তারপরে কর্ম্ম-পদকে বসাই এবং সকলের শেষে ক্রিয়াপদের স্থান করিয়া দেই। বাংলা প্রভৃতি দেশজ ভাষাও এবিষয়ে সংস্কৃতেরই অনুকরণ করে। এই যে কর্তৃপদ, কর্ম্মপদ, ও ক্রিয়াপদের পরপর সমাবেশ ইহার দ্বারাই সংস্কৃত ভাষার মূলগঠন ও প্রকৃতিটি বুঝিতে পারা যায়। এটি কেবল আমাদের জাতির ভাষার প্রকৃতি নহে, আমাদের জাতীয় চিন্তারও প্রকৃতি এবং গঠন ইহাই। ফলতঃ ভাষার প্রকৃতি ঐ চিন্তার প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। যে যেমন ভাবে চিন্তা করে, তার ভাষাও সেইরূপ ভাবেই প্রকাশিত হয়। যার চিন্তাতে বিষয়ী বা কর্ত্তা সকলের আগে আসে, তার ভাষাতেও কর্তৃপদ আপনা হই-তেই সকলের আগে বসিবে। আমরা কর্ম্মের আগে কর্ত্তার কথাই ভাবি, আর সকলের শেষে ক্রিয়াকে লক্ষ্য করি। রাম ভাত খাইতেছে—আমরা এই ভাবেই পদযোজনা করিয়া থাকি। এটি আমাদের জাতির চিন্তার ধাত। এখন যদি আমরা বলিতে বা লিখিতে আরম্ভ করি—ভাত রাম খাইতেছে, কিম্বা খাইতেছে ভাত রাম, কিম্বা রাম খাইতেছে ভাত,—রামের আহার ব্যাপারটা সকল বাক্যেই সমানরূপে প্রকাশ পাইবে বটে, কিন্তু আমাদের মনের গতির ধরণটা ঠিক সমান আছে বলিয়া প্রমাণ হইবে না। আমরা যে কর্তৃপদকে সকলের আগে বসাই, ইহার অর্থ এই যে, আমরা অতি প্রাচীনতম কাল হইতে, যে যুগের খবর কেবল লিখিত ইতিহাস নহে, কিন্তু খোদিত প্রস্তরফলক বা তাম্রলিপি প্রভৃতিও কিছুই জানে না, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে, আমরা যে জাতিতে জন্মিয়াছি ও উত্তরাধিকারীসূত্রে যাঁদের ভাষা ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ভোগ করিতেছি, তাঁদের চক্ষে চিরদিনই বিষয় অপেক্ষা বিষয়ী বড় ছিলেন। অহংটাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল, ইদংটা উপলক্ষ্য মাত্র ছিল। তাঁরা চিরদিনই কর্ত্তাকে কর্ম্ম অপেক্ষা ও

কর্ম্মকে ক্রিয়া অপেক্ষা বড় বলিয়া ভাবিতেন। কর্ত্তাটা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী-বস্তু, কর্ম্মটা কর্ত্তার তুলনায় ক্ষণস্থায়ী হইলেও, ক্রিয়ার শেষেও তার অস্তিত্ব থাকে বলিয়া, ক্রিয়া অপেক্ষা বেশী স্থায়ী। রাম বিষয়ী, এই রামের অগণ্য ভোগ্যবস্তুর বা বিষয়ের মধ্যে ভাত একটা বিশিষ্ট বিষয় মাত্র, সুতরাং এখানে ইহা রামের চাইতে ছোট। রামের জন্যই আমাদের চোখ ভাতের উপরে পড়িয়াছে। রাম ভাত না খাইয়া যদি ডা'ল খাইত বা শাক খাইত, বা দই বা মাখন খাইত, তাহা হইলে এই ভাতের দিকে আমরা এ সময়ে চোখ তুলিয়া চাহিতাম না। এইজন্য রামই এখানে মুখ্যবস্তু, ভাত গৌণ। আর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী, সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ব্যাপার এখানে খাওয়াটা। রামের খাওয়া শেষ হইলেও ভাতও থাকিতে পারে, রামও থাকিবে; ভাত তখন অপরের জন্য থাকিবে, রাম তখন অন্য কাজ করিবে, কিন্তু খাওয়ারূপ কার্য্যের আর অস্তিত্ব রহিবে না। এইজন্য ক্রিয়াটা সকলের ছোট, সর্ব্বাপেক্ষা হেয়; আর এই কারণেই কর্তৃপদ ও কর্ম্মপদ উভয়ের পরে ক্রিয়াপদের সন্নিবেশ হইয়া থাকে। এটি আমাদের ভাষাতেই হয়। প্রাচীন সংস্কৃতে ও আধুনিক দেশজ ভাষাতে হয়। অন্য দেশের ভাষায় হয় না। এই যে ভাষার গঠন বা প্রকৃতি ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। ইহার সঙ্গে আমাদের জাতির চিন্তার মূলপ্রকৃতির ও প্রণালীর অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এটি আমাদের জাতির চিন্তার, আমাদের জাতির সাধনার ও সভ্যতার, আমাদের দর্শনের ও ধর্ম্মের নিজস্ব সহি-মোহর। ইহা আমাদের জাতীয়তার মার্কা। এটি ক্ষইয়া গেলে বা মুছিয়া ফেলিলে, ভারতের ভারতত্ব, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মূলগত বৈশিষ্টটুকু—নষ্ট হইয়া যাইবে।

ইংরাজি ভাষার প্রকৃতি একটু ভিন্ন। আমরা যেমন কর্ত্তাকে সকলের আগে বসাই, ইংরাজেরাও তাই করেন। কিন্তু আমরা যেখানে বলি "রাম ভাত খাইতেছে", সেখানে তাঁরা বলেন "রাম খাই-

তেছে ভাত।" বাঙ্গালা ভাষায় কর্তৃপদের পরে কর্ম্মপদ ও সকলের শেষে ক্রিয়াপদ বসে। ইংরাজিতে কর্তৃপদের পরে ক্রিয়াপদ আর সকলের পরে কর্ম্মপদ বসে। রামের ভাত খাওয়ার ব্যাপারটা ইংরাজিতে Ram is eating rice—রাম খাইতেছে ভাত,—এই ভাবেই ব্যক্ত হইবে। Ram rice is eatting ইংরাজি নয়, বাঙ্গালা। সেইরূপ "রাম খাচ্ছে ভাত," বাঙ্গালা নয়, ইংরাজি। এরূপ ভাবে কথাগুলি উলট্‌পালট্ করিয়া ব্যবহার করাতে একটা বাহাদুরী আছে। কোনও কোনও স্থলে যে ব্যভিচারও বাহাদুরী বলিয়া গণ্য হয়, ইহাই বা কে না জানে?

ইংরাজিতে যে কর্তৃপদের পরে ক্রিয়াপদ বসে, ইহার অর্থই এই যে অতি প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে, ইংরাজ জাতির চিন্তাটা এমনি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে তারা ক্রিয়াটাকেই কর্ম্মের চাইতে বড় মনে করে। কর্ত্তা যে সকলের চাইতে বড়, তাহা তাঁর ক্রিয়ারই জোরে। ক্রিয়া ভিন্ন কর্ত্তা লোপ পাইয়া যায়। কর্ম্মটা ক্রিয়ার অধীন। যতক্ষণ খাই, ততক্ষণই ভাতের দাম আছে; খাওয়া শেষ হইলে ভাতের আর অব্যবহিত প্রয়োজন থাকে না। প্রয়োজন যার নাই, মূল্যই তার আছে কি? তখন ভাতের যা মূল্য থাকে, তাহা ভবিষ্যতের খাওয়ারই বা ক্রিয়ারই জন্য। সুতরাং ইংরাজেরা ক্রিয়াটাকেই—প্রেডিকেট্‌কেই—কর্ম্ম বা অবজেক্ট অপেক্ষা আগে দেখে ও বড় ভাবে। ক্রিয়াই কর্ম্মকে পূর্ণ করে ও কর্ত্তাকে সার্থক করে। ক্রিয়ার বা কর্ম্মের বিরাম যেমন নাই, তেমনি কোনও নিত্যত্বও নাই। কিন্তু কর্ত্তার একটা নিত্যত্ব আছে। এই জন্য কর্ত্তা সকলের বড়। তার পরে ক্রিয়া; কারণ, ক্রিয়ার দ্বারাই তাঁর কর্তৃত্বের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা হয়। কর্ম্ম ক্রিয়ার অধীন, ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন বা সৃষ্ট হয়। সুতরাং কর্ম্ম সকলের পরে। এইভাবে ইংরাজি ভাষার মূলপ্রকৃতি ও গঠনের তত্ত্বান্বেষণে গেলে, ইংরাজি ব্যাকরণের ভিতরেই ইংরাজের জাতীয় দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যার পরিচয় পাই।

ইংরাজ কর্ম্মী, সুতরাং ক্রিয়াটা তার চক্ষে অতি বড় বস্তু। ইংরাজের দেবতা Providence, জগতের তিনি স্রষ্টা, জীবের তিনি পাতা, মানুষের তিনি ত্রাতা, বিশ্বের বিশাল কর্ম্মযন্ত্রের তিনি নিয়ন্তা। এই সকলই তাঁর নিয়ত-ক্রিয়াশীলতার লক্ষণ। কিন্তু আমাদের ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়। সত্তাই তাঁর সকল সত্য। অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া বিশ্ব সৃজন করে। ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা বলা যায় না। তিনি জীবের পাতাও নহেন, সে কার্য্য বিষ্ণু করেন। তিনি জীবের মুক্তিদাতাও নহেন, কারণ মুক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু, কোনও ক্রিয়ার ফলে তার উদ্ভব হয় না। যাহা নিত্য তারই উপরে আমাদের মনের ঝোঁক, যাহা ক্রিয়াজন্য ও পরিণামী তার উপরে নহে। এই জন্য আমরা প্রথমে কর্ত্তাকে দেখি, তার পরে কর্ত্তার কর্ম্মকে দেখি, সকলের শেষ, অতি চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী যে ক্রিয়া তাহাকে দেখিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের ভাষায় যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ও ক্রিয়ার পর পর সমাবেশ হয় ইহা একটা অর্থহীন ব্যাপার বা নিতান্ত অবান্তর কথা নহে। ইহার সঙ্গে আমাদের জাতির মূল ধাতের সম্বন্ধ আছে। এখানে ভাষার উলট্‌পালট্ করিবার খেয়ালটা কেবল ভাষাতে নয়, জাতির মূল প্রকৃতির ভিতরে একটা সাংঘাতিক বিপ্লব আনিবার চেষ্টা করে।

কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, এই পর্য্যায়টা বাঙ্গালা ভাষার সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সঙ্গত কারণ উপস্থিত হইলে সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। এই পর্য্যায় সংস্কৃতেরও সাধারণ নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া "অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরুঃ"—বিষ্ণুশর্ম্মার এই নিয়মভঙ্গটাকে কেহই ব্যভিচার বলিবে না। ভাষাটা যে হামেষাই দর্শনের অনুশাসন মানিয়া চলিবে, শ্রবণের কোনও অনুরোধ শুনিবে না, এমনও কোনও কথা নাই। দর্শনটা ভাষার কাঠাম, শ্রবণটা তার রক্তমাংস না হউক, অন্ততঃ অঙ্গকান্তি ত বটেই। দর্শন সর্ব্বদাই বলে—কর্ত্তাই সকলের বড়, তাহাকেই আগে বসাও। কিন্তু শ্রবণ

কখনও সেই কর্ত্তাকেই সাজাইবার জন্য বলিতে পারে, ক্রিয়া সকলের ছোট হইলেও তাহাকেই এখানে আগে বসাইলে দেখাবে বা শুনাবে ভাল। তখন ঐরূপ করাতে কোনও ব্যভিচার-দোষ হয় না। আর ক্রিয়াতে ক্রিয়াতেও বেশকম আছে। সংস্কৃতে ভূ ধাতু সকল ধাতুর বড়। কর্ত্তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ট। কর্ত্তা অসংখ্য কর্ম্ম করেন, কিন্তু ভূ ধাতু যে ক্রিয়াকে নির্দ্দেশ করে, সে ক্রিয়াটা তাঁর নিত্যক্রিয়া; ঐটির উপরে তাঁর অপর সকল কার্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্য "অস্তি", ক্রিয়াপদ হইয়াও, যতটা জোর করিয়া বাক্যের সকলপদের প্রথমে যাইয়া বসিতে পারে, অপর ক্রিয়াপদে সর্ব্বদা তাহা পারে না। যেখানে ক্রিয়ার উপরেই জোর দিতে চাই, কর্ত্তা বা কর্ম্মের উপরে নহে,—ক্রিয়াটাই যেখানে আমাদের চিন্তার বা মননের বা জ্ঞানের মুখ্যবস্তু, সেখানে ক্রিয়া ত বাক্যের প্রথমে আপনি আসিয়া বসিবেই। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—এখানে শুনানটাই মূল কথা, সুতরাং "শৃণ্বন্তু" বলিয়া বাক্যের সূচনা হওয়াই সত্য ও স্বাভাবিক। বাঙ্গালাতেও "যাচ্ছে কেমন", "খাচ্ছে কেমন", "গাচ্ছে কেমন", এ সকল অতি শিষ্ট-প্রয়োগ। যাওয়া, খাওয়া, গাওয়া, প্রভৃতি ক্রিয়ার উপরেই বক্তার মনের ঝোঁক রহিয়াছে, আর মনের ঝোঁক যার উপরে, ভাষাতে সেই সকলের আগে আসিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সচরাচর সহজ অবস্থায় আমাদের মনের ঝোঁকটা কর্ত্তার উপরেই পড়ে, ক্রিয়ার উপরে পড়ে না বলিয়া, ভাষার সাধারণ নিয়ম এই যে কর্ত্তৃপদই বাক্যের সকলের আগে বসিবে। যেখানে কর্ম্ম বা ক্রিয়াপদ প্রথমে বসে সেখানে কোনও বিশেষ কারণে বক্তা বা লেখকের দৃষ্টি কর্ত্তার উপরে আগে না পড়িয়া কর্ম্ম বা ক্রিয়ার উপরে পড়িয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। আর এই বিশেষ কারণটা সঙ্গত এবং যথেষ্ট কি না, তারই উপরে এরূপ প্রয়োগ শিষ্ট-প্রয়োগ না অপপ্রয়োগ, ইহা নির্ভর করিবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

"ডালিম"

তখন আমার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমোদ প্রমোদ ছাড়ি নাই। ছাড়িও নাই, ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোন কালেই মানুষ বড় ভাল ছিলাম না। সংসারের আমোদ আহ্লাদের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণের যোগ ছিল; আমার মনে হইত কখনও সেই যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা এক-রজনীর উৎসবের মত কাটাইয়া দিয়াছি। কখন আরম্ভ হইল কখন শেষ হইল বুঝিতেও পারিলাম না। কোনও সুখ হইতে আপনাকে কখনও বঞ্চিত করি নাই, আর তার জন্য কোনও আপশোষও হয় নাই। প্রাণের মাঝে যে একটা মুক্ত আকাশ, একটা গভীর পাতাল—আছে তাহা তখন বুঝিতাম না। জীবনটা সর্ব্বদাই এক বিশাল সমতল ভূমির মত মনে হইত, জীবনের রাজপথে ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে আর হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইতাম। কখনও পায় কাঁটার আঁচড় লাগে নাই। কখনও প্রাণে দাগ বসে নাই। সমস্ত আমোদ প্রমোদের মধ্যে বিনা চেষ্টায় সহজেই প্রাণটাকে আস্ত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ প্রায় বুড়া হইতে চলিলাম, আজ তার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন অন্ধকার হইয়াছে। সে কতদিনকার কথা। তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। কত খুঁজিয়াছি—কোথাও পাইলাম না। সে যে অদৃশ্যভাবে আমার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—ধরা দেয় না। তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই, তাহাকে দেখিতে পাই না। চোখ বুজিলে তাহাকে বুকের ভিতর পাই, চোখ মেলিলে কোথায় মিলাইয়া যায়। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুঝি খুজিতে খুঁজিতেই কাটিয়া যাইবে। তাহাকে পাইব না? আমি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

তাহার নাম জানি না, সকলে তাহাকে "ডালিম" বলিয়া ডাকিত।

সে দেখিতে সুন্দর কি কুৎসিত আমি এখনও বলিতে পারি না। কিন্তু তার মুখখানি এখন পর্য্যন্ত আমার প্রাণে প্রদীপের মত জ্বলিতেছে! মাথায় অন্ধকারের মত এক রাশ চুল, মুখে একটা গভীর পাগল-করা ভাব, আর তার চোখ দুটী?—চাহিবামাত্র আমার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত অনেক রমণীর সঙ্গে মিশিয়াছি, আমোদ প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু এমন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, চোখে এমন গদ্‌গদ্ করুণভাব আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয় আর কখনও দেখিবও না।

সেদিন সন্ধ্যাকালে কয়জন বন্ধু লইয়া বাগানে আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্ণ বাবুর বাগান চাহিলেই পাওয়া যাইত, আমরা চাহিয়া লইয়াছিলাম। বাগানটী খুব বড়, ফটক হইতে সরু একটা রাস্তা ধরিয়া অনেক দূর গেলে বাড়ীটা পাওয়া যায়। বাড়ীর সাম্‌নেই একটা ঘাট-বাঁধন পুকুর। ঘাটের ঠিক উপরেই সান-বাঁধান লতামণ্ডপ। সেই সরু রাস্তা ধরিয়া, সেই লতামণ্ডপের ভিতর দিয়া, বাড়ীর ভিতরে যাইতে হয়। সেদিন বন্দোবস্তের কোন অভাব ছিল না। নানা রকমের প্রচুর সুরা, নানা রকমের খাবার, আলোয় আলোয় প্রমোদ-মন্দির দিনের মত জ্বলিতেছিল।

আমার পৌঁছিতে একটু দেরী হইয়াছিল। ফটকে নামিয়াই সেই সরু রাস্তা। চাঁদের আলো খুব ক্ষীণ হইয়া ছায়ার মত সব ঢাকিয়াছিল। নানা ফুলের গন্ধে, সেই ম্লানছায়ালোকে, লতাপল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে সেই সরু রাস্তাটীকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে কি হইতেছিল আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক পদধ্বনিতে কে যেন আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল। সে রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি, সেই বাগানে অনেক প্রমোদ-রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদাই হাল্‌কা মনে ফূর্‌তি করিতে গিয়াছি। সেদিন আমার প্রাণে কোথা হইতে একটা ভার চাপিয়াছিল। সে যে কেমন ভার আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে সেই বাড়ীতে ঢুকিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে, গান হইতেছে, শুনিলাম। পরিচিত গায়িকা গাইতেছে—"চমকি চমকি যাও"। ঘুঙুরের শব্দ শুনিলাম। নৃত্যগীতে আমার মন নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সেদিন কি জানি কিসের ভারে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তখনও নাচ হইতেছে। সেই গায়িকা হাত ঘুরাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে "চমকি চমকি যাও"! আমাকে দেখিয়াই আমার বন্ধুরা সব চেঁচাইয়া উঠিল—"কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ, দাদা আগিয়া"। একজন বলিল, "দাদা এই লাও একপাত্র চড়াও, আনন্দ কর"। আর একজন গান ধরিল "এত গুণের বঁধু হে"। আমার এক বন্ধু উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল—"কাঁটা বনে তুল্‌তে গিয়ে কলঙ্কেরি ফুল! ওগো সই কলঙ্কেরি ফুল!" আর একজন উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিল "দেখ্‌লে তারে আপন হারা হই"। আমার আর একজন বন্ধু একটা গেলাসে মদ ঢালিয়া আমার হাতে দিয়া গাহিলেন "দাদা হেসে নাও দুদিন বইত নয়, কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়!" সবার হাতে মদের গেলাস, মদের গন্ধ, ফুলের সৌরভ, সিগারেটের ধুঁয়া, গানের ধ্বনি, শারঙ্গের সুর, ঘুঙুরের শব্দ, তব্‌লার চাঁটি। কিন্তু আমি যেন একটা অপরিচিত লোকে আসিয়া পৌঁছিলাম। অনেক বার এই প্রমোদে মন ভাসাইয়া আনন্দ করিয়াছি। সেদিন কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল এ সবই আমার নূতন, অপরিচিত। আমাকে জোর করিয়া এই নূতন অপরিচিত লোকে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল—বিডন ষ্ট্রীটের সুশীলা, হাতি বাগানের সুরী, পুঁতুল কিরণ, বেড়াল হরি, এই রকম অনেক;—কিন্তু সে দিন যেন হঠাৎ মনে হইতে লাগিল ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না।

ইহাদের একটু তফাতে, এক কোণে বসিয়াছিল, "ডালিম"। এক-জন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও মেয়েটাকে আগে কখনও দেখি নাই। সে বলিল "বাস্ ওকে জান না? ও যে ডালিম, সহর মাত্ করেছে, অনেক কাপ্তেন ভাসিয়েছে"। আমি বলিলাম "কাপ্তেন ভাসানর মত চেহারা ত ওর নয়। ও যে এক কোণে সরে বসে আছে।" বন্ধু বলিল "ওই ত ওর ঢং, ও অমনি করে' লোক ধরে"। আমার মন তাহা মানিতে চাহিল না। আমি কিছু না বলিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সেও আমায় দেখিতেছিল। বহুবার চোখে চোখে মিলিয়া গেল। আমি কি দেখিলাম—তাহার চাহনীতে কি ছিল—আমি কেমন করিয়া বলিব—আমি যে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে হইল সেই অমোদ-প্রমোদের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ নাই। তার চোখ দুটী যেন আর কিসের খোঁজ করিতেছে। আমার প্রাণে কি হইতেছিল, তাহা ত বুঝাইয়া বলিতে পারি না। আমার ভিতর থেকে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল উহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লই।

এমন সময় কে বলিল "ডালিম, একটা গাও"। আর একজন বলিল "ডালিম ভাল গাইতে পারে না"। আমি তাহার দিকে চাহি-লাম। সে বুঝিল, বলিল—"আমি ভাল গাইতে পারি না"। আমি বলিলাম "গাও না"? সে একটু সরিয়া আমার সাম্নে আসিয়া গান ধরিল। আমি সে রকম গান কখনও শুনি নাই। সেগানে সুরের কেরামতি ছিল না, তালের বাহাদুরী ছিল না; কিন্তু সেগানে যাহা ছিল, তাহা আর কখনও কোন গানে পাই নাই। মনে হইল ওই গানের জন্যই আমার সমস্ত মনটা অপেক্ষা করিয়াছিল। চোখের জলে ভেজা ভেজা সেই সুর, সুরের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন নয়নপল্লবে অশ্রুবিন্দুর মত জ্বলিতেছিল। সেই সুরের প্রত্যেক স্বর, সেই গানের প্রত্যেক কথা আজও আমার প্রাণপল্লবে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মতই জ্বলিতেছে। ডালিম গাহিতেছিল :—

"কেমন করে মনেরা কথ কইব কাণে কাণে।
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে।
আজি আমি ঝরা ফুল, পড়ি তোমার পায়,
গন্ধ টুকু রেখে বঁধু হিয়ার হিয়ায়!
প্রাণের পাতে ফুলের মত
রাখব তোমায় অবিরত
তফাত্ থেকে দেখ্‌ব শুধু, রাখ্‌ব প্রাণে প্রাণে;
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে, কাহার কঠিন টানে॥"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কখনও গান শিখেছিলে? সে বলিল "না, ওস্তাদের কাছে কখনও শিখি নাই।" আমি বলি-লাম—আমি এমন গান কখনও শুনি নাই। তুমি কোথায় থাক? সে কোন কথা বলিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—এই গানটী আমাকে একলা একদিন শুনাইবে? সে কোন উত্তর দিল না। আমি বলিলাম—এসব তোমার ভাল লাগে? তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, কোন কথা বলিল না।

আমার বন্ধুদের তখন প্রায় সকলেরই মত্ত অবস্থা। একজন উঠিয়া টলিতে টলিতে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিগুলি সব নিবাইয়া দিল।

আমি সেই অন্ধকারে ডালিমকে বুকে টানিয়া লইলাম। সে কিছু বলিল না। তার পর,—তার হাত ধরিয়া উঠাইলাম। আমিও দাঁড়াইলাম। তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম—আমার সঙ্গে চল। সে আমার হাত ধরিল, আমার সঙ্গে চলিল।

কোথায় যাইব মনে মনে কিছুই ঠিক করি নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিলাম। তার পর একটা ঘরের ভিতর দিয়া সেই লতামণ্ডপে গেলাম। তখন চাঁদের আলো আরও ম্লান মনে হইতেছিল। পুকু-রের উপর একটু উজ্জ্বল ছায়া মাত্র পড়িয়াছে। বাতাস বন্ধ। ফুলের গন্ধ থামিয়া গিয়াছে। মনে হইল আকাশে যেন একটু মেঘ উঠি-

য়াছে। সেই উজ্জ্বল অন্ধকারে একখানা বেঞ্চির উপর তাহাকে বসাইলাম। আমার সর্ব্ব শরীর তখন অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের ভিতর ধপ্ ধপ্ করিতেছিল। আমিও তাহার পাশে বসিলাম। আমি তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলিলাম—ডালিম, আমার তোমাকে বড় ভাল লাগে। আমার ত এমন কখনও হয় নাই। সে বলিল—"ও কথা ত সবাই বলে, মনে করিয়াছিলাম তুমি ওকথা বলিবে না।" আমি বলিলাম—তুমি ত আমাকে চেন না। তাহার একখানি হাত আমার বুকের উপর দিলাম। সে বলিল,—"তোমার কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম—"জানি না। ইচ্ছা হয় তোমাকে লইয়া কোথাও পালাইয়া যাই। এত দিনের জীবনযাপন সবই মিথ্যা মনে হইতেছে"। সে আরও একটু আমার কাছে সরিয়া আসিল। আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমারও চোখে জল আসিয়াছিল, কোন কথা বলিতে পারি নাই। সে যতই কাঁদিতে লাগিল, ততই তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিলাম। মনে হইল ইহাকে কোথায় রাখি, কেমন করিয়া শান্ত করি। এক নিমেষে আমার সংসারের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। নিশীথের স্বপ্ন যেমন প্রভাতে এক নিমেষে মিলাইয়া যায়, আমার জীবনের সকল স্মৃতি, সংসারের সকল বন্ধন, সকল ঘটনা এক মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল! একি সেই আমি? আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি, এই মাত্র এক নূতন জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে অবস্থা সুখের কি দুঃখের আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কেবল বুকে চাপিতে লাগিলাম। কথা বলিবার শক্তি ছিল না। মনে মনে বলিতে লাগিলাম—হে আমার ব্যথিত, পীড়িত! এস তোমার চোখের জল মুছাইয়া দি, তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দি, তুমি আর বাহিরে থাকিও না—আমার বুকের ভিতর ফুটিয়া উঠ। আমিও তোমাকে বুকে করিয়া জীবন সার্থক করি। কতক্ষণ পরে সে একটু শান্ত

হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে আসিব না। কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বলিল যাও, তাই আমি আসিলাম। তুমি আমার কথা শুনিতে চাও? আমি মনে করিয়াছিলাম বলিব না, কিন্তু কে যেন আমার প্রাণের ভিতর হইতে বলাইতেছে। শুনিবে?" আমি বলিলাম—শুনিব; শুনিবার জন্যই তোমাকে এখানে আড়াল করিয়া আনিয়াছি। সে তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই কণ্ঠস্বর আজও আমার প্রাণে জাগিয়া আছে। তাহার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে ব্যথার মত বাজিতে লাগিল,—আজও বাজিতেছে!

সে বলিল :—আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কুলীন, ব্রাহ্মণের মেয়ে, মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত। মামা নেশা করিতেন। দিবানিশি সুরামত্ত, তাহার কাছে থেকে কখন ভাল ব্যবহার পাই নাই। মামী আমাকে একটা বোঝা মনে করিত, তার মুখে কটূক্তি ছাড়া মিষ্টি কথা কখনও শুনি নাই। আমার মামাত ভাই আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার কাছে লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যখন বার বৎসর বয়স তখন তিনি মারা যান। তারপর চারি বৎসর পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাহা তোমার না শুনাই ভাল। আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তার পর চা'র বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে ছিলাম। এই চা'র বৎসরের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে বোধ হয় ছয় সাত দিনের বেশী দেখা হয় নাই। তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। কখন কখন দুএক দিনের জন্য বাড়ী আসিতেন। বাড়ীতে আসিলেও বাহির বাড়ীতেই থাকিতেন। আমার সঙ্গে দুই এক বার দেখা হইয়াছিল, কখনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। তাঁহার আগে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, চা'র পাঁচটী ছেলে মেয়ে ছিল। আমার শাশুড়ী তাঁহার বিমাতা। আমার কথা

কহিবার কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখনও কখনও মারও খাইয়াছি। বাড়ীতে ঝি ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেজে পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া—রাঁধাবাড়া, ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়ার পর বাসনগুলি—বাড়ীর কাছে নদী, সেই নদীতে—মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে এই চা'র বৎসরের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাঙ্গালা বই ছিল, মাঝে মাঝে রাত্রে সবাই ঘুমাইলে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতাম। আমার শ্বাশুড়ীর তাহা সহিল না। একদিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমারও আর সহ্য হইল না। সেই দিনই মনে স্থির করিলাম এ বাড়ীতে আর থাকিব না। পাড়ার একটী ছেলে—আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম, আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম, চাঁদের আলো ছিল, বাতি লইয়া যাই নাই। দেখিলাম সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বাসনগুলি নদীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম—আমাকে মামার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পার? সে বলিল—কত দূর? আমি গ্রামের নাম বলিলাম। সে বলিল—নৌকায় যাইতে তিন চার ঘণ্টা লাগিবে। আমি বলিলাম—যতক্ষণই লাগে আমাকে লইয়া যাও। এই বলিয়া তাহার পায় আছড়াইয়া পড়িলাম। সে বলিল—আচ্ছা তুমি এইখানে বস', আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসি। সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় উঠিলাম। ভাবিলাম এইবার যমের বাড়ী ছাড়িয়া মামার বাড়ী যাইতেছি। যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম, সে ঠিক সেই রকম করিয়া আমার

দিকে চাহিয়াছিল, কোন কথা বলে নাই; শুধু চাহিয়াছিল, আমার মনে হইতেছিল তাহার চোখ দুটী যেন আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়াছিলাম।

যখন মামার বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম তখন বেশ রাত্রি, মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলেই শুইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর মামী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম আমি পালাইয়া আসিয়াছি, আমি সেখানে আর যাব না। "আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে রক্ষা কর, তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও"। মামী কর্কশস্বরে বলিলেন "পালিয়ে এসেছিস্—কার সঙ্গে?" আমি সে কথার অর্থ তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটীকে দেখাইয়া বলিলাম "এর সঙ্গে"। মামী বলিলেন—"এ কে?" আমি বলিলাম—"জানি না"। মামী বলিলেন, "আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হ'বে না"। আমি কোথায় যাব! মামী বলিলেন 'গোল্লায়', বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পাগলের মত সেই দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিল না। তখন সে আমার পিছনেই দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চলিল।

আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কোথা যাব? কোথা যাব? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মত সে যেদিকে লইয়া গেল সেদিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা যাইবে? সে বলিল 'কল্‌কাতায়,'। তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যুতের মত আমার মনে চম্‌কাইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া তাহার পায় পড়িলাম। কাঁদিয়া বলিলাম—আমাকে রক্ষা কর;

কহিবার কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখনও কখনও মারও খাইয়াছি। বাড়ীতে ঝি ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেজে পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া—রাঁধাবাড়া, ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়ার পর বাসনগুলি—বাড়ীর কাছে নদী, সেই নদীতে—মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে এই চা'র বৎসরের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাঙ্গালা বই ছিল, মাঝে মাঝে রাত্রে সবাই ঘুমাইলে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতাম। আমার শ্বাশুড়ীর তাহা সহিল না। একদিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমারও আর সহ্য হইল না। সেই দিনই মনে স্থির করিলাম এ বাড়ীতে আর থাকিব না। পাড়ার একটী ছেলে—আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম, আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম, চাঁদের আলো ছিল, বাতি লইয়া যাই নাই। দেখিলাম সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বাসনগুলি নদীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম—আমাকে মামার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পার? সে বলিল—কত দূর? আমি গ্রামের নাম বলিলাম। সে বলিল—নৌকায় যাইতে তিন চার ঘণ্টা লাগিবে। আমি বলিলাম—যতক্ষণই লাগে আমাকে লইয়া যাও। এই বলিয়া তাহার পায় আছড়াইয়া পড়িলাম। সে বলিল—আচ্ছা তুমি এইখানে বস', আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসি। সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় উঠিলাম। ভাবিলাম এইবার যমের বাড়ী ছাড়িয়া মামার বাড়ী যাইতেছি। যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম, সে ঠিক সেই রকম করিয়া আমার

দিকে চাহিয়াছিল, কোন কথা বলে নাই; শুধু চাহিয়াছিল, আমার মনে হইতেছিল তাহার চোখ দুটী যেন আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়াছিলাম।

যখন মামার বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম তখন বেশ রাত্রি, মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলেই শুইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর মামী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম আমি পালাইয়া আসিয়াছি, আমি সেখানে আর যাব না। "আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে রক্ষা কর, তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও"। মামী কর্কশস্বরে বলিলেন "পালিয়ে এসেছিস্—কার সঙ্গে?" আমি সে কথার অর্থ তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটীকে দেখাইয়া বলিলাম "এর সঙ্গে"। মামী বলিলেন—"এ কে?" আমি বলিলাম—"জানি না"। মামী বলিলেন, "আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হ'বে না"। আমি কোথায় যাব! মামী বলিলেন 'গোল্লায়', বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পাগলের মত সেই দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিল না। তখন সে আমার পিছনেই দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চলিল।

আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কোথা যাব? কোথা যাব? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মত সে যেদিকে লইয়া গেল সেদিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা যাইবে? সে বলিল 'কল্‌কাতায়,'। তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যুতের মত আমার মনে চম্‌কাইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া তাহার পায় পড়িলাম। কাঁদিয়া বলিলাম—আমাকে রক্ষা কর;

আবার আমাকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া চল। সে কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিল, তারপর বলিল "আচ্ছা"। কিন্তু ফের সেই চাহনি, আমি ভয়ে, অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলাম।

ভোর হইতে না হইতে নৌকা ঘাটে লাগিল। আমি দৌড়িয়া শ্বশুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। সে বাধা দিল না, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল, আমি কিছু না বলিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। আমার শাশুড়ী উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি চীৎকার করিয়া 'মা, মা' বলিয়া ডাকিলাম, আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না।

তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামীর কথা মনে পড়িল—"গোল্লায় যাও"। আমি ফিরিলাম, দেখিলাম সে দাঁড়াইয়া আছে, আর ঠিক তেম্নি করিয়া চাহিয়া আছে। আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম—"আমি গোল্লায় যাব, যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাও"।

তখন নিশ্চয়ই সূর্য্য উঠিয়াছে, কিন্তু আমার চোখে ঘোর অন্ধকার —মনে হইল যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোন অদৃশ্য বলিদান-মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তার পর ?

তার পর কলিকাতায় আসিলাম। শুনিলাম সে কোন জমিদারের ছেলে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া দু'জনে থাকিলাম। সাত দিন সে আমার গায় গায় লাগিয়াছিল। তাহার সেই চাহনির অর্থ সেই কয়দিনে বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম। আট দিনের দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তার পর ?

এখন আমি কল্‌কাতার ডালিম। আমার সুখের শেষ নাই। সহরের বড় বড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়।

আমার বাড়ীতে সাজ সজ্জার অভাব নাই, সোনার খাট, হীরার গহনা। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি, ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা, দাসদাসীর অন্ত নাই, আলমারি ভরা কাপড়, বাক্স ভরা টাকা।

"আমি কল্‌কাতার ডালিম, কিন্তু"—কিন্তু বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। দু'হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল। তখন জ্যোৎস্নার লেশ মাত্র নাই। সেই লতা-মণ্ডপ গাঢ় অন্ধকারে ভরা। তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। আমি সেই অন্ধকারে তার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। আর আমার অন্তরে এক অসীম বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—"কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছি, বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায় ?"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয় কাঁদিতেছিল। তার পর বলিল "তোমার আমাকে ভাল লাগিয়াছে ? তোমার মত আর কারও সঙ্গে আমার এ জীবনে কখনও দেখা হয় নাই। কেন তোমাকে আগে দেখিলাম না ? আমি যখন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে ? এখন—এখন তোমাকে ত কিছু দিবার নাই"।

এই বলিয়া সে আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল, শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল, আমি বলিলাম—আমি আর কিছু চাই না, আমি তোমাকেই চাই। এই বলিয়া দুইজনেই কাঁদিতে লাগিলাম। সেই অন্ধকারে তাহাকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাগলের মত জ্ঞানহারা হইয়া কাঁদিতেছিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না। আমি কি জাগিয়াছিলাম ? মনে হইতেছিল আমি ডালিমকে লইয়া এই সংসারের বাহিরে এক অপূর্ব্ব নন্দন-কাননে বাস করিতেছি। আমি আর ডালিম,—সে জগতে আর কেহ নাই! চিরদিন তাহাকেই বুকে করিয়া রাখিয়াছি। প্রতি প্রভাতে তাহাকে নব নব ফুলে সাজাইয়াছি, প্রতি নিশাশেষে তাহাকে নব নব চুম্বনে জাগাইয়া দিয়াছি।

প্রাণের যে একটা মুক্ত আকাশ আছে, আর একটা অতি গভীর পাতাল আছে, সেদিন প্রথম অনুভব করিলাম। আমার হৃদয়ের সেই স্বর্গ ও সেই পাতাল পূর্ণ করিয়াছিল ডালিম—ডালিম!

এমন সময় উপরে কোলাহল শুনিলাম, চমকিয়া দেখিলাম ডালিম আমার কাছে নাই! আমি অস্থির হইয়া গেলাম, পাগলের মত ছুটা-ছুটী করিতে লাগিলাম। দৌড়িয়া উপরে গেলাম, দেখিলাম সেখানে ডালিম নাই। আমাকে দেখিয়া একজন বলিল "কি বাবা, একেবারে উধাও"। আমি তাহাকে গালি দিলাম। আবার ছুটিয়া নীচে আসিলাম। সেই বাগানে সকল স্থানে খুঁজিলাম। ডালিম ডালিম বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। ফটকে গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম "কোই বিবি চলা গিয়া?" এক জন গাড়োওয়ান বলিল "হাঁ বাবু, এক বিবি আভি চলা গিয়া"। আবার দৌড়িয়া উপরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "ডালিম কোথায় থাকে?" এবার আর কেহ রসিকতা করিল না। ঠিকানা জানিয়া লইয়া আবার ফটকে দৌড়িয়া আসিলাম। একখানা মোটর-কার করিয়া তাহার বাড়ী গেলাম। শুনিলাম, ডালিম আসে নাই। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানি না, ডালিমের দেখা পাইলাম না। আবার বাগানে গেলাম, আবার খুঁজিলাম, কিন্তু তাহাকে আর পাইলাম না।

সে রাত্রে ঘুমাই নাই। পাগলের মত ছুটাছুটী করিলাম। পরদিন প্রভাতে আবার ডালিমের বাড়ী গেলাম। ঝী বলিল, সে শেষরাত্রে এসেছিল, আবার ভোর না হ'তেই চলে গেছে। একখানা চিঠি রেখে গেছে, তাহাকে বলে গেছে—সকালে একজন বাবু খোঁজ কর্‌তে আস্‌বে, তাঁকে এই চিঠিখানা দিস্।

আমি সেই চিঠিখানি লইলাম। খুলিতে খুলিতে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল, চিঠিখানি পড়িলাম :—

তুমি আমাকে খুঁজিতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। মনে করিও

আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই—মরিতে পারিব না! তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহারি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসারে যাকে সুখ বলে তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কাল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি, তাহা কখনও পাই নাই। তাহারি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি তাহা আর হারাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না। প্রাণ সর্ব্বস্ব! আমি বড় দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বাড়াইও না। এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই!

ডালিম

শক ও শকাব্দ

প্রাচীনকালে শক জাতি ভারতবর্ষে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভারত-ইতিহাসের যে যুগকে আমরা আজকাল পৌরাণিক (Traditional) যুগ বলিয়া থাকি, সেই যুগে শকজাতির প্রতিষ্ঠার কথা মহাভারত প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগে শকজাতির বৃত্তান্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণ ও জৈনগ্রন্থ প্রভৃতি হইতে জানিতে পারা যায়। এই সকল গ্রন্থেও যে সমুদয় কাহিণী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই যে সর্ব্বাংশে সত্য, এরূপ অনুমান করাও সঙ্গত নহে। কিন্তু শকজাতি যে ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে বিশেষ ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসকল হইতে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা যায়।

শকজাতি কর্ত্তৃক স্থাপিত 'শকাব্দ' নামক সুপ্রসিদ্ধ অব্দই অতীত কালে ভারতবর্ষে শকজাতির প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট প্রমাণ। খৃষ্ট জন্মের ৭৮ বৎসর পরে এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বহুস্থানে ইহার প্রচলন আছে। কোন কোন প্রদেশে ইহা 'শালিবাহন শক' নামে পরিচিত এবং এই কারণে এদেশের সাধারণ লোকের ধারণা যে, দাক্ষিণাত্যের খ্যাতনামা শালিবাহন নৃপতি কর্ত্তৃকই এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, এবং কোন কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখ দেখিয়াছি। কিন্তু বস্তুতঃ এ ধারণাটা নিতান্তই অমূলক। 'শকাব্দ' এই নামটিই এই অব্দের প্রকৃত উৎপত্তির পরিচায়ক। কিন্তু এ বিষয়ে আরও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই অব্দের পঞ্চশততম বৎসরে উৎকীর্ণ বাদামীগুহাস্থিত শিলালিপিতেই প্রথমে এই অব্দের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "শক রাজার অভিষেকের পঞ্চশত বৎসর পরে",—শিলালিপির এই সুস্পষ্ট বাক্য

পড়িয়া শকাব্দের উৎপত্তি বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

উপরোক্ত প্রমাণ ছাড়াও ভারতবর্ষে শকজাতির প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট প্রমাণ স্বরূপ দুইখানি শিলালিপির উল্লেখ করিতে পারা যায়।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ডাক্তার বার্গেস্ মথুরার ভূগর্ভে একখণ্ড প্রস্তর প্রাপ্ত হন। তদুপরি উৎকীর্ণ লিপিতে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি খোদিত রহিয়াছে

১ম পংক্তি "(ন) মো অরহতো বর্দ্ধমানস্য গোতিপুত্রস পোঠয়সক
২য় পংক্তি কালবালস
৩য় পংক্তি (ভার্য্যায়ে) কোশিকিয়ে সিমিত্রায়ে (শিবমিত্রায়ে ?)
অয়াগপটো প্রতি (প্রতিষ্ঠাপিত)

ডাক্তার বুলার "এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার" প্রথম সংখ্যার ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

"অরহৎ বর্দ্ধমানকে নমস্কার পূর্ব্বক, পোঠয় ও শকজাতির পক্ষে কালসর্পস্বরূপ গৌপ্তিপুত্রের পত্নী, কৌশিক গোত্র সমুদ্ভূতা, শিবমিত্রা কর্ত্তৃক 'অয়াসপট' * প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহার মধ্যে গৌপ্তিপুত্রের বিশেষণটি আমাদের পক্ষে অনুধাবনার বিষয়। তাঁহাকে "পোঠয় ও শকজাতির পক্ষে কালসর্পস্বরূপ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে গৌপ্তিপুত্র পোঠয় (মহাভারতোক্ত প্রোষ্ঠ) ও শকজাতিকে যুদ্ধে পরাভব করিয়াছিলেন, ইহাই উক্ত বিশেষণটিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। "বৈরী মত্তেভ সিংহ" প্রভৃতি বিশেষণ ইহার সঙ্গে তুলনীয়। গৌপ্তিপুত্রের বিশেষণটি হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, এককালে শকজাতি ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল।

---

* ভাস্কর্য্য-কলাকুশলসম্পন্ন প্রস্তরখণ্ডবিশেষ। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রণীত "এন্টিকুইটিস্ অফ্ মথুরা" নামক গ্রন্থে কয়েকখানি অয়াসপটের প্রতিকৃতি দেওয়া আছে।

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি মথুরায় প্রাপ্ত 'সিংহ' আকৃতি সম্পন্ন স্তম্ভ-চূড়ায় খোদিত। ইহার আবিষ্কর্ত্তা পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী এই লিপির নিম্নলিখিতরূপ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"সর্ব্বস সকস্তনস পুয়ায়ে"
অর্থ,—সমগ্র সকস্থানের পুণ্যের নিমিত্ত।

পণ্ডিতজীর মতে সকস্থানের অর্থ শকগণের বাসভূমি। শকস্থান নামক সুপ্রসিদ্ধ দেশ বর্ত্তমান কালের 'সিস্টান' প্রদেশ। কারণ ইসিডোর নামক ১ম শতাব্দীর জনৈক লেখকের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঐ সময়ে বর্ত্তমানে যেখানে সিস্টান প্রদেশ তথায় বহুসংখ্যক শকজাতীয় লোক বাস করিতেন এবং তদনুসারে উক্তস্থান শকস্থান নামে সাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিল। ইহাও সহজেই অনুমিত হয় যে সিস্টান শকস্থানেরই অপভ্রংশ।

উপরোক্ত শিলালিপিটির মর্ম্ম এক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে, কোন বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঐ স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকারীগণ স্তম্ভচূড়ায় স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে যাহারা মন্দিরাদি স্থাপনা করিতেন অথবা তথায় দানাদি করিতেন, তাঁহারা স্বীয় নাম, এবং কাহার পুণ্যার্থে উক্ত দানক্রিয়া সাধিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ খোদিত করিয়া রাখিতেন। সুতরাং একথা সহজেই উপলব্ধি হয় যে শকজাতীয় কোন ব্যক্তি উক্ত বৌদ্ধ মন্দির স্থাপনা বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার কর্ম্মের ফলস্বরূপ তিনি যেটুকু পুণ্যের প্রত্যাশা করিতে পারিতেন তাহা সুদূরস্থিত স্বদেশের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছেন। সাধারণতঃ লোকে নিজের বা নিজের আত্মীয় স্বজনের—পিতামাতা পুত্র ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির পুণ্য কামনা করিয়া থাকে—কিন্তু এই স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি তৎসমুদায় উপেক্ষা করিয়া তাঁহার

সমগ্র পুণ্যফল নিজের দেশকে অর্পণ করিয়াছেন, এবং প্রস্তরগাত্রে তাঁহার স্বদেশবাৎসল্য চিরদিনের নিমিত্ত সঞ্চীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই হিসাবে এই সংক্ষিপ্ত লিপিখানির অমূল্য হইলেও, আমাদের নিকট ইহার বিশিষ্ট মূল্য এই যে ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করে যে এককালে শকজাতি মথুরায় প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।*

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল তাহার উদ্দেশ্য এই কথাটি প্রতিপন্ন করা যে ভারতবর্ষে শকজাতির প্রাধান্যবিস্তার কেবল মাত্র আমাদের দেশের পুরাণ-কথা (tradition) নহে, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণেরও অভাব নাই। এত বিস্তার করিয়া লিখিবার কারণ এই যে বর্ত্তমানে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ উক্ত পুরাণকথার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শকজাতি কোনকালেই আর্য্যাবর্ত্তে প্রাধান্যলাভ করে নাই এবং শকাব্দাও তাহাদের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; শকাব্দ নামে যে বর্ষগণনা অধুনা প্রচলিত তাহা হিন্দু জ্যোতিষীগণের কারসাজিমাত্র। ইহার অনুরূপ আর একটি যুক্তি ফার্গুসন সাহেব কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

তাহার মতে বিক্রম-সংবৎ অব্দ রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় নাই (কারণ বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজাই এদেশে ছিল না) এবং ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দেও তাহার গণনা আরম্ভ হয় নাই। ৫৪৩ খৃঃ অব্দে এই অব্দের গণনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের 'ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ' ইহাকে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ইহার বর্ষগণনা ছয় শত বৎসর পশ্চাৎপদ করিয়া দিয়াছিল। ফার্গুসন সাহেবের সিদ্ধান্তের শোচনীয় পরিণাম সকলেই অবগত আছেন। আমাদের ভরসা আছে ফ্লীট সাহেব উদ্ভাবিত অপর সিদ্ধান্তের পরিণামও তাহাই হইবে।

* এই দুইখানি শিলালিপির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এই প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত বিশেষজ্ঞের জন্য নহে, সুতরাং এবিষয়ে কোন বাদানুবাদ না করিয়া আমাদের মতে যে অর্থটি প্রকৃষ্ট তাহাই মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম।

এ বিষয়ে আরও একটু রহস্য আছে। ফার্গুসন সাহেব বিক্রমাদিত্য ও তৎপ্রতিষ্ঠিত অব্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শকাব্দ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মতে বাস্তবিক ৭৮ খৃঃ অব্দেই ইহার আরম্ভ এবং শকরাজা কর্তৃকই ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। এই শকরাজা কনিষ্ক। ফ্লীট ইহার ঠিক বিপরীত মত পোষণ করেন। শকগণ কর্তৃক শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার মতে বিক্রমসংবৎ বাস্তবিকই খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং এই বিক্রমাদিত্য কনিষ্ক। ফার্গুসণের মতে বিক্রমসংবৎ ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণের ছলনামাত্র, কিন্তু শকাব্দই প্রাচীন ভারতের প্রকৃত অব্দ। ফ্লীটের মতে শকাব্দ জ্যোতিষীগণের কারসাজি মাত্র, পরন্তু বিক্রমসংবৎই আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস-বিখ্যাত অব্দ (the historic era of Northern India).

আমরা দেখিয়াছি শকজাতি এককালে ভারতবর্ষে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। তাহাদের আদি বাসস্থান কোথায়, কবে কিরূপে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, এখন তারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

চীনদেশীয় গ্রন্থ ও গ্রীক লেখকদিগের বিবরণ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে শকজাতি জাক্সার্টেস্ (সিরদরিয়া) নদীর তীরে বাস করিত। ক্রমে বংশবৃদ্ধি হইলে তাহারা সিরদরিয়া ও অকসাস্ (আমুদরিয়া) নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ অধিকার করে। এই সময়ের মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত হিয়ংনু নামক জাতি পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং পার্শ্ববর্ত্তী ইয়ু-চি জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করে। পরাজিত ইয়ু-চিগণ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ক্রমে শকরাজ্য অধিকার করিয়া তথায় বসবাস করে। এইরূপে শকগণ তাহাদের আদিম বাসস্থান হইতে তাড়িত হয়। এই ঘটনা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

শকগণ পরাভূত হইয়া পশ্চিমদিকে প্রস্থান করে এবং অমুদরিয়া

পার হইয়া বক্ত্রিয়া প্রদেশ অধিকার করে। তৎকালে এই প্রদেশে গ্রীকগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডার ভারত অভিযানের পূর্ব্বে এই বক্ত্রিয়া প্রদেশ অধিকার করেন, এবং সেই সময় হইতেই গ্রীকগণ এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই গ্রীকবংশের অন্যতম রাজা হেলিওক্লিসের রাজত্বকালে শকগণ বক্ত্রিয়া প্রদেশ অধিকার করে এবং গ্রীকরাজগণ কাবুলে ও ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আনুমাণিক খৃঃ পূঃ ১৩০ অব্দে এই ঘটনা ঘটে।

বক্ত্রিয়া প্রদেশের যে অংশ আমুদরিয়ার দক্ষিণে তাহাই মাত্র শকগণের অধিকারভুক্ত হয়। আমুদরিয়ার উত্তরে তাহাদের পরম শত্রু ইয়ু-চিগণ স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। চ্যাং-ফিয়েন নামক একজন চীনদেশীয় দূত এই সময়ে উক্ত প্রদেশে আগমন করেন এবং তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা এই সময়ের ঘটনা ও অবস্থা কতক কতক জানিতে পারি।

শকগণ বক্ত্রিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়াই নিরস্ত থাকে নাই। অতঃপর তাহারা পার্থিয়া * রাজ্য আক্রমণ করে। এই পার্থিয়া দেশের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে সুপ্রসিদ্ধ মিথ্রাডেটিসের মৃত্যুর পর শকগণের আক্রমণে পার্থিয়া রাজ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। রাজা দ্বিতীয় ফ্রায়াটেস্ শকগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন এবং পরবর্ত্তী রাজা প্রথম আর্ত্তবেনাসেরও ঐরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটে। অবশেষে দ্বিতীয় মিথ্রাডেটিস তুমুল সংগ্রামের পর শকগণকে পরাভূত করেন।

এইরূপে শকগণ পার্থিয়া হইতে দূরীভূত হইল। বক্ত্রিয়া প্রদে-

* বর্ত্তমান কালের পারশ্য ও তুর্কীস্থানের কিয়দংশ প্রাচীন পার্থিয়ান জাতির সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পার্থিয়ার সম্রাটগণ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং বহুবর্ষ পর্য্যন্ত তাহারা পূর্ব্ববিখ্যাত রোম সাম্রাজ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন।

শেও তাহাদের অধিকার অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। যে ইয়ু-চি জাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়া, স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দীর্ঘ পথ ভ্রমণ ও বহুক্লেশের পর, অবশেষে তাহারা বক্ত্রিয়া প্রদেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সেই ইয়ু-চি জাতির পরাক্রমেই আবার তাহাদিগকে এই নূতন আশ্রয়ও পরিত্যাগ করিতে হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমুদরিয়ার দক্ষিণে শকগণ বাস করিত, এবং ইহার উত্তর ভূভাগ ইয়ু-চিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র একটি নদী, কিন্তু ক্রমে ইয়ু-চি জাতি এই ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিল, এবং শকগণের দুর্ভাগ্য আবার তাহাদিগকে নূতন আশ্রয় স্থান অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিল। তাহাদের উত্তরে ও পূর্ব্বে ইয়ু-চি জাতি, সুতরাং এ দুই দিক এক প্রকার বন্ধ। পশ্চিমে পার্থিয়া রাজ্য সেখান হইতেও বহুকাল সংগ্রামের পর তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; বাকী এক দক্ষিণ দিক। নিরুপায় হইয়া শকগণ দক্ষিণ দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্ত্তমান আফগানিস্থানের দক্ষিণাংশই সম্ভবতঃ শকগণের প্রথম উপনিবেশ হইয়াছিল, কারণ ইহার অন্তর্গত একটি প্রদেশ তাহাদের নামানুসারে শকস্থান নামে পরিচিত হইয়াছিল। এইরূপে ঘটনাচক্রের প্রভাবে এই শকজাতি মধ্য এশিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের সীমান্তপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল এই-রূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

এপর্য্যন্ত শকগণের সম্বন্ধে যে সমুদয় বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা চীনদেশীয় ইতিবৃত্ত হইতে সংগৃহীত। কিন্তু চীনদেশীয় গ্রন্থে শকজাতির ইতিবৃত্ত এইখানেই শেষ হইয়াছে। শকস্থানে উপনিবেশ স্থাপনের পরে শকদিগের জাতীয় জীবনে আর কি ঘটনা ঘটিয়া-ছিল, বিদেশীয় কোন গ্রন্থ হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যেটুকু উদ্ধার হইয়াছে তাহাতে এই শকজাতির বিবরণ কতক জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত

ভারতবর্ষের পুরাণ-কথাও তাহাদের বাহিনী সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রথমতঃ ইতিহাসের দিক দিয়াই দেখা যাউক। তক্ষশিলা এবং তৎসন্নিহিত অপরাপর স্থানে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সমুদায় এবং তক্ষশিলায় প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপির প্রামাণে আমরা পশ্চিম ভারতবর্ষের এক পরাক্রান্ত রাজবংশের পরিচয় পাই। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (সম্ভবতঃ) মগ্ বা মগ। এই বংশের অপরা-পর রাজার নাম অ্যাজেস্, অ্যাজিলাইসিস্, অ্যাজেস্ (দ্বিতীয়)। নাম প্রভৃতি দৃষ্টে এই রাজগণকে শক জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রায় সকলেই ইহাদিগকে শকজাতীয় বলিয়া অনু-মান করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যে শকজাতিকে আমরা শকস্থানে এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে দেখিয়াছি তাহাদেরই একদল সিন্ধু-নদ পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অধিকার করে। ঠিক কোন সময়ে মগ ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মগ সিংহাসন আরোহণ করেন। কারণ মগের মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি কান্দাহার প্রদেশের ভনোনিস্ নামক রাজার সমসাময়িক। এই ভনোনিস্ ও পার্থিয়ার রাজা ভনোনিস্ অভিন্ন ব্যক্তি কল্পনা করিতে পারি, কারণ কান্দাহার প্রদেশের প্রাপ্ত ভনোনিসের মুদ্রায় পার্থিয়ার রাজার পদবী ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং মুদ্রা দৃষ্টে জানা যায় যে যদিও কান্দাহার উক্ত ভনোনিসের অধীন ছিল, তথাপি ভনোনিস নিজে কান্দাহার শাসন করিতেন না, তাঁহার ভ্রাতা তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ওদিকে আবার ইসিডোর নামক লেখকের ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারি যে প্রথম শতাব্দীতে কান্দাহার প্রদেশ পার্থিয়ার রাজার অধীন ছিল। পার্থিয়ার রাজগণ যে ভ্রাতা বা অন্য নিকট-আত্মীয়ের দ্বারা দূরস্থিত প্রদেশসমূহ শাসন করাইতেন তাহাও পার্থিয়ার ইতিহাস হইতে

জানিতে পারা যায়। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় কান্দাহারে প্রাপ্ত মুদ্রার ভনোনিস্ ও পার্থিয়ার ভনোনিস্ অভিন্ন ব্যক্তি। পার্থিয়ায় ভনোনিস্ নামে দুইজনে রাজা ছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ভনোনিস্ ইহার মধ্যে কোন জন তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু দুইজনেই খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। সুতরাং ভনোনিসের সমসাময়িক তক্ষশিলার শকরাজা মগও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক এইরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারি।

ভারতবর্ষের পুরাণ-কথায় শকজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কালকাচার্য্য নামে জৈনগুরুর জীবন কাহিনী বহু জৈনগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা "কালকাচার্য্য কথা" নামে সুপ্রসিদ্ধ। 'কালকাচার্য্য কথার' সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে একদা গুরু কালকাচার্য্য স্বীয় ভগিনীসহ উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হন। উজ্জয়িনীর রাজা গর্দ্দভিল্ল কালকাচার্য্যের ভগিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন। কালকাচার্য্য ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধুনদ পার হইয়া শকরাজ্যে গমন করেন। এই রাজ্যে বহুসংখ্যক সামন্ত শক নরপতি বাস করিতেন—তাহারই একজনের আশ্রয়ে কালকাচার্য্য বাস করেন। ক্রমে তিনি এই নরপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। অবশেষে কালকচার্য্য এই শকনরপতিকে ভারতবর্ষ আক্রমণের পরামর্শ দেন এবং নিজে পথ প্রদর্শক হইয়া তাহার সৈন্য উজ্জয়িনীতে লইয়া যাইবেন এইরূপ অঙ্গীকার করেন। উক্ত সামন্ত নরপতি এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং অপর কয়েকজন সামন্ত নরপতির সাহায্যে উজ্জয়িনী আক্রমণ ও অধিকার করেন। রাজা গর্দ্দভিল্ল নিহত হন, কিন্তু তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য নানাস্থানে ঘুরিয়া সৈন্য সংগ্রহ করতঃ চারিবৎসর পরে শকগণকে বিতাড়িত করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরায় অধিকার করেন। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার মানসে বিক্রম-সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ মোট ১৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে

পুনরায় শকগণ উজ্জয়িনী অধিকার করে এবং শকাব্দের প্রতিষ্ঠা করে।

উল্লিখিত কাহিনী সর্ব্বাংশে সত্য কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার কোন কোন ঘটনার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কালকাচার্য্য সিন্ধুনদ পার হইয়া শকগণের রাজ্যে গিয়াছিলেন কাহিনীতে এইরূপ বর্ণিত আছে। ঠিক ঐ সময়ে যে শকগণ আফগানিস্থানের দক্ষিণভাগে রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন আমরা পূর্ব্বে তাহা দেখিয়াছি।

'কালকাচার্য্য কথা' হইতে জানা যায় যে শকগণ ৭৮ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনী অধিকার করে এবং ঐ সময়ে শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনাটিও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয়। ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী এক পরাক্রান্ত রাজবংশ তিন শত বৎসরেরও অধিককাল মালব ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে রাজত্ব করেন, ইহা আমরা শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে জানিতে পারিয়াছি। ইঁহারা যে শকবংশীয় তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ চষ্টন উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন, তাহা আমরা টলেমির গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। এই চষ্টন কোন সময়ের লোক সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু সম্প্রতি নবাবিষ্কৃত শিলালিপির প্রমাণে প্রতিপন্ন হয় যে চষ্টন আনুমানিক ৭৮ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।* সুতরাং কালকাচার্য্যের কাহিনীর এই অংশ সর্ব্বথা সত্য বলিয়া মনে হয়।

উজ্জয়িনীর এই শকজাতীয় রাজবংশের আদিম ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা শকজাতির যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার সহিত কালকাচার্য্যের উপাখ্যান সংযোগ

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কারণাবলী যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত "Date of Chastana" নামক আমার প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। (J.—A. S. B. June, 1914)

করিলেই ইহার মীমাংসা হয়। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে শক-স্থান ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে যে সমুদায় শকজাতীয়গণ বাস করিত তাহাদেরই একদল এইরূপে উজ্জয়িনী অধিকার করে।

উজ্জয়িনীর এই শক রাজবংশের একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তাঁহাদের মুদ্রা ও শিলালিপিতে তাঁহারা বরাবর আপনাদিগকে ক্ষত্রপ বা রাজপ্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কোথাও আপনাদিগকে রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন নাই। তাঁহাদের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজবংশের পক্ষে এরূপ করা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে প্রথমে এই রাজবংশ অপর কোন রাজবংশের অধীন ছিল, এবং তাহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ্যশাসন করিত। মারহাট্টা পেশবার ন্যায় পরিণামে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেও তাহারা সেই পূর্ব্ব উপাধিই বজায় রাখিয়াছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার উজীরও এইরূপ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে কোন্ রাজবংশের প্রতিনিধি-স্বরূপ ইহারা উজ্জয়িনী শাসন করিত? ইহার কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। তবে এক্ষেত্রে আমরা একটি অনুমান করিতে পারি। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি তক্ষশিলা এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে মগ নামক এক শক-রাজা স্বীয় বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে সম্ভবতঃ এই মগ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। যদি তাহা হয় তবে খুব সম্ভব উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপ চষ্টন ইঁহারই প্রতিনিধি। এই অনুমানের সমর্থক দু একটি প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উজ্জয়িনীর শক-রাজবংশের আদি পুরুষ চষ্টনের মুদ্রায় খরোষ্ঠি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। উজ্জয়িনীতে কিন্তু কোন কালেই খরোষ্ঠি অক্ষরের প্রচলন ছিল না। অপরপক্ষে তক্ষশিলায় এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে এই খরোষ্ঠিই প্রচলিত ছিল। সুতরাং চষ্টনের মুদ্রার খরোষ্ঠি অক্ষর তক্ষশিলার বা তদঞ্চলের কোন রাজার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় দান করে।

তক্ষশিলা নামক স্থানে প্রাপ্ত তাম্রফলকে উৎকীর্ণ একখানি লিপিতে তাহার তারিখ এইরূপ ভাবে দেওয়া হইয়াছে,—"মহারাজা মগের ৭৮ বৎসরে।" কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"মহারাজা মগ কর্ত্তৃক স্থাপিত অব্দের ৭৮ বৎসরে।" 'কালকাচার্য্য কথা' হইতে আমরা জানিতে পারি যে শকগণ উজ্জয়িনী অধিকার করিলে শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা দেখিয়াছি মগ সম্ভবতঃ খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন;—সুতরাং অসম্ভব নহে যে মগই শকাব্দের প্রবর্ত্তক।

কিন্তু উভয়ের এই পরস্পর সম্বন্ধ সত্য অথবা কল্পিত হউক, তক্ষশিলায় ও উজ্জয়িনীতে যে দুইটী পরাক্রান্ত শকবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। তক্ষশিলার রাজবংশ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। সম্প্রতি মার্শাল সাহেব তক্ষশিলার অ্যাজেসের যে তাম্রলেখ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার তারিখ ১৩৬ বর্ষ। ইহা যদি শকাব্দ হয়, তবে এই বংশ ২১৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল বলিতে হইবে। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ইহার বহু পূর্ব্বেই এই রাজবংশ ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। যে ইয়ুচি জাতি, নিদারুণ অদৃষ্টলেখার ন্যায়, সর্ব্বদা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়াইয়া ফিরিতেছিল, তাহাদেরই এক শাখা কুশাণবংশের দ্বারা ভারতবর্ষে শকদিগের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! এই চির-শত্রু কুশাণবংশের রাজা কনিষ্ক শকশ্রেষ্ঠ ও শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া অদ্যাপি কোন কোন ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন।

তক্ষশিলার শকরাজবংশ অপেক্ষা উজ্জয়িনীর শকরাজবংশ অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। ৭৮ খৃঃ অব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রায় ৪০০ খৃঃ অব্দে গুপ্তবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক ইহা ধ্বংস হয়। এই সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া শকরাজগণ

ভাবে, ভাষায়, ধর্ম্মে ও আচারব্যবহারে হিন্দু হইয়াছিলেন এবং পরিণামে তাঁহারা বিরাট হিন্দুজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে শকজাতির কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিচিত্র ঘটনা। মধ্য-এশিয়ার সিরদরিয়ার পার হইতে বিতাড়িত হইয়া কত ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আসিয়া অবশেষে এই জাতি ভারতবর্ষে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার অনুরূপ ঘটনা আমরা আরও দেখিতে পাই,—দেখিতে পাই কত সভ্য অসভ্য জাতি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় সুদূর গিরিগাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া, অশেষ বাধা বিপত্তি সহ্য করিয়া, অবশেষে এই ভারতবর্ষের মহা মানবসাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিচিত্র কবিপ্রতিভার ও বিরাট কল্পনার সাহায্যে যে মহামিলন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কেবল কবিত্ব হিসাবে নহে ঐতিহাসিক হিসাবেও সত্য।

শকজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে সেই মহান্ সত্যের একাংশ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।*

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

---

* প্রবন্ধশেষে পাঠকবর্গের প্রতি আমার এই অনুরোধ যেন তাঁহারা মনে রাখেন, এ প্রবন্ধ সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিত, সুতরাং সবিস্তার বাদানুবাদ বা যুক্তিতর্কের স্থান এ প্রবন্ধে নাই। প্রবন্ধোক্ত অনেক মতবাদই সাধারণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণকর্ত্তৃক এখনও স্বীকৃত হয় নাই—তাহা প্রায়ই আমার নিজের মত এবং তাহার দোষগুণও সকলই আমার নিজের।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

কৃষ্ণকথা শুনিতে ও বলিতে ভাল লাগে। তারই জন্য সুযোগ পাইলেই বৈষ্ণব পদাবলী শুনিতে যাই, আর অমন করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, নানাভাবে ও নানা অছিলায় কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করি। গত বৎসর নবপর্য্যায় "বঙ্গদর্শনে" কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বঙ্গদর্শন সম্পাদক প্রিয় সুহৃৎ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে "বঙ্গদর্শন" বন্ধ হইয়া গেল, আমার কৃষ্ণকথা ফুরাইল না। ফলতঃ "বঙ্গদর্শনে" এই আলোচনার মুখবন্ধ পর্য্যন্ত শেষ করিবার অবসর মিলে নাই। তাই আবার নূতন করিয়া "নারায়ণে" কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই বয়সে, এতদিন পরে, কৃষ্ণকথা যে মিষ্ট লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, কাহারও কাহারও চক্ষে ইহা দোষের কথা, ইহা জানি। কিন্তু এ দোষটা কি বয়সের, না রক্তের, এখনও ঠিক ঠাওর করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে শিক্ষার দোষ যে নয়, ইহা নিঃশঙ্কোচেই কহিতে পারি। বৈষ্ণব পরিবারে জন্মিয়াও কোনও দিন কোন প্রকারের বৈষ্ণব-শিক্ষা পাই নাই। ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য সমাজে বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে কোনও বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহাদের বীজমন্ত্রই কেবল ভিন্ন, নতুবা বিবাহাদি সংস্কার এবং নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ উভয় সম্প্রদায়েরই এক। বীজমন্ত্র অতি গোপনীয় বস্তু, এ মন্ত্র নিজের রসনায় উচ্চারণ করিয়া নিজের কাণেও শুনিতে নাই। তাহাতে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সাধকের প্রত্যবায় হয়। কে কোন্ মন্ত্র জপ করে, অপরে তাহা শুনিতে পায় না। মা-বাবা কৃষ্ণমন্ত্রই জপ করেন, একটু বড় হইলে ইহা শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই কৃষ্ণমন্ত্র বস্তুটী যে কি, ইহা জানি নাই। বৈষ্ণব গোঁসাইরা আমাদের কুলগুরু ছিলেন।

বয়স হইলে শুনিয়াছি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি খুব ভক্ত ও পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেবল দুর্গোৎসবের সময়েই আমাদের বাড়ী আসিতেন। তখন মহাপূজার ধূম লাগিয়া যাইত। ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ করিতেন। তন্ত্রধারক মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, পুরোহিত সে মন্ত্রের আবৃত্তি করিয়া প্রতিমার পূজা করিতেন। ছাগাদি বলি হইত। দেবতার ভোগ লাগিত। গীতবাদ্য ও খাওয়াদাওয়ার আনন্দকোলাহলের মধ্যেই সকলে থাকিত। এই রাজসিক ব্যাপারের ভিতরে কৃষ্ণকথা বলিবার বা শুনিবার অবসর মিলিত না। আর গোস্বামী প্রভুরাও পূজার প্রণামী লইতেই আসিতেন, শিষ্যের বাড়ী ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আসিতেন না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে একটা রেষারেষী না বাধিলে বিশেষ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবার কোনও প্রেরণাও ভাল করিয়া চাগিয়া উঠে না। বিশেষতঃ মধ্যযুগের গতানুগতিক হিন্দুধর্ম্ম আচারের ধর্ম্ম, প্রচারের ধর্ম্ম নয়। মতবদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আক্রমণের মুখে হিন্দু আজ আপনার ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালা দেশের পল্লিসমাজে, এই প্রচারের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। সে'কালে হিন্দু-সমাজে শাক্ত-বৈষ্ণবে কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতাও দেখা যায় নাই। শাক্ত গৃহস্থের বাড়ীতে রাসযাত্রা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের বাড়ীতে হামেষাই কালী দুর্গা প্রভৃতির পূজা হইত। শাক্তেরাও রাধাগোবিন্দের ভজন গাইতেন, বৈষ্ণবেরাও কালীদুর্গার নাম লইতেন এবং শ্যামা বিষয়ক মালসী গান ভক্তিভরে শুনিতেন ও গাহিতেন। বৈষ্ণব-সন্তান হইয়াও শৈশবে ও বাল্যে প্রতিদিনই আমি দুর্গানাম লইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম। আপদবিপদে দুর্গা দুর্গা বলিয়াই ডাকিতাম। বিশেষ বিপন্ন হইলে উদ্ধারকল্পে কালী দুর্গার নিকটেই মানস বা "মানত" করিতাম। শৈশবে ও বাল্যে এক বৈরাগীদিগের মুখে, আর কখনও কখনও সন্ধ্যা আরতির কালেই, রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতাম; অন্যথা কৃষ্ণনামের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ ছিল না।

কৃষ্ণকথা শুনিবার ও বুঝিবার সময়ও তখন আসে নাই। কৃষ্ণকথা ধর্ম্মজীবনের আদি কথা নয়, শেষ কথা। ধর্ম্মের গোড়ার কথা ভক্তি নয়, ভয়; রতি নয়, বিস্ময়। বহুদিন হইতেই নাকি আমাদের দেশের ধর্ম্মে একটা উল্টট খিচড়ী পাকাইয়া গিয়াছে, তাই বৈষ্ণবেরাও "বিপত্তৌ মধুসূদন" বলিয়া ডাকেন। কিন্তু প্রকৃত কৃষ্ণোপসনার সাধ্য মধুসূদন নহেন। মধুসূদনকে ডাকে লোকে ভয়ে, কৃষ্ণকে ডাকিতে হয় ভক্তিভরে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভয় বা বিস্ময়ের সম্পর্ক নাই। কিন্তু শৈশবের ও বাল্যের ধর্ম্ম ভয় ও বিস্ময়কে ধরিয়াই ফুটিয়া উঠে। শৈশবে দেবতার শরণ লইতাম ভয়ে বা লোভে। আর্ত্ত বা অর্থার্থী হইয়াই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, কিম্বা ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিবার আশায়ই কালী দুর্গা প্রভৃতিকে ডাকিতাম। ইহাই সে বয়সের সহজ ধর্ম্ম ছিল।

শৈশবের ও বাল্যের ধর্ম্ম শাক্তের ধর্ম্ম, খাঁটি বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নয়। সহজ স্বভাবের পথে চলিলে সকলকেই প্রথমে শাক্ত হইতে হয়, আর পরিণামে এই শাক্তধর্ম্ম সাধন করিতে করিতেই তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া ব্রজের পথে দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু ধর্ম্ম এখন আর সহজ পথে ত চলে না। এখন এ বস্তু পৈত্রিক, কৌলিক হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণবকুলে যে জন্মে, সে'ই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাধন করিতে যায়। শাক্তকুলে যে জন্মিল আমরণ সে গতানুগতিকভাবে ঐ শাক্তধর্ম্মই সাধন করে। হিন্দুধর্ম্মে এখন অধিকার অনধিকার বিচার আর নাই। আছে কেবল কুলের বিচার। খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি ধর্ম্ম যেমন মতবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম সেইরূপ কুলবদ্ধ হইয়াছে। তাই বালকেরাও বৈষ্ণব সাজিয়া বেড়ায়, বৃদ্ধেরাও শাক্ত থাকিয়া যান। প্রকৃতপক্ষে বাল্যের ধর্ম্ম শাক্তের ধর্ম্ম। কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতাই বাল্যকল্পনাকে জাগাইয়া তুলেন। এরই জন্য বাল্যকালে কালী দুর্গাকেই তখন করিয়া ডাকিতাম। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হইত, কিন্তু বালককে কেবল নাম দিয়া

ভুলান' যায় না। কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজাও বিরল ছিল। এক দোলযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা, আর কোথাও কোথাও রাসের সময়েই কেবল রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তির পূজা হইত। রাসযাত্রাতে মাটির মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইত, কিন্তু দোলযাত্রা বা ঝুলনযাত্রাতে গৃহপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহেরই ভোগ-আরতি হইত। এ বিগ্রহ পাথরের বা ধাতুর; আকারে ছোট; সকল সময়ে ভাল করিয়া নজরেও পড়িত না। এ মূর্ত্তি দ্বিভুজ, নরমূর্ত্তি। আর মানুষের বিগ্রহকে পূজা করা বড় কঠিন কথা। এ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণে ভয় বা বিস্ময়ের উদয় হয় না। কালীমূর্ত্তি বা দুর্গাপ্রতিমা যেমন ভাবে চিত্তকে অভিভূত করিত, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহে তেমনটা করিতে পারিত না। কালী দুর্গার মূর্ত্তিতে প্রাণে দেবতা-জ্ঞান ফুটাইয়া দিত, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহেতে এটী করিতে পারিত না। কালী দুর্গাকে দেখিয়া মন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইত। এই ভয় ও এই বিস্ময় জড়াইয়া যে ভাবটা জন্মে, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহাকেই ঐশ্বর্য্য-বোধ কহে। রাধাকৃষ্ণের ভজনায় এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই। এ সকল কথা অনেক পরে শুনিয়াছি। শৈশবে কোনও দিন শুনি নাই, শুনিলেও ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতাম না। এই কথা-টাই কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বের মূল কথা। এ কথাটা যে না বুঝে, কৃষ্ণ-কথা কত মিষ্ট সে ইহা জানে না। কৃষ্ণ যে কি বস্তু ইহাও সে বুঝে না। কেন কৃষ্ণমূর্ত্তি দ্বিভুজ মুরলীধর নবীন কিশোর; রাধি-কার বিগ্রহ কেন নবীন কিশোরীর অনুরূপ; কেন ইঁহাদের পাঁচটা মুখ বা দশটা হাত নাই; কেন যে ইঁহারা এতটা মানুষের মতন, অথচ সকল দেবতার পরম দেবতা;—বৈষ্ণবদের মধ্যেই কয়জনে বা এ সকল কথা বুঝেন ও জানেন,—অন্যেপরে কা কথা? এ অবস্থায় বৈষ্ণবকুলে জন্মিয়াও যে বাল্যে বা যৌবনে কৃষ্ণ যে কি বস্তু, বৈষ্ণব ধর্ম্মটাই সত্য সত্য কি, ইহার কোনও সন্ধান পাই নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। বহুদিন এ বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসারও উদয় হয় নাই।

আর জীবনের এই "বেলি অসকালে" এই জিজ্ঞসাকে বিশেষ

করিয়া জাগাইয়াছে এই কয়টা ইন্দ্রিয়। চক্ষু রূপের জন্য পাগল। কত রূপ দেখিল, কত রূপ বুকে টানিয়া ধরিল, কিন্তু তার রূপের পিপাসা কিছুই কমিল না। কাণ দুটা মধুর শব্দের জন্য আকুল। আজন্মকাল শুনিয়া শুনিয়া তার শুনার সাধ মিটিল না। নাসিকা গন্ধের জন্য সদাই সজাগ, কত গন্ধ শুঁকিল, কিন্তু তার আশা পূরিল না। এইরূপে সব কটা ইন্দ্রিয় কি যেন চায়, কি যেন পায় না, আর পায় না বলিয়াই চঞ্চল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করে। যৌবনে ইন্দ্রিয়গুলি যখন বড় সতেজ, বড় দুর্দ্দান্ত ছিল, সকল বিধিবাঁধন কাটিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার জন্য যখন চারিদিকে প্রাণটাকে লইয়া টানা-টানি করিত, তখন শুনিয়াছিলাম, এগুলিকে চাপিয়া রাখাই ধর্ম্ম। কিছু কিছু যে চাপিয়া রাখিতে চাই নাই, এমনও নয়। ভাবিয়াছিলাম বার্দ্ধক্যে বুঝি বা এরা শান্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইল কৈ? প্রয়া-সের শক্তি গেল, কিন্তু পিয়াসার নিবৃত্তি হইল কৈ? বরং বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে এ পিপাসা আরও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহা এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না, চক্ষু যে কেবল তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায়। যে মধুর শব্দ আজও কোথাও শুনিলাম না, কাণ যে সর্ব্বদা তারই জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে। যে গন্ধ আজও শুঁকিতে পাইলাম না, নাসিকা যে তাই কেবল শুঁকিতে চাহে। যে স্পর্শ আজও পাইলাম না, প্রতি অঙ্গ যে তারই জন্য তৃষিত ক্ষুধিত হইয়া আছে।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এ কেবল রাধিকার কথা নহে, ইহা প্রকৃতি মাত্রেরই চিরন্তন আক্ষেপ। আর এ পিপাসা কি ইন্দ্রিয়ের, না মনের? একি শরীরের না শরীরীর,—দেহের না আত্মার? যদি সত্যই এ পিপাসা কেবল ইন্দ্রিয়ের হইত, তবে ইন্দ্রিয় যখন শিথিল হইল, তখন ইহা কমিল না কেন? এ যদি শরীরেই হবে, তবে শরীরের অপচয়ে তার ক্ষয় হয় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিবে কে?

প্রশ্নটা নূতন নহে, এ যে বিশ্বসমস্যা। নিজেকে যে'ই সর্ব্ব-সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া, সত্যভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখে, তারই সম্মুখে এ সমস্যা উপস্থিত হয়। কেহ বা ইহাকে চাপিয়া রাখে, কেহ বা কোনও রকমে গোঁজামিল দিয়া ইহার একটা ধামা-চাপা মীমাংসা করিয়া লয়। যে চাপিয়া রাখে না, বা রাখিতে পারে না, এই বিশ্বসমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাকে পরিণামে কৃষ্ণতত্ত্বে পৌঁছিতেই হয়। এই ইন্দ্রিয় কটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পার। এগুলি ভেদবুদ্ধি-মূলক। অদ্বৈত-অভেদ-জ্ঞানে কে, কাহাকে, কি দিয়া, দেখে? কে, কি, কিসের দ্বারা, শুনে? সেখানে বিষয় নাই, কেবল বিষয়ী আছেন। ভোগ্য নাই, শুদ্ধ ভোক্তা আছেন। এই পথে একরূপ যো সো করিয়া এই জিজ্ঞাসাকে চাপিয়া রাখিতে পারা যায়। আমাদের দেশের নিবৃত্তপথাবলম্বী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দল এই ভাবেই এই বিশ্বজিজ্ঞাসার একটা মীমাংসা করিয়াছেন। এই মীমাংসায় যাঁরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, তাঁদের নিকটে কৃষ্ণকথার কোনও অর্থ নাই। সাধ্য তাঁদের নির্গুণ ব্রহ্ম। সিদ্ধি তাঁদের কৈবল্য। সাধন তাঁদের ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। আশ্রম তাঁদের সন্ন্যাস। আনন্দ তাঁদের নির্বিকল্প সমাধিতে।

এই জগৎকে উড়াইয়া দিতে পারি নাই, উড়াইয়া দিতে কোনও দিন চাহিও নাই। ইন্দ্রিয় কটাকে রিপু বলিয়া কোনও দিন নির্ম্মূল করিতে পারি নাই, করিতে চাহিও নাই। সংসারের বিবিধ সম্বন্ধকে "অবিদ্যাবিষয়ানি" ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই, করিতে

চাহিও নাই। আর এগুলিকে সত্য জানিয়া ধরিয়াছিলাম বলিয়াই পরিণামে কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি। চক্ষুর রূপের পিপাসা, কাণের শুনার আকাঙ্ক্ষা, রসনার রসের বাসনা, এগুলির পরিতৃপ্তি হয়, না হয় না? প্রাণের আত্মদানের অভিলাষ, যে দানের ভিতর দিয়াই প্রাণকে আবার প্রাণ পূরিয়া পাওয়া যায়, তার পূর্ণতা সম্ভব, না অসম্ভব? সংসারের সম্বন্ধসকলের কোনও নিত্য আশ্রয় ও সার্থকতা আছে, না নাই? সখাকে ধরিয়াই সখ্য জন্মে; কিন্তু সখাকে চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু রসের আশ্রয় নষ্ট হইলেই রস ত আর ফুরাইয়া যায় না। প্রাণের রসপিয়াসাও চলিয়া যায় না। এই সখ্য রতির নিত্য আশ্রয় ও পরিপূর্ণ সার্থকতা আছে, না নাই? সেইরূপ বাৎসল্যেরও নিত্য আশ্রয় আছে, না নাই? মাধুর্য্যেরও কোনও নিত্য আশ্রয় আছে, না নাই? যদি না থাকে, তবে প্রচলিত মায়াবাদই সত্য।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন?
মোহমায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন!—

ইহাই জীবনের চরম অর্থ ও পরম সত্য হইয়া দাঁড়ায়। এই মোহমায়াজাল চ্ছেদন করাই ধর্ম্ম হইয়া উঠে। কেহ কেহ এতেই তৃপ্ত হয়। যারা এমন করিয়া এ সকল রসের সম্পর্ককে নিষ্ঠুর মায়াবীর ইন্দ্রজালখেলা বলিয়া গ্রহণ করিয়া স্থির থাকিতে পারে না, তাদের পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব ভিন্ন আর গতি নাই। জগৎকে মিথ্যা, আর সংসারের স্নেহের, প্রীতির, প্রেমের, সেবার, ভক্তির সম্বন্ধসকলকে মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি নাই বলিয়াই ঋজুকুটীল বহু পথ ঘুরিয়া শেষে কৃষ্ণতত্ত্বের খোঁজ পাইয়াছি।

আপনার অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণায়, সংসার-পথে চলিতে চলিতেই এ তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, শাস্ত্র পড়িয়া পাই নাই। আর প্রচলিত শাস্ত্রের পথে যাইয়া যে এ তত্ত্বের সন্ধান পাই নাই, ইহা পরম সৌভা-

গ্যের কথাই মনে করি। সে পথে গেলে গতানুগতিক ভাবে, কৃষ্ণতত্ত্বের একটা কল্পিত অর্থ করিয়াই লইতাম। শাস্ত্র আপনার যুগপ্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। যে যুগে যে শাস্ত্র প্রচারিত হয়, তাহাতে সেই যুগের প্রচলিত মত, বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত, আচারবিচার ও রীতিনীতি প্রভৃতি জড়াইয়া থাকে। আর এক যুগের মত, বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত ও আচারবিচারাদি পর যুগেও ঠিক পূর্ব্বকার মতন কোথাও থাকে না। যোজনান্তর যেমন ভাষা ভিন্ন হয়, যুগে যুগে সেইরূপ জনসমাজের মনোভাবের এবং বহিরাচরণেরও বিস্তর পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়। ইহা জগতেরই নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই যুগে যুগে নূতন নূতন সমস্যার উদয় হইয়া, নূতন নূতন যুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক যুগের ধর্ম্ম আর এক যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না। এক যুগের শাস্ত্র অবলম্বনে অপরযুগে তত্ত্ব-জ্ঞানলাভ বা ধর্ম্মসাধন করাও সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শাস্ত্র যে যে যুগে রচিত হইয়াছিল, সেগুলি সেই সেই যুগেরই জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছে। সেই পুরাতন শাস্ত্রের দ্বারা এ যুগের নূতন জিজ্ঞাসার সম্যক মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের লোকের মতিগতি যেরূপ ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, সেকালের লোকের মনে যে সকল জিজ্ঞাসার উদয় হইতেছিল, চৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণ্য বাঙ্গালা বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাহারই মীমাংসার পথ দেখাইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে কতকগুলি চিরন্তন সত্যের ও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সত্য। কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত সত্য হইলেও, সে কালে যে ভাবে তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই ভাবে সেই তত্ত্বকে বা সিদ্ধান্তকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তাহাতে আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক বা জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করা কখন'ই সম্ভব হইবে না। এক যুগের প্রামাণ্য শাস্ত্রের পর যুগেও সেইরূপ প্রামাণ্য-মর্য্যাদা থাকে না বলিয়াই, যুগে যুগে সাধক ও সিদ্ধপুরুষেরা এবং তাঁহাদের অনুগত মনীষী ভক্তগণ আপন আপন যুগ-সমস্যাকে লক্ষ্য করিয়া নূতন শাস্ত্র প্রচার করেন,

কিম্বা পূর্ব্বতন শাস্ত্রেরই নূতন ভাষ্যাদি রচনা করিয়া শাস্ত্রধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। চৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণ্য বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থ, কতকটা নূতন শাস্ত্র, এবং কতকটা পুরাতন শাস্ত্রের নূতন যুগভাষ্য রূপেই গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে বেদ, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, ভাগবতাদি সকল প্রাচীনশাস্ত্রেরই যুগে যুগে বহুবিধ ভাষ্য রচিত হইয়া, তাহাদের প্রামাণ্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যে ভাগবত কৃষ্ণতত্ত্বের বিশেষ অবলম্বন ও উদ্দীপনা, সেই ভাগবতেরই কত না ভাষ্য রচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ভাগবতের ভাষ্য লিখিয়া যান, তাঁর পরেও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সম্মত সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার তাহার নূতন ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। আর সেই ভাষ্য যতই কেন উৎকৃষ্ট হউক না, তাহাতেই আমাদের যুগের সমস্যারও যে পূর্ণ মীমাংসা হইতে পারে, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। এই যুগের লোকমত ও এই যুগের জিজ্ঞাসাকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রের ও পুরাতন ভাষ্যের সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধনের জন্য, উপনিষদ, গীতা, ভাগবতাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের নূতন ভাষ্যের প্রয়োজন। এতাবৎকাল আমরা কেবল একটা বিরাট বিরোধের মধ্যেই পড়িয়াছিলাম। এখন ক্রমে সমন্বয়ের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছি। এই সমন্বয়মুখে, ক্রমে ক্রমে ভগবদিচ্ছায়, আমাদের এই যুগেও, এই যুগের বিশিষ্ট ভাব, মত, অভিজ্ঞতা ও আদর্শসম্মত ভাষ্যাদি অবশ্যই রচিত হইবে। তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা বসিয়া আছি।

এইরূপ যুগ-ভাষ্য এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই বলিয়া, আমাদের পক্ষে শুদ্ধ শাস্ত্রাবলম্বনে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কি না, তাহাই বলা কঠিন। কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত যখন সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে, বহুলোকের মত ও ভাবকে যখন তাহা অধিকার করিয়া বসে, তখনই প্রাচীন শাস্ত্র ও আধুনিক স্বানুভূতির সঙ্গে সমন্বয়-সাধন করিয়া যুগভাষ্যের প্রচার হয়। আমাদের এখনও সে অবস্থা উপ-

স্থিত হয় নাই। এই জন্য আমরা প্রকৃত পক্ষে নিজেদের ভিতরকার প্রেরণা ও অনুভূতির মধ্যেই এখন তত্ত্ব-বস্তুর মুখ্য সন্ধান পাইয়া থাকি।

আমি শাস্ত্র-সাহিত্য পড়িয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাই নাই। অন্তর্জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই, শ্রীগুরুর কৃপায়, তিলে তিলে এই তত্ত্বটী আমার জ্ঞানেতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। বোধ হয়, আমার মতন আরো অনেকে স্বল্পবিস্তর এই পথেই যাহা কিছু কৃষ্ণতত্ত্বের আভাস পাইয়াছেন। এইরূপে বহুতর নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের ভিতরকার ভাব ও অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া এদেশে বর্ত্তমানে একটা অভিনব বৈষ্ণবভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। এ ভাবটা সম্পূর্ণ নূতন। ইহা কোনও মতেই গতানুগতিক নহে। মধ্যযুগের মায়াবাদপ্রধান অপরাপর তত্ত্বসিদ্ধান্তের সঙ্গে আধুনিককালের প্রত্যক্ষ-প্রধান তত্ত্বসিদ্ধান্তাদি যেমন অনেক ভিন্ন, মধ্যযুগের বৈষ্ণবভাব ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত হইতে, বর্ত্তমানে যে বৈষ্ণবভাব আমাদিগের চিত্তকে অধিকার করিতেছে, তাহাও সেইরূপ বিভিন্ন। এই কথাটা ভুলিয়া গেলে এই নববৈষ্ণবভাবের মর্ম্মগ্রহণ বা মর্য্যাদাবোধ অসম্ভব হইবে।

ইংরাজি পড়িয়া, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া, আমাদের অন্তরে পুরুষানুক্রমাগত বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রভাবটা স্বল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষেরা সংসারকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমাদের পক্ষে সে চক্ষে দেখা অসম্ভব হইল। তাঁরা সমাজানুগত্যকে ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ।
তথাপি লৌকিকাচারঃ মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥

যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষম হইলেও, কোনও মতেই লৌকিকাচারকে উলঙ্ঘন করিবেন না, ইহাই তাঁদের সংসারধর্ম্মের মূলকথা ছিল। সন্ন্যাসীরাও এ উপদেশকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস পাইতেন না। ইংরাজি পড়িয়া আমরা সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিলাম। আমাদের পুরাতন আদর্শ মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে বিষয়বিমুখ করিতে চাহিত। লোকে কতকটা চোরের মতনই এ জগতের রূপরসাদি সম্ভোগ করিত। মানুষের মনকে শাস্ত্র দিয়া, তার কর্ম্মকে আচার-বিচার দিয়া, তার ধর্ম্মকে বাহ্যক্রিয়াকলাপ দিয়া, তার ভক্তিকে কল্পনা দিয়া, —এইরূপে শত বন্ধনে আমাদের মধ্যযুগের সাধনা আমাদিগকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। ইংরাজি শিক্ষা এসকল বাঁধন কাটিয়া দিল। কিন্তু এই নূতন বিদ্রোহে আমরা ঘরের বাহির হইলাম মাত্র, পথেরও সন্ধান পাইলাম না, আর কোথায় যে যাইব তারও ঠিকানা হইল না। ক্রমে সেই সন্ধান পাইয়াই এই অভিনব বৈষ্ণবভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদেশীয় শাস্ত্র-সাহিত্য যে বস্তুর আভাসমাত্র দিয়াছিল কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে নাই, এখানে তারই প্রত্যক্ষ-লাভ করিলাম। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনা যে রসের আস্বাদনমাত্র দিয়াছিল, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা কোথায় ও পরিণাম কি, ইহা বলিতে পারে নাই, আমাদের বৈষ্ণব সাধনায় তার সেই প্রতিষ্ঠা ও পরিণতির নির্দ্দেশ পাইলাম। এইরূপে ইংরাজি শিক্ষার আশ্রয়ে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার প্রেরণাতেই, বিদেশীয় ভাব ও আদর্শ আমাদের চিত্তে যে সকল দুরূহ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিয়াছিল, তারই মীমাংসার সন্ধানে যাইয়া আমরা এই বৈষ্ণবতত্ত্বের ও বৈষ্ণব-সাধনার খোঁজ পাইয়াছি। য়ুরোপীয় সাধনা সত্যের একটা দিক দেখাইয়াছিল, আমরা সেই দিকটাকেই সকল দিক ভাবিয়া তারই পানে ছুটিয়াছিলাম। ক্রমে সে দিকে সকল প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব দেখিয়া, তার অন্য দিকের অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আমাদের নিজেদের যে সাধনাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, তারই মধ্যে সেই সত্যেরই অপর দিক দেখিতে পাইলাম। এইজন্য আমরা আজ যে বৈষ্ণব-আদর্শের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা মধ্যযুগের আদর্শ অপেক্ষা পূর্ণতর। বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনা আমাদের চিত্তে যে লোভমাত্র জাগাইয়াছে, কিন্তু তার পরিতৃপ্তির পথ নিজেও জানে না, আমাদিগকেও দেখাইতে পারে নাই,

আমাদের প্রাচীন সাধক ও সিদ্ধপুরুষ এবং বর্ত্তমান যোগী ও ভক্তদিগের উপদেশে ও চরিত্রে সেই পথের আভাস পাইয়া আমরা এই নূতন বৈষ্ণবভাবের অনুরাগী হইয়াছি। কেবল ইংরাজি পড়িয়া এ বস্তু পাইতাম না। ইংরাজি না পড়িয়াও পাইতাম না। কেবল স্বদেশের সাধুসন্তদিকে দেখিয়া ইহার মর্ম্ম বুঝিতাম না। ইঁহাদেরে না দেখিয়াও বুঝিতাম না। ইংরাজি পড়িয়া, য়ুরোপীয় সাধনার উদ্দীপনা পাইয়া, খ্রীশীয় সাধনার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরস-বিভোর হইয়া, সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় লাভ করিয়া, এ সকল উদ্দীপনা ও আস্বাদনের প্রকৃত মূল্য ও মর্ম্ম যে কি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াই এই কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি।

শাস্ত্র এই তত্ত্বকে বাহির হইতে আনিয়া দেয় নাই। শাস্ত্র ত শব্দ। শব্দের নিজের ভিতরে তার অর্থ নাই। শব্দ ত কেবল কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি। শব্দের অর্থ শব্দে নয়, কিন্তু যে বস্তু বা ভাবকে নির্দ্দেশ করে, তাহারই মধ্যে। মা শব্দ এমন মিষ্ট, কেবল ম্+আ বলিয়া নহে, কিন্তু সুমধুর মাতৃস্নেহের স্মৃতিটা প্রাণে জাগায় বলিয়া। শব্দ চিহ্নমাত্র। বস্তুর দ্বারাই শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়। যে প্রকৃত ভক্তকে দেখে নাই, ভক্তি তার নিকটে নিরর্থক ধ্বনিমাত্র। আগে নিজের অন্তরে জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, তার পরে শ্রীগুরুর উপদেশে, চরিত্রে, বিশেষতঃ তাঁর দেহের বিবিধ সাত্বিকী বিকারের মধ্যে, সেই জিজ্ঞাসার মীমাংসার সামান্য ইঙ্গিত লাভ করিয়াছিলাম। এই ভাবেই কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি। শাস্ত্র এই তত্ত্বকে দেখায় নাই। গুরুকৃপায় অন্তরে স্বতঃস্ফূরিত তত্ত্বকে শাস্ত্রালোচনা একটু আধটু বিশদ করিয়াছে মাত্র। শাস্ত্র যেমন এই অন্তরের অনুভূতিকে পরিস্ফুট করিয়াছে, এই অনুভূতিও সেইরূপ শাস্ত্রের সত্য অর্থকে বিশদ করিয়া তুলিয়াছে। এই অনুভূতির বহিঃ-প্রামাণ্য ঐ শাস্ত্র। ঐ শাস্ত্রের শব্দরাশির সত্য অভিধান এই অনুভূতি। আর এই অনুভূতি ও ঐ শাস্ত্র উভয়কে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ধরিয়া

আছেন যিনি, তিনিই সদ্‌গুরু। একদিকে তিনিই "চৈত্য"রূপে অন্তরের অনুভূতিকে জাগাইতেছেন, অন্য দিকে তিনিই "মোহান্ত"রূপে নিজের প্রত্যক্ষ সাধনাভিজ্ঞতার দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া, তার ভিতরকার নিগূঢ় সত্যকে বাহিরের কল্পিত সত্যাভাস হইতে পৃথক করিয়া দিতেছেন। এই ভাবেই এ তত্ত্বের খোঁজ পাইয়াছি।

এই আলোচনার প্রথমেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব ও কৃষ্ণ-চরিত্র যে ঠিক একই কথা নহে, এটা বলিয়া রাখা আবশ্যক। কৃষ্ণ-চরিত্রের আলোচনার জন্য শাস্ত্রানুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজন। যে শ্রীকৃষ্ণের চরিত-কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন; "প্রচার" ও "নবজীবনের" যুগের হিন্দু-পুনরুত্থান যে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে গিয়াছিল; ব্রহ্মসমাজের প্রচারক উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের বস্তু, ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক জীবনের রঙ্গ-ভূমিতে তিনি বিবিধ লীলা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণ-কথাতে তাঁর কীর্ত্তিগাথা পড়িতে পাওয়া যায়। সেই শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণাবতার। এই কৃষ্ণাবতারের সন্ধান মুখ্যভাবে পুরাণ-ইতিহাসেই কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ আর তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এক নহেন। ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের বস্তু, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ ভিতরের বস্তু। ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ কে ও কি, তাহার বিচার করিতে হইলে মুখ্যভাবে তাঁহাকে ইতিহাসেই খুঁজিতে হইবে। তিনি একটা বিশেষ যুগে অবতীর্ণ হইয়া কতকগুলি বিশেষ কর্ম্ম-সাধন ও বিশেষ লীলা-প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অবতার মানিলেও যিনি বিশেষ যুগে অবতীর্ণ হন, সেই যুগের পূর্ব্বেও তিনি অবশ্যই ছিলেন, ইহাও মানিতে হয়। না মানিলে, তাঁর অবতারের অর্থ এবং প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। "নাসতঃ সজ্জায়তে"—অসৎ হইতে কখনও সতের উৎপত্তি হয় না। যিনি আবির্ভূত হইলেন তিনি আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ছিলেন, তিরোভাবের পরেও রহিয়া গেলেন এবং এখনও আছেন, ইহা না

মানিলে আবির্ভাব তিরোভাবের কোনও অর্থ হয় না। বিশিষ্ট কালে, বিশেষ দেশে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার মানিয়া লইলে,—অবতারের পূর্ব্বেও যেমন তিনি ছিলেন, পরেও সেইরূপই আছেন; অবতারের পূর্ব্বেও তিনি পূর্ণ ছিলেন, পরেও পূর্ণ আছেন; যাহা পূর্ণ তার জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় নাই, হইতে পারে না; সে বস্তু নিত্য, অনাদি, অনন্ত, দেশ-কালের একান্ত অতীত,—এই কথাটাও মানিয়া লইতে হইবে। এই বস্তুর সন্ধান কেবল ইতিহাস দিতে পারে না। অন্তরে, আপনার চৈতন্যের মূলে, এ নিত্য বস্তুর সন্ধান না পাইলে, তার ঐতিহাসিক আবির্ভাব বা প্রকাশেরও মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের আলোচনা করিতে হইলে, বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রের প্রামাণ্য কতটা ও অপ্রামাণ্য কি, ইহার বিচার করা আবশ্যক হয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের তথ্য নির্ণয়ের জন্য মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সন্ধানে ইহা একেবারেই অনাবশ্যক। এখানে ইতিহাসের কথা শুনিয়া ফল নাই। তত্ত্বজ্ঞ, সত্যদর্শী, সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের অন্তর্জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সাক্ষ্যই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুর প্রধান আশ্রয় ও সহায়। কারণ এই তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে নাই, ভিতরে। এই বস্তু নিত্য প্রকট ও নিত্যই অপ্রকট। এই কৃষ্ণলীলা নিত্যলীলা। রাধা, কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, সকলি এখানে নিত্য বস্তু, তত্ত্ব-বস্তু, যুগপৎ দেশকালের অতীত এবং দেশকালে প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, কিন্তু অবতারী। সকল অবতারের ইনিই প্রকাশক, সকল অবতারের প্রতিষ্ঠা ইঁহাতে।

আর ইহাই মহাপ্রভু-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন—

অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।

আর এই স্বরূপবস্তুই অবতারী। ভাগবতে সকল অবতারের সামান্য লক্ষণ বলিয়া, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেও গণনা করিয়া,—

তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংশ॥

আর যত অবতার বলিতে এখানে কৃষ্ণাবতার পর্য্যন্ত বুঝাইতেছে। কারণ অবতার মাত্রেই জ্ঞাত, কিন্তু—

"কার অবতার এই বস্তু অজ্ঞাত।"

জ্ঞাত বা প্রকট অবতারেরা সর্ব্বদা সেই "অজ্ঞাত বস্তুকেই" নির্দ্দেশ করেন। গীতায় বিভূতিযোগের উপদেশ দিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ আপনিই অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছেন—

বৃষ্ণিনাং বাসুদেবোঽহং পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়।

বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে আমিই বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়। শ্রীকৃষ্ণের বৃষ্ণিত্ব তাঁর একাংশ মাত্র। আর বাসুদেবরূপেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর অবতার অপেক্ষা যে অনেক বড়, তিনি যে আপনার অবতারেরও অতীত, শাস্ত্র আশ্রয় করিয়াও একথা অস্বীকার করা যায় না।

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে, যেমন যার মতি॥

এই অবতারী শ্রীকৃষ্ণই তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ। এই বস্তুই প্রকৃত কৃষ্ণ-তত্ত্ব। শ্রীগুরু কৃপায় এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেরই আলোচনা করিতেছি। এই তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তথা কথিত ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কি ও কতটা, তত্ত্বালোচনা শেষ হইলেই তার আলোচনা সম্ভব। অবতারীকে না বুঝিলে, অবতারের মর্ম্ম বুঝা যায় না।

এক অর্থে অবতারের সাহায্য ব্যতীত অবতারীর জ্ঞানলাভও অসম্ভব বটে, কিন্তু সে অবতার অতীত ইতিহাসের অবতার নহেন, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ অবতার। অন্তরে যদি শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ না হন, তবে তাঁর বাহিরের অবতারের সত্যমিথ্যা, শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বুঝিব কেমন

করিয়া? তিনি দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা যদি সত্যই হয়, তথাপি দ্বাপরের কথা ত আমরা এই কলিযুগে কেবল কেতাবেই পড়িতে পারি! আর কেতাবে ত কেবল কথাই পাই, বস্তু পাই কৈ? প্রাচীন শাস্ত্রের কলকাঠি আমাদের বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতরেই আছে। এই অভিজ্ঞতার অভিধানকে আশ্রয় করিয়াই ঐ শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে হয়। দ্বাপরের কৃষ্ণাবতারের সত্য অর্থ বুঝিতে হইলে, আমাদের সম্মুখে, আমাদের নিজেদের অপরোক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে এই ঘোর কলিযুগে, এই ইংরেজ আমলের সকল প্রকারের নাস্তিক্য ও অনাচারের মাঝখানে আসিয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে। প্রাচীন অবতারে সত্যভাবে বিশ্বাস করিতে গেলে আধুনিক অবতারের প্রত্যক্ষলাভ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণাবতারের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য যেমন চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেইরূপ চৈতন্যাবতারকে বুঝিবার জন্যও, এই ১৩২১ বঙ্গাব্দে, "মোহান্ত"রূপ সেই চরিত্রের ও সেই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। ফলতঃ এই অবতার-ধারার কোনও দিন বিচ্ছেদ হয় না। যিনি অবতারী তিনিই প্রতিদিন জীবের অন্তরে "চৈত্যগুরু" ও বাহিরে সদ্‌গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া, তাহাকে সকল তত্ত্বের ও সকল রসের আস্বাদন দিতেছেন। এই প্রত্যক্ষ গুরুতত্ত্বই অবতার-তত্ত্বের কলকাঠি।

ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ অবতার—বাহিরের বস্তু। তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ অবতারী, অন্তরের নিত্য বস্তু। তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা বিদ্যমান। সর্ব্বত্র, সর্ব্বদাই তিনি আপনার লীলাতে আপনি নিমগ্ন। কেউ দেখে, কেউ দেখে না। কিন্তু আমাদের দেখা বা না দেখার উপরে তাঁর সত্তা বা সত্য নির্ভর করে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের পূর্ব্ব-কথা

জগতের প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় নাট্যের স্থান অতি উচ্চ হইলেও কালবশে এই বিশিষ্ট নাট্যকলা ও নাট্যচর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রীসে যেরূপ দায়োনিসাস্ দেবের উৎসব উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ দেবদেবীর পূজা ও উৎসবাদিতেই প্রথম নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয়। বৈদিক সাহিত্যের সংবাদগুলি কথোপকথনাকারে গ্রথিত দেখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকগণ অনুমান করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে ঐ কথোপকথনগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইত। ইহাই ভারতীয় নাট্যের অতি প্রাচীন রূপ। ভারতীয় নাটকের এই সূচনা হইতে কালক্রমে যে নাট্য-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা জগতের অন্য সমস্ত নাট্যসাহিত্য হইতে বিশিষ্ট। কিন্তু ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি নাট্যকারের রচনা অমর হইলেও তাঁহাদের নাট্যনিচয় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য না হওয়াতে কালক্রমে ইহাদের জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রাচীনকালে রাজসভায় বা দেবোৎসবাদিতে অভিনীত নাটকগুলি রচনানৈপুণ্যে মনোহর হইলেও সাধারণ দর্শক তাহাদের সম্যক্ রসগ্রহণ করিতে পারিত না। বিদূষক প্রভৃতি পাত্রের ও রমণীগণের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথনগুলি সাধারণ দর্শকের বোধগম্য হইলেও সংস্কৃত নাটকাবলীর অনুপম শ্লোকসমূহ তাহারা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিত না। প্রাকৃতভাষাবহুল নাটকগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইত বটে, কিন্তু কথিত ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের ভাষার পরিবর্ত্তন হইল না। আলঙ্কারিকগণ নাট্য-সাহিত্যকে কঠিন নিয়ম-পাশে বাঁধিয়া দিলেন। পরবর্ত্তী সকল নাটকরচয়িতাকেই এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বিচরণ করিতে হইয়াছিল। কাজেই নাটকগুলি বৈচিত্র্য হারাইয়া, অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম

মানিতে গিয়া, কৃত্রিমতাপূর্ণ হইয়া পড়িল ও কালক্রমে তাহাদের ভাষা কথিত ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়া গেল। সাধারণের মনের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত নাটকগুলি অন্ততঃ শিক্ষিত নৃপতি, অমাত্য, পারিষদ ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর আমোদস্পৃহা চরিতার্থ করিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত-ভাষার প্রচার বন্ধ হইয়া আসিলে, সংস্কৃত নাটকও ক্বচিৎ রচিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রাচীন ভারতের নাটকগুলি সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইতে না পরিয়া প্রাচীন আকার ও নিয়মসকলকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া, সাধারণের সহানুভূতি হারাইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সংস্কৃত ভাণ, প্রহসন প্রভৃতি নাট্যে সাধারণের মনোরঞ্জনের প্রয়াস লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এ প্রয়াস সফল হয় নাই। কাজেই সংস্কৃত নাট্যাভিনয় কেবল বিশেষ বিশেষ উৎসবের অঙ্গরূপেই বহু-কাল জীবিত ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ-পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিবৃত রাজারাই এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। অনেকগুলি নাটকের প্রস্তাবনা হইতেই এই কথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কালক্রমে এই শ্রেণীর রাজগণও বিরল হইয়া আসিলেন। ভারতে মুসলমান-প্রভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুর নাট্যকলা একরূপ নষ্ট হইয়া গেল। কারণ মুসলমান শাসকগণ তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নাট্যাভিনয় নিষিদ্ধ বলিয়া নাট্যচর্চ্চায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ দান করিতেন না। মুসলমান-প্রভুত্ব-কালেও ভার-তের স্বাধীন হিন্দু নৃপতির অধিকারে মধ্যে মধ্যে নাটক অভিনীত হইত বটে; কিন্তু প্রাচীন আদর্শে গঠিত ও সাধারণের দুর্ব্বোধ্য-ভাষায় রচিত বলিয়া এগুলি সর্ব্বজন-সমাদৃত হয় নাই।

বঙ্গদেশে যে সকল প্রাচীন নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ, জয়দেব, রূপগোস্বামী ও কর্ণপূরের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদিশূরের সমসাময়িক ভট্টনারায়ণ বীররস-প্রধান "বেণীসংহার", জয়দেব "প্রসন্নরাঘব," রূপগোস্বামী "বিদগ্ধমাধব",

"ললিতমাধব" এবং কর্ণপূর "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত "জগন্নাথবল্লভ" প্রভৃতি নাটকও বাঙ্গালার বৈষ্ণবযুগে (১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে) রচিত হয়। ভট্টনারায়ণ ব্যতীত আর সকল নাট্যকারই বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজ পার্ষদ-সঙ্গে সাধারণের সমক্ষে কৃষ্ণলীলার ভাবাভিনয় প্রদর্শন করিতেন। তাহাতেই বৈষ্ণবধর্ম্মে সংস্কৃত নাটকের রচনা আদৃত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের শিষ্য রূপগোস্বামী তাই রাধাকৃষ্ণপ্রেমময় 'বিদগ্ধ-মাধব' ও 'ললিতমাধব' নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কর্ণপূরও তাই চৈতন্য-দেবের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু এ নাটকগুলি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত রীতিতে রচিত। কাজেই এ গুলিও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু সেগুলি অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হয় না। যাহারা সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই-একজন সংস্কৃত-রীতি অবলম্বন করিবারই খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই রীতি সর্ব্বসাধারণের প্রিয় না হওয়ায় সেই অবধি বাঙ্গালা নাটকে ইহা চিরপরিত্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা নাটক সংস্কৃত নাট-কের বিশিষ্ট রীতি ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে।

বাঙ্গালা নাটকে এই পাশ্চাত্য রীতির প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নহে। কারণ, সংস্কৃত নাটকগুলি যখন বিরলপ্রচার হইয়া আসিল তখন জনসাধারণ প্রথমে যে নাট্যরসের আস্বাদ পাইল, তাহা পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আনীত ও তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। ইংরাজেরা কলিকাতায় নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্য The Play House নামক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় নিয়মিতরূপে অভিনয় হইত। সাধারণ বাঙ্গালীর তখন রঙ্গালয় বা নাট্যাভিনয়

সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অভিজ্ঞতা ছিল না। ভরতপ্রণীত প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে আমরা "নাট্যমণ্ডপ", রঙ্গপীঠ (stage), প্রেক্ষকপরিষৎ (Auditorium), যবনিকা প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা পাই বটে এবং প্রাচীন ভারতে যে নাট্যাভিনয়ের জন্য রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজের আমলের প্রথমে বাঙ্গালী সে সকল কিছুই জানিত না। অন্যান্য কলাবিদ্যার ন্যায় নাট্যকলাও দেশে লোপ পাইয়াছিল। তাই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে 'Calcutta Theatre'এ যখন Comedy of Beaux Stratagem, Comedy of Foundling, School for Scandal, Mahomet, প্রভৃতি নাটক ও Like Master like man, Citizen প্রভৃতি প্রহসন অভিনীত হইতে লাগিল, তখন বাঙ্গালী এক নূতন জিনিষ দেখিল। বাঙ্গালীর তখন থাকিবার মধ্যে ছিল এক যাত্রা। পশ্চিমাঞ্চলে এখনও রামলীলা প্রভৃতি উৎসবে, বা বিশেষ বিশেষ পূজাদিতে, দেব-দেবীর বেশে সজ্জিত অভিনেতারা যেরূপ দেবতার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, সমগ্র ভারতে অল্পবিস্তর এই শ্রেণীর অভিনয়ই প্রচারিত ছিল। রঙ্গপীঠ (Stage) বা প্রেক্ষক-পরিষৎ (Auditorium)-যুক্ত কোনও রঙ্গালয়ের অস্তিত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।* বাঙ্গালীর যাত্রাও এইরূপ রঙ্গপীঠ ও দৃশ্যপটাদির সাহায্যব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হইত। ১৮২১ সালে "কলি রাজার যাত্রা" অভিনীত হইয়াছিল, এই বার্ত্তা "সংবাদ-কৌমুদী" নামক পত্রিকাতে পাওয়া যায়।† সঙ্গীতের আদর বাঙ্গালী খুবই

* রামগড় পর্ব্বতে একটি গুহা কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন ভারতের স্থায়ী রঙ্গালয়ের উদাহরণ। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহরূপে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (Archaelogical Annual, Vol. II ও প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২১, ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য,)

† "A new drama called *Kali Raja's Jatra* is being performed."—Calcutta Review. Vol. XIII. P. 160

করিত। সেকালে ঢপ, কীর্ত্তন প্রভৃতি বহুল পরিমাণে আদৃত ছিল। কাজেই সে কালের যাত্রাতে কথোপকথন অপেক্ষা গীতের সংখ্যাই অধিক থাকিত। কৃষ্ণকমল গোস্বামী নবদ্বীপে "নিমাইসন্ন্যাস" ও ঢাকায় "স্বপ্নবিলাস," "রাইউন্মাদিনী," "বিচিত্রবিলাস", "ভরতমিলন", "সুবল-সংবাদ" প্রভৃতি যাত্রার পালা রচনা করিয়া ও তাহাদের অভিনয় করাইয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু যাত্রা অধিকদিন ধরিয়া বাঙ্গালীকে তৃপ্ত করিতে পারিল না। ইংরাজদের রঙ্গালয়ে ইংরাজী অভিনয় দর্শনে ও ইংরাজী নাটক পাঠে ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী নূতন ধরণের নাট্যরস আস্বাদন করিতে লালায়িত হইলেন। কিন্তু তখন ইংরাজী নাটকের ন্যায় কোন গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ছিল না। তাই সর্ব্বপ্রথমে যখন বাঙ্গালীর মনে নাট্যানুরাগ সমুদিত হইল তখন তাঁহারা ইংরাজী নাটকই অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে হোরেস হে'ম্যান উইলসন্ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত "উত্তর-রাম-চরিতের" অভিনয় হয়। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের অভিনয়ে দর্শকগণ তৃপ্ত হইবেননা ভাবিয়া, ইঁহারা "উত্তর-রাম-চরিতের" অভিনয়ের পরেই সেক্ষপীয়রের "জুলিয়াস্ সীজার" নাটকের শেষাঙ্ক অভিনয় করেন। পরে এই অভিনেতাগণ জাফর-গুল্‌নেয়ারসম্পর্কিত কোনও দৃশ্যকাব্য অভিনয় করেন, এই কথাও শুনা যায়; কিন্তু ইহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এই সময় কলিকাতায় সাঁস্থঁসি (Sans Soci) নামক ইংরাজী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হে'ম্যান্ উইল্‌সন্ (Wilson), ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ষ্টকুলার (Stocquler) বোর্ডের সেক্রেটারি টরেন্‌স (Torrens) এবং কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট হিউম (Hume) প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই নাট্যশালায় অভিনয় করিতেন।"*

* যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেলের জীবনী, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

তৎকালীন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি, এল্ রিচার্ডসন সাহেব অতিশয় নাট্যানুরাগী ছিলেন ও তিনি ছাত্রদিগকে এই নাট্যশালার অভিনয় দেখিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। এই প্রকারে অধ্যাপকের উৎসাহে ও ইংরাজী নাট্যশালার অভিনয় দেখিয়া ছাত্রগণ বিশেষভাবে নাট্যানুরাগী হইয়া পড়ে ও White Houseএ নিম্নলিখিত নাট্যসকল অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়,—Merchant of Venice, The King and the Miller, Topsy Tosspot, Lodgings for Single Agent. The Dramatic Aspirant ইত্যাদি। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের অভিনয় দেখিয়া Oriental Seminaryর ছাত্রগণও উৎসাহিত হইয়া উঠে ও Julius Caesar-এর মহলা দিতে থাকে। কিন্তু নানা কারণে ইহারা উক্ত নাটকের অভিনয় করিতে পারে নাই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মেট্রপলিটান একাডেমির ছাত্রগণ জুলিয়াস্ সীজার অভিনয় করে। ইহার কিছুকাল পরে Oriental Seminaryর কতিপয় ভূতপূর্ব্ব ছাত্র সেক্ষপীয়রের Othello, Merchant of Venice, ও Henry IV, এবং Amateurs নামক একখানি নাটক অভিনয় করে। এই সমস্ত ইংরাজী নাট্যাভিনয়ই সর্ব্বপ্রথমে সাধারণের নাট্যানুরাগ উৎপাদন করে ও বাঙ্গলা নাটক রচনায় লেখকগণকে প্রবর্ত্তিত করে। রায়-গুণাকর ভরতচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা নাটকে বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। ভারতচন্দ্র বাঙ্গলা নাটক রচনা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে "চণ্ডী" নামক যে নাটকখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দী, পারসী ও সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলা ভাষাও ব্যবহার করিয়াছিলেন। "চণ্ডী" নাটক সংস্কৃত-রীতিতে রচিত। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় ভারতচন্দ্র ইহাতে নান্দী, সূত্রধার ও নটীর অবতারণা করিয়া প্রস্তাবনায় নিজের ও তাঁহার প্রতিপালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকে পাত্র-পাত্রী বিশেষ প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় কথাবার্ত্তা

কহিতেন। এই প্রমাণেই বোধ হয় ভারতচন্দ্র চণ্ডীনাটকে বাঙ্গলা, হিন্দী ও পারসী ভাষা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত যে অংশটুকুমাত্র ভারতচন্দ্র লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহা হইতে বোধ হয় যে, নাটকখানি সম্পূর্ণ হইলে এক অদ্ভুত জিনিষ হইত। বহুবিধ ভাষার এরূপ একত্রসমাবেশের উদাহরণ অত্যন্ত বিরল।

চণ্ডী নাটক।

[সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ]

সংগায়ন্ যদশেষ কৌতুককথাঃ পঞ্চাননো পঞ্চভি-
র্বক্তৈ-র্বাহুবিশালকৈর্ডমরুকোত্থানৈশ্চ সংনৃত্যতি।
যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা তালং বিধাতুং গতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে॥

[নটীর উক্তি]

শুন শুন ঠাকুর	নৃত্য বিশারদ	সভাসদ সারি চতুরী।
নূতন নাটক	নূতন কবিকৃত	হাম তোঁহি নূতন নারী॥
কায়সে বাতায়ব	ভাব ভবানীকো	ভীতি ভৈঁ মুঝে ভারি।
দানব-দলনে	ধরণী-মণ্ডলে	তারিণী লে অবতারি॥
গুরুসম ধীর	বীরসম শুনহ	সম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ	রাজ-শিরোমণি	ভারতচন্দ্র বিচারি॥

[সূত্রধারের উক্তি]

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতী রুদ্রোঽ ভবদ্রাঘব—
স্তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান্।
তৎপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণী—
স্তৎপুত্রোঽয়মশেষধীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নৃপঃ॥
ভূপস্যাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণো।
ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসমো যত্তাত আসীন্নৃপঃ।

রাজ্যাদ্ ভ্রষ্ট ইহাগতঃ স নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে ॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্ররায়কবয়ে কাব্যাম্বুরাশীন্দবে।
ভাষাশ্লোককবিত্বগীতমিলিতং যত্তেন সম্বর্দ্ধিতম্ ॥

[চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন]

খট্‌মট্ খট্‌মট্ খুরোত্থ-ধ্বনিকৃত-জগতী-কর্ণপুরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাসানিলচলদচলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্ সপ্ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্ত্যো
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ ॥
ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড় গড় চৌঘড়ী ঘোরগর্জ্জৈঃ
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ শঙ্খৈর্ঘন ঘন ঘন বাজে চ মন্দীরনাদৈঃ।
ভেরী তূরী দামামাদগড়দড়মসা স্তব্ধ নিস্তব্ধ দেবৈঃ
দৈত্যোঽহং সৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভূব ॥

[মহিষাসুরের উক্তি]

ভাগেগা দেবদেবী পাথর পাথর ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকো রীত দেনা যমঘর যমকো আগকো অগলাগে ॥
বায়োঁকো রোধ করকে করত বরণকো সব তুগো অব মাগে
ব্রহ্মা সোঁ বাঁহুকি সোঁ কতি নেহি ঝগড়ো জৌঠ কুবেরা না ভাগে ॥

[প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি]

শোন্ রে গোঁয়ার লোগ্, ছোড় দে উপাস্ যোগ্, মানহু আনন্দ ভোগ,
ভৈরাজ যোগমে।
আগমে লাগাও ঘিউ, কাহেকো জ্বালাও জিউ, এক রোজ প্যার পিউ,
ভোগ এহি লোগমে ॥
আপকো লাগাও ভোগ, কামকো জাগাও যোগ, ছোড় দেও যাগ যোগ,
মোক্ষ এহি লোগমে।
ক্যা এগান্ ক্যা বেগান, অর্থ নার আব জান, এহি ধ্যান এহি জ্ঞান,
আর সর্ব্ব রোগমে ॥

[এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ, প্রথমে হাস্য করিলেন]

কমঠ কঃটট ফণিফণা ফলটট দিগ্‌গজ উলটট ঝগটট ভ্যায়রে
বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত জলনিধি ঝম্পত বাড়বমর রে ॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত রবিরথ টুটত ঘন ঘন ছুটত যেণ্ড পরলয়রে।
বিজলী চট চট ঘর ঘর ঘট ঘট অটঅটঅটঅট আঃক্যায়া হ্যায়রে ॥

অসম্পূর্ণ।

এই অসমাপ্ত নাট্যখানি ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রতি ভারতচন্দ্রের আত্যন্তিক অনুরাগের পরিচয় দিতেছে। সূত্রধার-কথিত সংস্কৃত শ্লোকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উর্দ্ধতন চারি পুরুষের নাম, ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে (ভূরসুট) ভারতচন্দ্রের পিতার রাজত্ব, পরে তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভারতচন্দ্রের আগমন ও বাসার্থ ভারতচন্দ্রের মূলাযোড় গ্রাম প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। নাটকে বাঙ্গলা ভাষার প্রয়োগ এই বোধ হয় প্রথম। কিন্তু 'চণ্ডী' নাটক বাঙ্গলা নাটক নয় বলিয়া ইহাকে বাঙ্গলা নাটকের মধ্যে ধরিতে পারা যায় না।

সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা নাটক প্রণীত হইলেই যে তাহার অভিনয় হইয়াছিল, তাহা নহে। আমরা প্রাচীন নাটক-নামধারী মুদ্রিত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে করিতে কলিকাতাস্থ ইউনাইটেড্ রিডিং রুম্‌স্ নামক পুস্তকাগারে "প্রেম নাটক" ও "রমণী নাটক" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "বাঙ্গলার আদি-নাটকের নাম প্রেম নাটক। কলিকাতা শ্যামপুকুরনিবাসী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রণেতা"। আমরা যে প্রেম নাটক ও রমণী নাটকের উল্লেখ করিলাম তাহা পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত বটে ; কিন্তু নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইহার একখানিও তাহা নয়। উভয় গ্রন্থের নামের সহিত 'নাটক' শব্দ আছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ গ্রন্থ দুইখানি কাব্য,—পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। রচনার নমুনা গ্রন্থকারের নিম্নোদ্ধৃত আত্মপরিচয় হইতেই বুঝা যাইবে ;—

"যশোর জেলায় ধাম, দ্বিজ রামতনু নাম
কমলাপুর গ্রামে নিকেতন।
সাগরদহ বন্দ্যঘাটী কুলাংশেতে বড় খাঁটি
তাঁহার তনয় পঞ্চানন॥"

[রমণী নাটক, ৯ম পৃষ্ঠা]

গ্রন্থ দুইখানি অতি জঘন্যরুচির পরিচায়ক কাব্য। পাত্রপাত্রী নাই। কথোপকথন-রীতিতেও লিখিত নহে। "কামিনীকুমার" প্রভৃতি যে সকল কদর্য্য পুস্তক ঐ সময়ে প্রকাশিত হইত, এ দুইখানিও সেই ধরণের। উভয় গ্রন্থের মলাট হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে পাঠক নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিবেন যে এগুলি নাটক নহে। দীনেশবাবু ইহাদের নামমাত্র শুনিয়া সম্ভবতঃ এই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন।

"রমণী নাটক নামক গ্রন্থ।

কলিকাতা শ্যামপুকুরিণীনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সুসাধু সরল বঙ্গভাষায় পয়ারাদি বিবিধ প্রকার অভিনব ছন্দে দিব্য দিব্য নব্য কাব্য সহিত বিরচিত.....সন ১২৫৪ সাল, শকাব্দাঃ ১৭৬৯, ইং ১৮৪৮ সাল।"

'রমণী নাটকে'র পর 'প্রেম নাটক' প্রকাশিত হয়। ইহার মলাটে আছে :—

"প্রেম নাটক।

অর্থাৎ নায়কনায়িকাঘটিত আদিরসবর্ণন গ্রন্থ পঞ্চানন কর্ত্তৃক বিরচিত..... সন ১২৬০ সাল।"

এখন একটা কথা হইতে পারে যে পঞ্চানন এই দুইখানি গ্রন্থের নামের সহিত 'নাটক' কথাটি ব্যবহার করিলেন কেন? পঞ্চানন সংস্কৃত বা ইংরাজী কোনও নাটক পড়িয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ নাই। সুতরাং নাটক কাহাকে বলে, এবিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা

ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বে আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে সকল সংস্কৃত নাটকের কথা বলিয়াছি, সেগুলির বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল। যদুনন্দন দাস রূপগোস্বামীর "বিদগ্ধমাধব" ও "ললিতমাধবে"র, প্রেমদাস "চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে"র ও লোচনদাস "জগন্নাথবল্লভে"র বঙ্গানুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলি পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনসমন্বিত অবিকল বঙ্গানুবাদ নহে। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কাব্যাকারেই নাটকগুলি অনূদিত হইয়াছিল, অথচ অনুবাদকগণ নামকরণের সময় 'নাটক' নাম বজায় রাখিয়াছিলেন। পঞ্চানন এই কাব্যাকারে অনুবাদিত নাটক দেখিয়া নাটকের লক্ষণ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন ও পয়ারাদি ছন্দে লিখিত কাব্যকেও নাটক বলিতে পারা যায়,—এই বিশ্বাসে নিজের "রমণী" ও "প্রেম" নামক 'কাব্য' দুইখানির 'নাটক' নাম দিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ দুইখানি গ্রন্থ যখন নাটকই নহে, তখন ইহাদের সম্বন্ধে অধিক আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

বিশ্ব-দর্পণে

কিবা স্বচ্ছ নিরমল এ মায়া-মুকুর,
যাহাতে বিম্বিত তব মুরতি মধুর!
উহারে স্বতন্ত্র করে লইব কি করি,
চূর্ণিয়া ফেলিলে শিস যাবে অপসরি।
তাই মুকুরে বিম্বিত ছবি, মুকুরে ধরিয়া,
হৃদয়-মুকুর মাঝে রেখেছি ভরিয়া।
শাস্ত্র-শস্ত্র লয়ে ওগো এস না এখানে
মিথ্যারে করিতে সত্য সহস্র বাখানে।
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যেই শক্তি মূল,
শাদ্বলে, প্রস্তরে, জলে, সেই শক্তি স্থূল
রয়েছে স্তম্ভিত ভাবে;—তাই কি তোমার
মানব, 'মানব' বলে এত অহঙ্কার!
এই যা রয়েছে মোর সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া,
উদ্ভিদে, চেতনে, জড়ে, নিখিল ব্যাপিয়া—
প্রাণ কি চেতনা কিবা কি আখ্যা না জানি,
একই আবেগে পূর্ণ সমগ্র মেদিনী।
তবে এর মাঝে কই—কোথা সেই আকর্ষণ,
যাহে একেতে বুঝিতে পারে অন্যের বেদন?
এক সূত্রে শত মুক্তা রহিয়াছে গাঁথা,
কেহ কারে নাহি চিনে—আশ্চর্য্য বারতা,
কত দিন রবে সুপ্ত—গুপ্ত এ মিলন,
কার ভেরী-রবে কবে হবে উদ্বোধন!

শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

নারায়ণ

সুরেন্দ্র ফ্রী লাইব্রেরী
প্রতিষ্ঠাতা—
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

মাঘ
সন ১৩২১।

সম্পাদক-
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বিজ্ঞাপনাদি—নারায়ণে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার নিয়মাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকটে চিঠি লিখিলে বা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া কথা কহিলেই জানিতে পারা যাইবে।

প্রবন্ধাদি—নারায়ণে কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন, আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।

নারায়ণ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। এজন্য লেখকগণ তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।

চিঠিপত্র—সম্পাদকের নামীয় পত্রাদি ও নারায়ণে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে—৪৮নং রসারোড, (সাউথ) কালীঘাট কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

চাঁদার টাকা ও অন্যান্য বিষয়ের যাবতীয় চিঠিপত্রাদি নারায়ণের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় নারায়ণ কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র হালদার,
"নারায়ণ" কার্য্যাধ্যক্ষ।

নারায়ণ কার্য্যালয়, ২০৮।২। ডি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা

মাঘ, ১৩২১ সাল।

সূচী পত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। রাসলীলা (কবিতা) ...	শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী	২১২
২। সেকালের স্মৃতি (বঙ্কিমচন্দ্র)	শ্রীসুরেশ সমাজপতি	২১৫
৩। ভাষার কথা ...	শ্রীমন্মথনাথ বসু ...	২২৬
৪। চির-কিশোর (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায় ...	২৩২
৫। পৌরাণিকী কথা ...	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৩
৬। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ...	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২৪৪
৭। দান (কবিতা) ...	শ্রীমতীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	২৪৯
৮। মাঝে থাকা ...	শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তা	২৫০
৯। কল্যাণী (গল্প) ...	শ্রীহরিদাস ভারতী	২৫৯
১০। প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক ...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল	২৮৩
১১। বিরহে ...	শ্রীসুধীররঞ্জন দাস	২৯২
১২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	২৯৩

কার্য্যালয়—২০৮।২। ডি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷৹ টাকা।
এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵ আনা, ডাক মাশুল /৹ আনা।

নারায়ণ

১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা] [মাঘ, ১৩২১ সাল

রাসলীলা

১

ব্রজের মধুর রস যমুনার রূপ ধরি'
আজি কিবা বহি' যায় তর তর তর করি' !
প্রেমের পরশ আজি অতনু মলয় রূপে
নিকুঞ্জ-হৃদয়ে পশি' ঢালে মধু চুপে চুপে।
উথলি মধুর রসে কুসুমের মৃদু হিয়া
সৌরভের বেদনায় উঠিতেছে শিহরিয়া।
বিথারিছে উন্মাদনা কদম্বের নব দল,
দিশি দিশি ছুটিতেছে মল্লিকার পরিমল।
মাধবীর আলিঙ্গনে চূত-হৃদি মুকুলিত,
অকাল বসন্তোদয়ে বৃন্দাবন পুলকিত।
ধরণীর তপ্ত বুকে চন্দ্রিকা পড়িছে ঝরি'
প্রেমিকার প্রাণখানি আনন্দে উঠিছে ভরি'।
আকাশে অযুত তারা একটি নয়ন মত
পূর্ণিমার শশী-মুখে চেয়ে আছে মন্ত্র-হত।

২

বিভোরা বঁধুর প্রেমে চঞ্চল চরণে রাই
লুটায়ে অঞ্চলখানি পশিল সঙ্কেত-ঠাঁই।

ফুলময় তমুখানি প্রেম ভরে পড়ে ঢলি',
বঁধু-মুখ-সোঙরণে পুলকাশ্রু পড়ে গলি'।
সহসা অপূর্ব্ব ভাব অন্তরে উদিল তার,
বহু স্বাদ বঁধুয়ারে দিতে চাহে বার বার!
সকল সখীরে ডাকি' রাস-মঞ্চ বিরচিল,
আপনার হিয়াখানি সবারে বাঁটিয়া দিল।
অজ্ঞাতে সবার প্রাণে আকুল বাসনা জাগে,
রাধার হৃদয়-চাঁদে বাঞ্ছে সবে অনুরাগে।
যুগল-মিলন লাগি' আকুলা আছিল যা'রা,
শ্যামেরে ধরিতে হৃদে আজি পাগলিনী তারা!—
রাধার মনের ভাব অন্তরে জানিল বঁধু,
সহসা পারশে শ্যাম হেরে প্রতি ব্রজ-বধূ!

৩

উতল বিভল হিয়া যতেক আভীরবালা
ভুলি' লাজ হের ধায় জুড়াতে হৃদয়-জ্বালা।
বঁধুরে হৃদয়ে নিয়া কেহ করে আলিঙ্গন,
নয়ন মুদিয়া কেহ করে রূপ দরশন।
অঙ্গের পরশে কার এলাইয়া পড়ে দেহ,
চুম্বন করিতে গিয়া চেতনা হারায় কেহ!
কেহ বা গায়তে গান আপনা পাশরি যায়,
প্রেমে গদ গদ কণ্ঠ, অস্ফুট কূজন তায়।
আনন্দে নাচিতে গিয়া বিহ্বল চরণ কার
তাল মান লয় ভুলি' তিলেক না উঠে আর!
শ্যামের বাঁশরী কাড়ি' কেহ তায় পূরে তান,
'শ্যাম-শ্যাম-শ্যাম' নাম ফুটে তাহে অবিরাম।

প্রেমে ডগমগ দেহ, নীরে অন্ধ আঁখি দুটি,
বঁধুরে ধরিতে বুকে চরণে পড়িছে লুটি'!

৪

দূর হ'তে দেখি' রাধা প্রেমানন্দে পুলকিত,
সে রাস-মণ্ডপ-ধূলি মাখে অঙ্গে বিমোহিত!
বহু স্বাদ বিনোদিনী বঁধুয়ারে দিল আজ,
একের পিরীতি বঁধু ভুঞ্জিল সবার মাঝ।
আজি রাই বিশ্বময় আপনারে করি' দান
বহুর ভিতরে এক বঁধুরে করিল পান!
এক শশী কুমুদিনী, এক বঁধু বিনোদিনী,
রসের লহরে আজি বহুরূপ বিকাশিনী!

* * * *

অকস্মাৎ সে সম্মোহ টুটি' গেল স্বপ্ন সম,
নিদ্রোত্থিত গোপীকুল অবিদিত অনুপম
সুখাবেশে আলুথালু অলস-অবশ-কায়
খুঁজিতে লাগিল সবে ত্রস্তে শ্যাম রাধিকায়।
কোথা না পাইয়া শেষে নয়ন মুদিল সবে,—
মিলিত যুগলরূপ মরমে ফুটিল তবে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সেকালের স্মৃতি।—বাজে কথা

১। বঙ্কিমচন্দ্র

তাহার পর পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনের কথা এখনও আমার মনে পড়ে। দুঃখের দিনেও মনে পড়ে, সুখের দিনেও মনে পড়ে। কুচিন্তা যখন উভয়কেই গ্রাস করে, তখনও মনে পড়ে; দুর্ব্বহ জীবনকে বহনীয় ও সহনীয় করে।

জীবনের স্মরণীয় দিনগুলির পর্য্যায়ে আনন্দময় পর্ব্বাহের মত আমার স্মৃতিপটে সে দিন উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেই দিন প্রথম আমি নূতন বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখি; তাঁহার কথা শুনি; তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। সেই দিন প্রথম আমার বঙ্কিম-ভক্তি চরিতার্থ হয়। সে দিনের কথা কি ভুলিবার?

আমি ও মুন্সী—তখনকার মুন্সী—এখনকার জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই, সি, এস্,—রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট—বঙ্কিম বাবুর দরবারে আমাদের আবেদন পেশ করিবার সঙ্কল্প করি। মুন্সী তখন "সাহিত্যে" আমার সহায় ছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিম বাবুর কয়েক জন বন্ধুর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। অর্থাৎ, আমরা যাচিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম, এবং কাহারও স্নেহ, কাহারও সহানুভূতি, এবং কাহারও মৌখিক উপদেশ ও তদপেক্ষা সারগর্ভ প্রবন্ধও পাইয়াছিলাম। বঙ্কিম বাবুর সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলাম। কিন্তু আমার আবদার কেহ গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহারা পরিচয়-পত্র দিলেন না। দুই এক জন বলিলেন, "সে বড় কঠিন ঠাঁই! বঙ্কিম তোমাদিগকে আমল দিবেন না।" আর এক জন বলিলেন, "তোমরা নব্য ছোক্‌রা, বঙ্কিমের ধমক খাইয়া কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে। অনর্থক এ হাঙ্গামে দরকার কি?"

এক জন বলিলেন, "বঙ্কিম বড় অহঙ্কারী। আমার সাহস হয় না।" বুঝিলাম, সই সুপারিস পাইব না।

কিন্তু তখন আমাদের নিরাশ হইবার বয়স নয়। "সাহিত্য" ভিন্ন অন্য চিন্তাও তখন ছিল না। আমি ও মুন্সী পরামর্শ করিলাম, যখন "রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে" ঘটিল না, তখন এক দিন "one fine morne" আমরা দুই জনে বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব।

এখন এই "one fine morne"এর একটু ইতিহাস না বলিলে আপনারা এই ইঁদুরের পরামর্শের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিত তখন আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পত্রযোগে তাঁহার সহিত পরিচয়; এবং পত্রে ও কবিতায় সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায়—আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি তখন লক্ষ্ণৌ সহরে থাকিতেন। আমরা তাঁহাকে প্রত্যেক পত্রে কলিকাতায় আসিতে লিখিতাম। তিনিও প্রায় প্রত্যেক পত্রেই লিখিতেন, one fine morne তিনি আমাদের আড্ডায় আসিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিবেন। বহুদিন হইতে আমরা সেই one fine morneএর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু সেই fine morne আর আসিল না। কোনও কাজ ঠেলিয়া রাখিবার দরকার হইলে, বা সময়ে কোনও কাজ করিতে না পারিলে, আমরা তাহা দেবেন দাদার one fine morneএর পর্য্যায়ে ফেলিয়া দিতাম। বঙ্কিম বাবুর নিকট যাইবার ইচ্ছা যেমন প্রবল, তাড়া খাইবার আশঙ্কাও সেইরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য, উহাকেও আমরা সেই অনির্দ্দিষ্ট one fine morneএর তালিকাভুক্ত করিয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুন্সী আমার কনিষ্ঠ যতীশের সহিত একযোগে কোনও নব-যশস্বিনী মহিলা-কবিকে কাদম্বরীর ভাষায় "সাহিত্যে" লিখিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন! মহিলা-কবি অপরিচিতের

অদ্ভুত পত্র পাইয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া চিঠির কোণে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—"দেখা হইবে না।" চিঠিখানি ফেরত আসিয়া লজ্জায় যতীশের দেরাজে লুকাইয়া ছিল! আমি সহসা একদিন তাহা আবিষ্কার করি। মুন্সী এখন ম্যাজিষ্ট্রেট, কিন্তু তখন কবি ছিলেন। সরল, উদার, ভাবুক কবি, সংসারের প্রহেলিকায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সাহিত্য-রসে ভোরপুর মুন্সীর ভাবোচ্ছ্বাস, এবং যতীশের বাছা বাছা সংস্কৃত কাদম্বরী পড়িয়া আমার খুব আমোদ হইয়াছিল, কিন্তু "দেখা হইবে না"—তেমনই সাংঘাতিক মনে হইল! কেন না, ইহার পর আর তাঁহার রচনা পাইবার আশা করা যায় না।

মুন্সীকে বলিলাম, হাঁড়ী ভাঙ্গিয়াছে, এইবার হাটে পাঠাইব। মুন্সীর সেদিনকার "লাজনত আঁখি" আমার এখনও মনে আছে!—অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, এ কাহিনী গুপ্ত থাকিবে।—আজ এ কথা ছাপিয়া দিলাম। জগৎ শেঠ বলিয়াছিলেন,—

"প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর।"

ইহাও সেই প্রতিহিংসা। জীবনের প্রভাতে যাঁহাদের ভরসায় "সাহিত্যে" হাত দিয়াছিলাম, তাঁহারা এখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাফল্য ভোগ করিতেছেন। সাহিত্যের ও "সাহিত্যে"র নামগন্ধও তাঁহাদের মনে নাই। আমি একাকী 'মড়া আগ্‌লাইয়া' বসিয়া আছি। মুন্সী "সাহিত্যে"র তদানীন্তন মুরুব্বীদের অন্যতম। প্রতিহিংসার সাধ হয় না? তাই সেই পৌরাণিকী বিড়ম্বনার কাহিনী ছাপিয়া শোধ লইলাম। আশা করি, Less majesty হইবে না!

তখন আর এক জন "সাহিত্যে"র উদ্যোগী, হিতৈষী, কর্ম্মী ছিলেন। তিনিও বিলাতে যান। সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে "সাহিত্যে"র জন্য গল্প-গান রচিয়া এডেন হইতে, সুয়েজ হইতে, মার্সাই হইতে ডাকে দিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া মালঞ্চে ফুলের

চাষ করিয়াছিলেন, তার পর আইনের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন। আমার শাপ ফলিয়াছে। তাঁহাকেও এত দিন পরে রোগে ধরিয়াছে। পরিণত বয়সে সাগর-সঙ্গীত শুনিয়া শঙ্খের মত সমুদ্রের আরাব ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, দেশে আনিয়াছিলেন। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর পরে তিনি নারায়ণের চরণে সোনার তুলসী দিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা সফল হউক। বন্ধুর অসুখ হইলে লোকে বলে, তুমি নীরোগ হও। আমি বলি,—তাঁহার এ রোগ যেন না সারে। এখন দেখুন,—কত ধানে কত চাল। এ নেশার কি মোহ!

আমি এক দিন মুন্সীকে বলিলাম, "চল, বঙ্কিম বাবুর কাছে যাই।" সেই "দেখা হইবে না" মুন্সীর মনে বেশ দাগ কাটিয়া, স্থায়ী হইয়া, বসিয়াছিল। মুন্সী বলিল, "গলা-ধাক্কা খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে?" আমি বলিলাম, "ষট্‌কর্ণ হইলে মন্ত্রভেদ হয়। তোমার আমার ধরিয়া মোট চারি কর্ণ, তাহাতে সে ভয় নাই। গলা-ধাক্কা দু'জনে ভাগ করিয়া লইব। কেহ প্রকাশ করিব না। চল।"

তৎক্ষণাৎ "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" ও "সাহিত্যে"র কয়েক সংখ্যা লইয়া আমরা শঙ্কিতচিত্তে বঙ্কিম-দর্শনে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহাকে 'অধৃষ্য' বলিয়াই মনে হইয়াছিল। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা না বলিলে, যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা ফুটিবে না।—এই জন্য 'বাজে কথা'র গৌরচন্দ্রিকায় এত 'বাজেতম কথা' লিখিতে হইল। পরে যাহা লিখিব, তাহাও খুব কাজের কথা নয়। কিন্তু বাজে কথায় বড় বড় চরিত্রের অনেক বড় বড় তত্ত্ব জানা যায়। গভীর গবেষণা ও গম্ভীর বিচারণা তাহা অপেক্ষা বহুমূল্য হইতে পারে, কিন্তু চরিত্র-চিত্রের তাহাই একমাত্র উপাদান নয়।

এখন বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে যাত্রা করি।

তখন বঙ্কিম বাবু মেডিকেল কলেজের সম্মুখবর্ত্তী প্রতাপ চাটুর্য্যের

গলিতে বাস করিতেন। বাড়ীখানি সাদা সিধে। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে গলির উপর কাশ্মীরী বারান্দা ঝুঁকিয়া আছে। ইহা একটু নূতন। আমরা পূর্ব্বাস্য হইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। আমাদের দক্ষিণে, দ্বারের পার্শ্বেই জলের কল। সেই কলে বঙ্কিম বাবুর খানসামা হুঁকা ফিরাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বঙ্কিম বাবু বাড়ী আছেন?" ভৃত্য উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের কি দরকার?" আমি চটিয়া লাল। বলিলাম, "বঙ্কিম বাবুর কাছে কি দরকার—তা তোকে বলিব কি রে—? তাহা হইলে তোর কাছে আসিলেই চলিত। মর—, তুই খবর দে!"

মুন্সী আমার জামা ধরিয়া টানিতেছিল, এবং মৃদুস্বরে বলিতেছিল, "কর কি? তোমার সঙ্গে কোথাও আসিতে নাই। এসেই দাঙ্গা! চুপ্, চুপ্।" ইত্যাদি।

বঙ্কিম বাবুর খানসামা কি বলিতে যাইতেছিল, এখন সময়ে শুনিলাম, উপর হইতে কে বলিতেছেন,—"আপনারা উপরে আসুন।"

চাহিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের দক্ষিণে দ্বিতলের বাতায়নে এক "শালপ্রাংশু, মহাভুজ", গৌরবর্ণ সুপুরুষ—তাঁহার ডান হাতে বাঁধা হুঁকা—তামাক খাইতেছিলেন,—প্রশান্ত মুখে স্নিগ্ধ স্মিতরেখা—উদার ললাটে—তখন কি দেখিয়াছিলাম, মনে নাই; কিন্তু এখন মনে হইতেছে, কীর্ত্তিকুসুমের মালা নয়, মনীষার বেদী নয়, প্রতিভার কমলাসন নয়,—মা'র আশীর্ব্বাদ।

খানসামা বলিল, "বাবু!"

এই বঙ্কিমচন্দ্র! বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম, দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম, যাদুকর বঙ্কিম, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বঙ্কিম! হেমচন্দ্রের বর্ণনা মনে পড়িল,—"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!" উপর হইতে তাঁহার ভৃত্যের সহিত আমার অবিনয়—কলহ বঙ্কিম বাবু দেখিয়াছেন! কিন্তু তখন ভাবিবার সময় ছিল না।

খানসামা পথ দেখাইয়া দিল। বামে উপরে উঠিবার সিঁড়ি।

উপরে উঠিলাম। ঘরের মেজেয় সুচিত্রিত কার্পেট পাতা। প্রাচীরে অয়েলপেণ্টিং। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃ-দেবতা ও তাঁহার নিজের ছবি। কৌচ্, কেদারা প্রভৃতি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। এক কোণে একটি টেবিল-হারমোনিয়ম্। বঙ্কিমবাবু গৃহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর। গায়ে একটি হাত-কাটা জামা। ধুতিখানি কোঁচানো। পায়ে চটী। পরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন। আমরা বাহিরে জুতা খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই দিন, সেই প্রথম, ভক্তিভরে অবনত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—"থাক্, থাক্।"

ইহার উত্তরে যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না। ঠিক মনেও নাই। এখনকার কথা তখনকার সেই মুহূর্ত্তের উপর আরোপ করিলে আসর জমিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কোনও লাভ নাই। কেহ কেহ হামাগুড়ি দিবার সময় হঠাৎ নীল আকাশে চাহিয়া অনন্তের কি মহিমা অনুভব করিয়া তেরো বৎসর বয়সে 'কাব্যি' লিখিবার কি পণ করিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চাশ বৎসর সাত মাস সতের দিন সাড়ে একুশ ঘণ্টা পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। তবে একটা কথা বলিলে ক্ষতি নাই, আমাদের কৈশোরে ভক্তি যেমন স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক ছিল, এখন বোধ হয় আর তেমন নাই। এখন ভক্তি হয় ত আরও গাঢ়, আরও সংহত, এবং কতকটা উদ্দাম হইয়াছে। এখনকার ভক্তি গোঁড়ামীর গন্ধে ভোরপুর—এ ভক্তি ভক্তকে উদার করিতে পারে না,—এক ভক্তি শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ভক্তকে সহস্রের প্রতি ভক্তিমান করে না, চিত্তকে স্নিগ্ধ করে না—সমাজকে শান্ত ও দান্ত করিতে পারে না। এখনকার ভক্তির ক্ষেত্রে ভক্তির পাত্র ও ভক্ত ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই;—যাহারা বা যাহা তাহার ক্ষুদ্র সীমার অন্তর্গত নয়, তাহা মহান্ হইতে পারে, স্বর্গীয় হইতে পারে, কিন্তু অন্ধ ভক্তির ও তালকাণা ভক্তের পক্ষে এ জগতে তাহার অস্তিত্বই নাই। ভক্তির ক্ষেত্রে

যে দেশের সাহিত্য অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই দেশের সংস্কারে সিক্ত বাদের স্কন্ধবিহারী বুড়ার মত এই নাটুকে সাহিত্য-ভক্তি ভর করিয়াছে। ভক্তির এই কারাদণ্ড দেখিয়া আমরা ত সুখী হইতে পারি না।

বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—"বসুন"। আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। বঙ্কিম বাবু না বসিলে আমরা বসিতে পারি না। অবস্থা ঠিক—"ন যযৌ ন তস্থৌ"! বঙ্কিম বাবু অঙ্গুলিনির্দ্দেশে একখানি কৌচ্ দেখাইয়া দিলেন। আমি বলিতেছিলাম,—"আপনি দাঁড়াইয়া—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "আমার বাড়ী,—আমি বেশ আছি, আপনারা বসুন।" আমি বলিলাম, "আমাদের 'আপনি'—বলিবেন না। আমাদের অপরাধ হয়।" বঙ্কিম বাবু একটু হাসিলেন, বলিলেন "আচ্ছা, বসো"।

আমরা সেই কৌচে বসিলাম। মনে একটু ভরসা হইয়াছিল; বঙ্কিম বাবু বাঘ নন, বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, হাসিয়া হাসিয়া কথা কন; গলা-ধাক্কার সম্ভাবনাও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে!

আমাদিগকে নীরব দেখিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমাদের দু'জনকেই আমি জানি। তুমি ত বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র? তোমার নাম সুরেশ, নয়?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া বঙ্কিম বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে? সেদিন দীনবন্ধুর পৌত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। দরজার কাছে তুমি, তোমার সঙ্গে বন্ধুদের মজলিস্ করিতেছিলে। আমাদের হেম করের ছেলে পণ্টুও তোমাদের সঙ্গে ছিল। তোমাদের আমোদ দেখে আমাদের ছেলেবেলা মনে পড়ে গেল। দেখ্‌লুম, তুমিই জমিয়ে রেখেছ। শরৎকে জিজ্ঞাসা করে শুনলুম, তুমি বিদ্যাসাগরের নাতী, তোমার নাম সুরেশ। পরে বঙ্কিমকে বল্‌লুম তোমাকে ডাকতে।

বঙ্কিম যাচ্ছিলেন,—আমি আবার বল্‌লুম,—ওরা আমোদ করছে,—করুক; ডেকো না, বুড়োর কাছে এসে কি হবে? এখানে থেকেই ওদের হাসি তামাসা দেখি।"

দীনবন্ধু সেই দীনের বন্ধু, নীলকরের যম, বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর! শরৎ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। বঙ্কিম তাঁহার তৃতীয় পুত্র,—এখন বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ, বর্ত্তমানে সুকবি ও দার্শনিক, কলিকাতার ছোট আদালতের জজ। পণ্টু,—পি, সি, কর, ওরফে প্রমথচন্দ্র কর, কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্ণী, অধুনা লোকান্তরিত হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের পুত্র। হেমবাবুও ডেপুটী ছিলেন, বঙ্কিম বাবুর সমকর্ম্মী।

তাহার পর মুন্সীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমাকেও আমি জানি। তোমার বাপ ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। তুমি যেবার বি, এ, দাও, সেবার আমিও ইউনিভার্সিটি-হলে গিয়াছিলাম। কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরী চুল, এত অল্প বয়সে বি, এ, দিচ্ছ দেখে ত্রৈলোক্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ ছেলেটি কে হে? খুব অল্প বয়সে বি, এ, দিচ্ছে ত? চেনো?' ত্রৈলোক্য বল্‌লে,—'ঘনশ্যামের ছেলে।' তোমার ডাকনাম মুন্সী? ভাল নাম কি?"

মুন্সী বলিল, "জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তুমি কি কচ্ছ?"

মুন্সী বলিল, "আমি এম্, এ, দিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "ও আবার এম্, এ, দেবে বলে পড়ছে। আমরা বল্‌ছি, তুমি বিলেতে যাও, সিভিলিয়ান্ হবার চেষ্টা কর।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "ওর বাবা কি বলেন?"

আমি বলিলাম, "তাঁর অমত নাই। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তবে আবার এম্, এ, কেন?"

তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে কি?"

আমি অবসর পাইয়া কম্পিত-হস্তে সেই "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" ও কল্প-

ক্রম-কাটা "সাহিত্য" বঙ্কিম বাবুর হাতে দিলাম। বঙ্কিম বাবু হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিয়াই বলিলেন, "আগেই বলে রাখি, তোমরা যদি আমাকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বলি দাও, তাতেও আমি রাজী আছি। কিন্তু আমাকে তোমাদের কাগজে লিখ্‌তে বলো না।"

গলা-ধাক্কা বটে! কিন্তু কি সুন্দর, কি মিষ্ট প্রত্যাখ্যান! যে আশায় গিয়াছিলাম, তাহাতে ছাই দিয়া, সুবুদ্ধির মত তখনই বলিলাম, "যে আজ্ঞে!"

দু'জনে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। অসাধ্যসাধন করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মনে হইল, ফাঁড়াটা অতি অল্পেই কাটিয়া গেল।

বঙ্কিম বাবু "সাহিত্য" সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলেন। মুন্সী বলিল, "সুরেশকে আমরা সম্পাদক করিয়াছি"।

বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার দাদা-ম'শায় জানেন?"

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। দাদা-ম'শায় জানেন কি না, তাহা আমিও ঠিক জানিতাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন ভাবি, জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। খুব সম্ভব, তিনি আমাকে এমন অনধিকার-চর্চ্চা করিতে দিতেন না। বাড়ীতেই আফিস ছিল। লুকাইবার জিনিষ নয়, হয় ত শুনিয়া থাকিবেন, বারণ করেন নাই। মুন্সী বলিল, "বোধ হয়, তিনি জানেন।"

বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, "সে কি? দেশের লোক তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে, আর তুমি তাঁকে না বলে' কাগজ বার করে' ফেল্লে। তিনি শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন না?"

আমি বলিলাম, "বোধ হয় শুনেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি নি।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "দেখ, লেখা টেখা মন্দ নয়। কিন্তু তোমাদের এখন পড়্‌বার সময়—এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। জীবিকার জন্যে ত কিছু করা চাই। এতে উপার্জ্জনের আশা নাই। আমরা

কলেজ থেকে বেরিয়ে এ সব কাজ করেছি। এই চাকরী কর্‌তে কর্‌তেই লেখার জন্যে ছুটী নিয়ে এখন ভুগ্‌ছি। এতদিন পেন্সন নেওয়া যেতো,—আর ভাল লাগে না, শরীরও বয় না, কিন্তু সেই ছুটীগুলো এখন পুষিয়ে দিতে হচ্ছে।"

বঙ্কিম বাবু তখনও পেন্সন গ্রহণ করেন নাই।—আমি নিরুত্তর।

মুন্সী আমাকে উদ্ধার করিল। সে বলিল, "বিদ্যাসাগর ম'শায় ওদের দু' ভাইকে স্কুলে দেন নি। বাড়ীতে পড়ান।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "কেন? তাঁর নিজের স্কুল কলেজ রয়েছে, নাতীদের স্কুলে পড়ান না? এর মানে কি?"

মুন্সী বলিল, "তিনি ওদের সংস্কৃত পড়িয়েছেন। তাঁর মত, আগে সংস্কৃত পড়ে, পরে ইংরিজী পড়্‌লে শীঘ্র শেখা যায়। ওরা বাড়ীতে পড়ে। তিনি বলেন, ভাল করে' পড়া শুনা করে' ওরা বাঙ্গালা লিখ্‌বে। তিনি নিজে সময় পান নি, যা সাধ ছিল, লিখ্‌তে পারেন নি। ওদের দিয়ে লেখাবেন।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তবে ভাল।"

আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম!

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "আমি লিখিতে পারিব না, কিন্তু তোমাদের যখন যা জান্‌বার দরকার হবে, জেনে যেও; আমি অনেক দিন 'বঙ্গদর্শন' চালিয়েছি। সব জানি। ম্যানেজারী পর্য্যন্ত।"

আমরা উঠিলাম। আবার বঙ্কিম বাবুর পদধূলি লইয়া ধীরে ধীরে ফিরিলাম। "সাহিত্যে"র দুর্ভাগ্য ভাবিয়া নিরাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর সদাশয়তায় মুগ্ধ—আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলাম।

মুন্সী বলিল, "একবারে 'যে আজ্ঞে' বলে ফেল্লে? এ দিকে মুখে খই ফোটে, একটা কথাও কইতে পার্‌লে না?"

আমি বলিলাম, "তুমিই কোন্ পার্‌লে?"

সেই দিন হইতে তিন দিন তিন রাত্রি বঙ্কিম বাবুর warning-এর কথা ভাবিতে লাগিলাম। জীবিকা, দারিদ্র্য, বিফলতা,—নানা

শঙ্কায় মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমি ঘড়ীর পেণ্ডুলমের মত দু'দিকে দুলিতে লাগিলাম।

তৃতীয় রজনীর শেষ যামে স্থির করিলাম,—"যে কাজের সূত্র-পাতেই বঙ্কিম বাবু আমার ভবিষ্যৎ ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাহা ঘটে, ঘটুক, সে কাজ ছাড়িব না।"

বাগান হইতে বেল, জুঁই, চামেলী, গন্ধরাজ, বকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। চন্দ্রকিরণে মৃদু-বিভাসিত উদ্যানের সৌম্য শ্যাম শ্রী আমার স্বপ্নকে আরও সুন্দর করিতেছিল। কিশোর বয়সের কল্পনা আশার যবনিকায় আমার অক্ষমতা, বিফলতা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল! জীবন বিফল হইয়াছে, সে আশা ধূলায় লুটাইয়াছে,—কিন্তু অতীতের স্মৃতি আছে। এখন আমার পক্ষে তাহাও সুন্দর। জানি, পাঠকের পক্ষে নয়। কিন্তু সেই স্মৃতির চিত্রশালা হইতে ক্ষুদ্রের প্রতি বঙ্কিম-চন্দ্রের স্নেহ, তাহার তুচ্ছ ঘটনা মনে করিয়া রাখিবার স্মৃতি আজ আহরণ করিয়া দিলাম। যদি পাঠকের মনের মত ও সম্পাদকের অনুমত হয়, পরে আরও বলিব।

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

ভাষার কথা

বাংলা ভাষার স্বরূপ নিয়ে কিছুদিন যাবৎ একটা মহা তর্ক উঠেছে। একদল বল্‌ছেন যে ভাষাটা সংস্কৃত ভাষারই রূপান্তর এবং বাংলা ভাষার উন্নতি মূল সংস্কৃত অনুযায়ী হওয়া উচিত। যতক্ষণ আমরা সংস্কৃতের আদর্শ আমাদের সাম্‌নে রাখ্‌ব ততক্ষণ ভুল ভ্রান্তি এড়িয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাক্‌ব। শব্দটা যতই ব্যবহার হ'ক না কেন, যেখানে সংস্কৃতের সঙ্গে মিল হবে না সেখানেই ভুল হবে এবং আমাদের সেরূপ শব্দ এবং বাক্য ত্যাগ কর্‌তে হবে। চল্‌তি কথার আমদানীটা নেহাতই গ্রাম্যতার পরিচয় দেয়, ভাষাটাকেও ক্রমশঃ শ্রীহীন ও আবিল করে ফেলে এবং লেখকদের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করে। এই জন্য ফ্রান্সে Academy আছে। সেখানে পণ্ডিতেরা কথার উপর যখন ছাপ মেরে দেন তখনই সেটা সাহিত্য-বাজারে চলে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের তৈরী সংস্কৃত ভাষাটাই সেই Academy'র কাজ করে—আমাদের একটা আলাদা পণ্ডিত-সমাজ গঠন করে নিতে হবে না। সংস্কৃত নিয়ম মাফিক যে শব্দ চলে সেইটাই গ্রাহ্য—অন্য শব্দগুলার জাত নাই—কাজের জন্য যতই দরকার হ'ক না কেন; তারা এক পংক্তিতে আসন পাবার যোগ্য নয়।

আর একদল বলেন যে সংস্কৃত ভাষাটা যদিও মাতৃভাষা বটে, তবুও বাংলা ভাষার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। মেয়ে হলেও সে এখন অন্য গোত্র-ভুক্ত হয়েছে। তার উন্নতির নিয়ম সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে হবে না। পার্শী, ইংরাজী ও নানাবিধ দেশজ অনার্য্য ভাষার মিশ্রণে বাংলা তৈরী। তাকে জোর করে সংস্কৃত নিয়মে বদ্ধ কর্‌লে রীতিমত শৃঙ্খলিত করা হবে—তার উন্নতি হওয়া দূরে থাক, বাঁচা দায় হবে। জীবন্ত ভাষার ছাঁচ—জাতীয় জীবন; যেখানে নানাবিধ উপকরণে সে জাতীয় জীবন গঠিত সেখানে জাতীয় ভাষাতেও জীবনের ছায়া দেখা

যাবে। জীবন-সংগ্রামে জাতিই বল বা ভাষাই বল—যে যত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিল করে নিতে পারবে সে ততই জীবনীশক্তি লাভ করবে। সংস্কৃতের নিয়মগুলা বাংলার উপর সিন্ধবাদ নাবিকের স্কন্ধে দ্বীপবাসী বৃদ্ধের মত চড়িয়া বসিলে বেচারার প্রাণ সংশয় হবে।

সংস্কৃত ওয়ালাদের প্রথমেই কিন্তু একটা বিষম সমস্যা। সংস্কৃত থেকে যে আমরা বাংলার উৎপত্তি ধরে নিচ্ছি সেটাই গোড়ায় গলদ। প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা জন্মেছে, আর সে প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃত ভাঙ্গা নয়, এটা সকলেই এখন জানেন। আজকাল আবার এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেকেই সন্দেহ করেন যে সংস্কৃত ভাষাটার আদৌ মৌখিক ব্যবহার ছিল কি না। কালিদাস, ভারবি, অমরসিংহের ভাষাটা কেবল লেখাতেই চল্‌ত, লোকে কহিত কিন্তু নানা রকমের প্রাকৃত ভাষা। পণ্ডিত Rhys David প্রভৃতির মত এই যে, সংস্কৃত ভাষা কোনও কালেই কথিত ভাষা ছিল না, চিরকালই ইহা "schrift-sprache"—পণ্ডিতে কাগজ কলমে লিখিতেন। Prof. Rapson প্রমুখ আচার্য্যেরা এ মত খণ্ডন করেছেন। দুপক্ষে এখনও তুমুল তর্ক চল্‌ছে—নিশ্চিন্ত হয়ে কোনও মতটাকেই এখনও অবলম্বন করা যায় না। কেবল ইহাই ঠিক বলা যেতে পারে যে এরূপ দুর্ব্বল ভিত্তির উপর আমাদের বাংলার উন্নতির সৌধ স্থাপন করলে চল্‌বে না। যে ভাষা কখনও চল্‌তি ছিল কিনা তারই সন্দেহ, যদি তার নিয়মে একটা জীবন্ত ভাষাকে চালাবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হ'লে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষার বিরুদ্ধে চল্‌তে হবে এবং শেষে পস্তাতে হবে।

ভাষাকেই এক সময় না এক সময় এই সমস্যার উত্তর সকল ঠিক করে নিতে হয়েছে। আধুনিক জার্ম্মাণ ভাষার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রুশিয়ার অধীশ্বর Frederick the Greatকে আধুনিক জার্ম্মাণী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বল্‌লেই চলে। কিন্তু তিনি বরাবরই ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। তাঁর সময়ে ফরাসী আদর্শই ভাষাতে চলিত। সাহিত্যে ত চলিতই, অধিকন্তু শব্দেতেও

তার আধিপত্য কম ছিল না। এ সময়কার জার্ম্মাণ সাহিত্যকে ভাঙ্গা ফরাসী বলিলেই চলে। সেই সময়ে Leipzigএ কয়েকটী লেখকের আবির্ভাব হয়। গট্‌শেড তারই অন্যতম। তিনি ভাষা থেকে ফরাসী প্রভাব দূর করতে সম্যক চেষ্টা করেন। একটা সভা স্থাপনা করে সকল ব্যবহৃত শব্দগুলির আভিজাত্য নিরূপণ করা হয়। ঠিক হয় যে, জার্ম্মাণ ভাষাতে যে Latin, French ও বিদেশী শব্দ আছে, তার জায়গায় জার্ম্মাণ শব্দ গঠন করা হ'বে, আর যে ভাবটী লাটিন শব্দ ও জার্ম্মাণ শব্দ দ্বারা সমান রকমেই প্রকাশ করা যায়, সেখানে জার্ম্মাণ শব্দটিকে গ্রহণ করতে হবে। এই সব নিয়মের আধুনিক ফল জার্ম্মাণ সাহিত্যে বেশ দেখা যায়। অনেকে লাটিন ও ফরাসী শব্দ আদৌ ব্যবহার করেন না। গট্‌শেডের পর লেসিং গট্‌শেডের নিয়মগুলি সাহিত্যে জেদ করে ব্যবহার করেছিলেন। তার পর এঁদের গঠিত সাহিত্য, শিলার ও গেটের হাতে ভুবন-বিখ্যাত হ'য়েছে। কিন্তু গেটে ও শিলারের ভাষাও এখন অনেকটা বদ্‌লেছে। হাইনার ও নিয়েট্‌জার ভাষার সঙ্গে গেটে ও শিলারের ভাষার প্রচুর প্রভেদ। মধ্যে মধ্যে বহুরূপ পণ্ডিত সভা স্থাপিত হ'য়ে জার্ম্মাণ সাহিত্যকে নিয়মে বাঁধবার চেষ্টা করা হ'য়েছে, কিন্তু কোনটাই চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

ইংরাজী সাহিত্যের উদাহরণই দেখা যাক্। যখন বেউল্‌ফ ও লেয়ামন লিখিয়াছিলেন, তখন কোন dialect ইংরাজী বলে গণ্য হবে, সে সমস্যার অনেকেই উত্তর দিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে Earleএর Philologyর গোড়ার কয়েক পৃষ্ঠাতেই বেশ সুচারু-রূপে আলোচনা আছে। তার পর Chaucer; তাঁর ভাষা আবার অন্যরূপ। Spenser, Shakespeare ও Milton যদিও প্রায় সমসাময়িক, ভাষার ভঙ্গীতে কিন্তু কত প্রভেদ। আবার এই ইংরাজীই Rudyard Kipling কিম্বা Maesfield ব্যবহার করেন তাঁদেরই সঙ্গেই বা Pope ও Drydenএর ভাষার মিল কই? আজ-কালকার অনেক ইংরাজী-

শিক্ষিত বাঙ্গালী Shakespeare, Johnson ও Burkeএর ইংরাজী ব্যবহার করেন বলে আমাদের Jabberjee বলে কত না ঠাট্টা করা হয়। কই আপনি Macaulay কিম্বা Carlyleএর styleএ লিখে পার পান দেখি ?

কথাটা হ'চ্ছে এই, যে ভাষাবিজ্ঞানেই—Philologyতেই বলুন বা সাহিত্যেই—Literatureএতেই বলুন, কোন থানেতেই এক বাঁধা নিয়ম চিরকাল খাট্‌বে না। যখন যেটার সাহায্যে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হবে, প্রতিভাশালী লেখক তখনই তাহার সাহায্যে অগ্রসর হবেন। যেখানে একটা চল্‌তি কথায় ভাবটী ঠিক প্রকাশ করা যায়, সেখানে ঘুরিয়ে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর্‌তে কেহই রাজী হবেন না। এটা মানসিক শৈথিল্যের জন্য নয়, ভাবের স্ফূর্ত্তির জন্য। ভাষার গঙ্গা দেশ-দেশান্তর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ; অনেক নূতন শাখানদী অনেক নূতন সম্পদ্ এনে যোগ দিচ্ছে—পর্ব্বত-বন্ধুর হিমাচল ক্রোড় থেকে শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত, বিভিন্ন রূপে একই নদী দ্বারা পুষ্ট হচ্ছে। কেহই পদ্মাতে অলকানন্দার অনাবিল স্বচ্ছতা খোঁজে না।

তবে কি লেখকদের উচ্ছৃঙ্খলতার কোনও বাধা নাই ? ক্রিয়াপদ আগে দিয়ে আর সর্ব্বনাম পদ বাক্যের শেষে দিয়ে কি লেখাটাই এদেশে চলে যাবে ? আর কলিকাতার "হালুম হুলুম" কি বাঙ্গালা ভাষাতে চির কালই ভয় দেখাতে থাক্‌বে ? খাইলাম লিখি, না "খেলুম" লিখি—না সব পরিত্যাগ ক'রে "ভক্ষণ করিলাম" লিখিব ? শ্রীহট্টের ভাষাই কি বাঙ্গালার আদর্শ হবে, না নবদ্বীপের ভাষাটাকেই আমাদের সকলকেই মেনে চল্‌তে হবে ?

কোন্ প্রাদেশিক ভাষা শেষে বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হবে তা বলা সুকঠিন। যদি কোনও ভাষা আদর্শ হয়, তাহা হ'লেও এই আদর্শ ভাষা যে চিরকালের জন্য বাঙ্গালা ভাষাটাকে একটা বিশেষ ছাঁচে বদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে, এরূপ ভাববারও কোন কারণ দেখি না। আলালী

ভাষা, বিদ্যাসাগরী ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা, সব ভাষাগুলিরই বিশেষত্ব আছে। এই সব লেখকদের হাতে তাঁদের ভাষার ভঙ্গী বেশ পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ভবিষ্যতে যদি শ্রীহট্ট কিম্বা কুচবিহার হইতে প্রতিভাশালী লেখকের উদ্ভব হয় এবং তিনি তাঁর প্রাদেশিক ভাষাতে লেখেন তা' সকলেই আহ্লাদের সহিত পড়্‌বে এবং তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কিম্বা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নাই বলে কেউ তাঁর দোষ ধর্‌বে না। যে রকম ভাষাতেই প্রতিভাশালী কবি লিখুন না কেন, জন-সমাজকে তাহা গ্রাহ্য কর্‌তে হবে—কেন না 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ'। ভাষাতে লোকে প্রাণ খোঁজে, পোষাক নহে। যৌবনের উদ্দামশক্তির যে বিকাশ হয়, তাহা জীবনীশক্তির পরিচায়ক এবং ভাষাতেও সেই শক্তির বিকাশ আমরা জীবনীশক্তির প্রমাণ বলে আদর কর্‌ব।

শ্রীমন্মথনাথ বসু।

চির-কিশোর

শৈশবে শিখিনু আমি কন্দুকের ক্রীড়া
তব পাশে ধূলি মাখা সাজে,
তোমার চরণ বেড়ি নাচিয়া নাচিয়া
এই বিশ্ব-বৃন্দাবন—মাঝে।

কৈশোরে তোমার সহ বনে, পথে, মাঠে
গোঠে গোঠে চরাইনু ধেনু,
যমুনার কাল জলে খেলিনু সাঁতার
শিখিলাম বাজাইতে বেণু।

যৌবনে যা' রসলীলা প্রেমের স্বপন
সেও তব প্রেম-দৌত্য কাজ,
তব দোল-ঝুলনের করি আয়োজন
রচিলাম তব প্রেম-সাজ।

আজি বৃদ্ধ-গোপ আমি হে চির-কিশোর
তুমি একই করিতেছ লীলা,
আমি শুধু ভাব-ময় কাঁদি, ঝরঝর
গলে যায় হৃদয়ের শিলা।

আজো তুমি বাজাইছ সুমোহন বেণু
অনন্তের বারতা সে আনে,
বিশ্বভরা তব দোল-ঝুলন হেরিয়া
নাচিবারে সাধ যায় প্রাণে।

শ্রীকালিদাস রায়।

পৌরাণিকী কথা

ধরার ভার ও অবতার

পুরাণ সকল ভাল করিয়া পড়িলে মনে হয়, জর্ম্মণ দেশের আধুনিক দার্শনিকগণ যে Super-man বা অতি-মানুষের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের অবতার। অতিমানুষ-প্রভাবসম্পন্ন যিনি, যিনি সমাজের গ্লানি দূর করিয়া, সমাজে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, ধরার ভার হরণ করিতে পারেন, তিনিই অবতার, তিনিই Super-man। সামঞ্জস্যের নাশকেই ভার বলা যায়; শক্তিসামঞ্জস্যকে যে বাহিরের শক্তি নষ্ট করিতে পারে, সেই বিরোধী শক্তির সাহায্যেই ভারের অনুভূতি হয়। সেই শক্তিই ভারের দ্যোতক। এই শক্তিই অধর্ম্ম; ইহার অভ্যুত্থান হইলেই ধরার ভার বাড়িয়া যায়, আর নারায়ণকে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইতে হয়। জর্ম্মণ দার্শনিকগণের State, আমাদের সমাজ এবং পুরাণের ধরা প্রায় একই পদার্থ। যাহার দ্বারা State বা সমাজ বা ধরা স্থির থাকে, সমঞ্জসীকৃত মানবশক্তির প্রভাবে উন্নতি ও বিকাশের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাই ধরার বা সমাজের বা Stateএর ধর্ম্ম; কেন না তাহার দ্বারাই সমাজ ধৃত রহিয়াছে। সমাজের ধারণাশক্তিই সমাজের ধর্ম্ম, ধরার ধর্ম্ম, Stateএর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই নারায়ণের অবতার—Super-manএর আবির্ভাব প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অবতার পাপ-পুণ্যের গণ্ডীর ভিতর থাকেন না; তিনি তেজস্বী, তিনি যাহা করেন, তাহাই পুণ্য, তাহাই তাঁহার লীলা। বালিবধের কথা তুলিয়া আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, তোমার-আমার পাপ পুণ্যের মাপকাটি লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যের বিচার কর কোন্ হিসাবে? তিনি ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য, দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; বালি দুষ্কৃত, ধর্ম্মের অপহ্নবকারী; যেমন করিয়া হউক তিনি তাহার

বধ সাধন করিয়া সমাজের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বালিবধে যখন সমাজের কল্যাণ হইয়াছে, তখন বধের ভঙ্গী লইয়া বিচার করার কোন প্রয়োজন দেখি না। আচার্য্যগণের ও ব্যাখ্যাতাগণের এই বিচারপদ্ধতি, এবং জর্ম্মণ দার্শনিকগণের Super-man প্রতিষ্ঠার বিচার পদ্ধতি মিলাইয়া দেখিলে একটু বিস্মিত হইতে হয়; কেন না, সিদ্ধান্ত বাক্যে উভয়েই প্রায় এক স্থানে গিয়া পঁহুছিয়াছেন।

অবতার তত্ত্বের মধ্যে, ধরার ভার হরণ-ব্যাপারে ব্যক্তিত্ব—মানবতা যেন অপরিহার্য্য ব্যাপার। ইচ্ছাময় ভগবান্ ইচ্ছা করিলে অঘটন ঘটে, ধরার সকল ভার হরণ হইয়া যায়; তিনি মানুষ সাজিয়া জগতে অবতীর্ণ হনই বা কেন, মানবতার সকল দুঃখ বহনই বা করেন কেন? ইহার উত্তরে Schleirmacher শ্লিয়রম্যাকরের একটা উক্তি উদ্ধৃত করিব—"The State alone gives the individual the highest degree of life"। সমাজে না থাকিলে মানবতার উন্মেষ, আদর্শ মনুষ্যের সৃষ্টি হইতেই পারে না। ভগবান অবতার গ্রহণ করেন আদর্শের সৃষ্টির জন্য; সে আদর্শ কাহাদের জন্য? মানুষের মঙ্গলের জন্য। মানুষের মঙ্গল সাধন হয় কিসে? বাধা-উত্তীর্ণে, দুঃখ-উপভোগে। তাই যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিয়া ভগবান কেবল দুঃখের বোঝাই বহিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুরাণ কেবল দুঃখের কাহিনীতেই ভরা—দুঃখের ইতিহাস, ট্র্যাজেডির পরম্পরায় পরিপূর্ণ। কারণ, গ্লানি মানেই দুঃখ, ধরার ভার বোধ হইতেছে বলিলেই ধরা-বক্ষে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সে দুঃখের অনুভূতি যাহার নাই, সে তেমন দুঃখ দূর করিতে পারে না। ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া প্রথমে দুঃখের স্বাদ গ্রহণ করেন, পরে সেই দুঃখের ক্রোড়ে মানুষ হইয়া, পূর্ণরূপে দুঃখের পরিচয় পাইয়া তবে তাঁহাতে অতিমানুষ-মহত্বের উন্মেষ হয়; সেই মহত্বের প্রভাবে তিনি দুঃখ দূর করেন, ধরার ভার হরণ করেন। তাই তিনি যে সমজে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, সেই সমাজেই জন্মগ্রহণ

করেন, যে সংসার হইতে দুঃখের উৎস ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, সেই সংসারেই অধিকাংশ স্থলে অবতীর্ণ হন। পরশুরাম মাতৃ-কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া তীব্র জ্বালায় অধীর হইয়া, একুশ বার ধরাধামকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন; শ্রীরামচন্দ্র পিতার কলঙ্ক-দুঃখের ভার বহন করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মাতুলের কলঙ্কে দুঃখী; বুদ্ধদেব প্রজার দুঃখে দুঃখী; কল্কী দুঃখের প্রবাহে দুঃখী। বলির মত দাতা, জ্ঞানী, পণ্ডিত-সেবক সম্রাট্‌কে সমাজপতির কর্ত্তব্য বুঝাইতে যাইয়া ভগবান দুঃখে ম্যুজ ক্ষুদ্রকায় বামন হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবতার তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, দুঃখ ছাড়া অবতার হয় নাই—হইতেই পারে না।

এইখানে ভাবুকগণ একটি প্রশ্ন করিয়াছেন—সত্য যুগে চারি পাদ ধর্ম্ম, অথচ চারিটি অবতার; ত্রেতায় তিন পাদ ধর্ম্ম, অথচ তিনটি অবতার; দ্বাপরে দুই পাদ ধর্ম্ম, অথচ দুইটি অবতার; কলিতে এক পাদ ধর্ম্ম, অথচ একটি অবতার? যখন ধর্ম্মের আধিক্য থাকিবে তখন অবতারের বাহুল্য কেন? উত্তরে আচার্য্যগণ বলিতেছেন যে, ধর্ম্মের আধিক্য থাকিলেই ধর্ম্মের গ্লানির অনুভূতি সদ্যঃ সদ্যঃ হয়। মনুষ্য-সমাজে ধর্ম্মের গ্লানির অনুভূতি হইলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। দুঃখ হইতেই ধরার ভারবোধ, এবং সেই জন্যই নারায়ণের অবতার গ্রহণ। সত্য যুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল বলিয়াই ধর্ম্মের গ্লানির অনুভূতি তীব্রভাবে হইত, কাজেই ডাকের মাথায় ভগবানকে আসিতে হইত। কলিযুগে ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুভূতি ক্ষীণ; ধর্ম্মের গ্লানি হইল কি না হইল তাহাই সামাজিকগণ সহজে বুঝিতে পারেন না; গ্লানিবোধ না থাকিলে দুঃখ বোধ হয় না। দুঃখ বোধ না হইলে দুঃখ দূরের চেষ্টা হয় না। সমাজে দুঃখ দূরের চেষ্টা না হইলে নারায়ণের অবতার হয় না। পরন্তু, যখন দুঃখের সাগরে মনুষ্য-সমাজ ভাসিয়া উঠে, তখন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে, দেবতার আহ্বানে নহে, নারায়ণকে দুঃখ দূর করিবার জন্য নাশের অবতার সাজিয়া কেবল একবার

আসিতে হয়। এই জন্য কলিতে একটি বৈ দুইটি অবতার নাই।

আবার ইহার মধ্যে আরও একটু মজা আছে। যে কয়টি কেবল নাশের অবতার, কেবল ধরার ভার হরণ করিয়া চলিয়া যান, সে কয়টি জাতিতে ব্রাহ্মণ; যাঁহারা নাশও করেন, রক্ষাও করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, কল্কী—ইহারা চারি জন ব্রাহ্মণ। দেবতার মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং সংহারকর্ত্তা শিব, উভয়েই ব্রাহ্মণ। একা পালনকর্ত্তা নারায়ণই ক্ষত্রিয়। নারায়ণ স্বয়ং ক্ষত্রিয়; কিন্তু তাঁহার দশাবতারের মধ্যে কাহারও মতে পাঁচজন, কাহারও মতে চারিজন ব্রাহ্মণ। যখনই সমাজে পালনী শক্তির অপচয় ঘটিয়াছে বা সে শক্তির ব্যাঘাতকারী আর কিছুর উদ্ভব হইয়াছে, তখনই ব্রাহ্মণরূপে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া হয় অপচয়ের উপচয় ঘটাইয়াছেন, নহে ত ব্যাঘাতকে দূর করিয়াছেন। হিরণ্যকশিপু ভাল রাজা ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবী শক্তির বিরোধী ছিলেন; সে বিরোধের ব্যথা ফুটাইবার জন্য প্রহ্লাদের জন্ম; প্রহ্লাদের আহ্বান প্রভাবেই নৃসিংহ অবতার এবং ব্যাঘাতের অপসারণ। বলির দানে, একটা গুণের অত্যন্ত বৃদ্ধিতে সমাজের সামঞ্জস্য নাশ এবং দানের স্পর্দ্ধাবিকাশ, তাই ব্রাহ্মণ বামনের অবতার গ্রহণ। ক্ষাত্র শক্তির উন্মাদ-বিকাশে বিলাসের উদ্ভব, ব্রাহ্মণ্যের অপচয়, তাই জামদগ্ন্যের অবতরণ। কলির প্রভাবে পাপের অতিবৃদ্ধি—অত্যন্ত বিস্তার, তাই বিষ্ণুযশার গৃহে ব্রাহ্মণ কল্কীর জন্মগ্রহণ। পরশুরাম ক্ষাত্র শক্তিকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছিলেন বলিয়াই বেদব্যাস ব্রাহ্মণরূপে সে শক্তির উপচয় সাধন করিয়াছিলেন। পুরাণের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ্য শক্তি সৃষ্টিতে ও নাশে প্রযুক্ত, ক্ষাত্র শক্তি রক্ষায় ও পালনে নিযুক্ত। তন্ত্রে আদ্যাশক্তির বেলায়ও ঐরূপ জাতিবিচার আছে। যেখানে মা জগদ্ধাত্রী, সেখানে মা নারায়ণী—বৈষ্ণবী শক্তি সম্পন্ন। যেখানে মা সংহারকারিণী, সেখানে তিনি ব্রাহ্মণী শিবাণী। শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারে শ্রীভগবানের

অসংখ্য অবতার হইলেও, সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ গুণ অনুসারে তাঁহাদের জাতি নির্ণয় হইয়াছে।

পুরাণের অবতারবাদের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, চাই একটা মানুষ। মধ্যে মধ্যে, যুগে যুগে একটা আদর্শ-মনুষ্যের উদ্ভব না হইলে সমাজ ঠিক থাকে না, ধর্ম্ম ঠিক থাকে না, মানুষের মতি কল্যাণপ্রদ পন্থায় পরিচালিত হয় না। সে মনুষ্য কিসের আদর্শ দেখাইবে? বর্ণহাডাঁর কথায় উত্তরটা দিব—"Man can only develop his highest capacities when he takes his part in a community, in a social organism, for which he lives and works"। এই সঙ্গে Treischke ত্রিৎসাকের কথাটা তুলিব—The State is a moral community. It is called upon to educate the human race by positive achievement, and its ultimate object is that a nation should develop in it and through it into a real character"। এই জন্য চাই একটা মানুষ। সে মানুষ positive achievement বা কর্ম্মের দ্বারা সমাজের আদর্শ স্থির করিয়া দিবেন। তিনি সমাজের একটা character বা বিশিষ্টতা, তিনিই অবতার, তিনিই Super-man। বৈদিক সাহিত্যে আর পৌরাণিক সাহিত্যে পার্থক্য এই যে, বেদে ও উপনিষদে কর্ম্মীর কর্ম্ম-শৃঙ্খলার উন্মেষ নাই, পুরাণে তাহাই আছে। মানুষ কেমন করিয়া কর্ম্ম করিলে কেমন আদর্শের উন্মেষ ঘটাইতে পারে তাহা পুরাণেতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যক্তিত্বের, Individualismএর বিকাশের জন্যই পুরাণের মাহাত্ম্য। আর সেই ব্যক্তিত্ব অবতারবাদেই পরিস্ফুট। ব্যক্তিত্ব কেবল একটা মানুষের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক নহে, উহা State, উহা জাতির বিশিষ্টতার দ্যোতক। শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, জাতির বিশিষ্টতার সহিত জড়ান—মাখান, তাই তিনি সীতাকে বনবাসিনী করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সুখ ত সুখ নহে, তিনি যে রাজা—

State, তাই জাতির পরিবাদের দৃষ্টিতে দেখিয়া সীতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল বাসুদেব নহেন, ভারতের শ্রীকৃষ্ণ; তাই তিনি কুরুক্ষেত্রের মহা-রণ-প্রাঙ্গণে পার্থসারথি, যদুবংশ-ধ্বংসের সময়ে নির্ব্বিকার। তাঁহার বংশ থাকিলেই কি, না থাকিলেই বা কি! চাই জাতির পুষ্টি, বিস্তৃতি এবং বিশিষ্টতার রক্ষা। যাহাতে সে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়, তাহা তিনি অম্লান-মুখে করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার—পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণে এই ব্যক্তিত্বের, এই অতিমানুষ প্রভাবের বর্ণনা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পান। পুরাণ সকল বৌদ্ধযুগের পরে রচিত বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। কেন না, তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলনের পর হইতে ব্যক্তিত্বের Super-manএর পরিকল্পনা ভারতবর্ষের ধর্ম্মে ও সাহিত্যে হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্ম communal বা বংশানুক্রমিক ছিল। অবতারের বা অতি-মানুষের কর্ম্মের আদর্শে বেদ পরিচালিত হইত না; ধর্ম্মকর্ম্মের সাবয়ব, মানব আদর্শ বেদেও ছিল না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পর জগতে যত ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সকল ধর্ম্মেই একটা Super-man, একটা অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহারা ইহাও বলেন যে, জন্মান্তরবাদ না মানিলে অবতারবাদ মানা যায় না। খাঁটি বৈদিক সাহিত্যে জন্মান্তরবাদ নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচলনকাল হইতেই জন্মান্তরবাদ ভারতে, তথা জগতের সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই Super-man, এই অবতারবাদের কল্পনা বৌদ্ধযুগের পর হইয়াছে। সে যাহাহউক, পুরাণ মানুষ দেখাইয়াছে, মানুষের কর্ম্মের ও আদর্শের উন্মেষ-পদ্ধতিও দেখাইয়াছে। অবতারবাদ সেই মানবতা প্রদর্শনের আকারান্তর মাত্র; ধরার ভারের মাধুরী-মণ্ডিত আখ্যায়িকা এবং State ও Humanityর ধর্ম্মের গ্লানির জন্য দুঃখের উপাখ্যান মাত্র।

অবতার লইয়া পুরাণে অনেক রকমের মতবাদ আছে। শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদ এক রকমের নহে। শৈব পুরাণগুলিতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যই বর্ণিত; বৈষ্ণব পুরাণে কেবল ক্ষত্রিয়ের উপাখ্যানই অধিক। নৃসিংহ, বামন, জামদাগ্ন্য, এবং কল্কীর পূজার কথা বৈষ্ণব পুরাণে কোথায়ও পাইবে না; যদি থাকে ত তাহা সংক্ষেপে অবান্তর কথার হিসাবে বলা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশে নৃসিংহ ও পরশুরামের মন্দির দেখিয়াছি; উত্তর ভারতে কুত্রাপি দেখি নাই; তবে কাশীধাম নাকি সকল দেবতার আশ্রয় স্থান, কাশীতে খুঁজিলে ব্রাহ্মণ দেবতার ও অবতারের মন্দির পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পুরাণে যে সকল রাজা বা সম্রাটকে ধর্ম্মের গ্লানিকর বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে তাহারা সবাই শৈব অথবা শাক্ত। বৈষ্ণববেষী বলিয়াই তাহারা রাক্ষস, দানব, দৈত্য বা অসুর। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি সবাই শৈব বা শাক্ত। শৈব পুরাণ সকলে ইহার পাল্টা জবাবও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া জৈন-প্রভাবও পুরাণে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ এবং উপপুরাণগুলি মন্থন করিয়া বিচার করিলে হিন্দু জাতির ধর্ম্ম-বিপ্লব সকলের ইতিহাসটা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধের প্রভাবও পুরাণে কম নাই; অবলোকিতেশ্বর শিবকে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুকেও বলা হইয়াছে। যাউক, সে কাজটা যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা পরে সুসম্পন্ন হইতে পারে। এখন আমি অবতার সম্বন্ধে দুই তিনটা মতবাদের আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথমে শিবপুরাণের এবং ঐ সঙ্গে তন্ত্রের মতবাদটার উল্লেখ করিব। জলে যেমন কাটি দিয়া নাড়িলে জলে ফেনা বাঁধিয়া উঠে, তেমনি বিশ্বব্যাপী আত্মশক্তির সাগরে ব্যথিত জীব আত্মার ইচ্ছার—বাসনার দণ্ড দিয়া ঘন-ঘন মন্থন করিলে বিশ্বব্যাপী আত্মা হইতে ফেনের মতন একটি বিভূতির সৃষ্টি হয়। সেই বিভূতি দেহী হইয়া সমাজে প্রকট হইলেই অবতারের উদ্ভব হয়। ব্যথিতের কামনা যখন যেমন ভাবে পরিস্ফুট হয়, তখন সেইভাবের কামী হইয়া বিশ্বব্যাপী আত্মার উদ্ভব হয়। বিশ্বব্যাপী আত্মা স্বেচ্ছায় রূপধারণ করেন না, মানুষের ইচ্ছা তাঁহাকে

যেরূপে ও যেভাবে নামাইতে চাহে, তিনি সেইভাবে ও সেইরূপে প্রকট হইয়া থাকেন। কোন একটা মনুষ্য-সমাজের আলোড়নেই যে অবতার হয়, তাহা নহে, একজন সাধক একনিষ্ঠ হইয়া কামনা করিলে তাহার কামনা পূর্ণ হয়। এইহেতু ভগবানের—পরমাত্মার অবতার অনন্ত, অসংখ্য। কেবল সমাজের গ্লানি দূর করিবার জন্যই তিনি অবতার হন না, ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ দূর করিবার জন্যও তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রহ্লাদের দুঃখ দূর করিবার জন্যই নৃসিংহ অবতার। তন্ত্র এই সঙ্গে ইহাও বলেন যে, যখন মনুষ্যমাত্রেই আত্মার অংশ, মনুষ্যের ইষ্টদেবতা যখন আত্মস্বরূপিণী, যখন ইহা সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত যে, যত জীব, তত শিব,—শিবের ধ্যান করিতে হইলে নিজের মাথায় ফুল দিয়া নিজের আত্মধ্যান চিত্ত ও বুদ্ধির সাহায্যে করিতে হয়, তখন প্রত্যেক সাধকই এক একটি অবতার। যে সিদ্ধ, যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে, সে প্রকট অবতার; যে অসিদ্ধ, দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন, সে সম্মূঢ় অবতার, তাহার আত্মার অবতৃত্ব-শক্তি তাহাতে সম্পুটিত হইয়া আছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কেবল নারায়ণেরই অবতার হইবার কথা নহে, যত শক্তি, যত দেবতা আছে, সকলেরই অবতার আছে। নারদের ভক্তিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মানুষের মনে একাদশটি আসক্তি আছে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অনুসারে উহার তেত্রিশটা বিকাশ আছে; প্রত্যেক বিকাশের এক কোটি করিয়া আলম্বন আছে। অতএব আসক্তি-অনুকূল কামনার প্রেরণায় প্রকট অবতার বা দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। শৈব ও তান্ত্রিকদিগের এই সিদ্ধান্তটা বৈষ্ণবগণ একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই; তাই শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে অবতারের সংখ্যার নির্দ্দেশ করা যায় না; এবং সকল পক্ষ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই যেন ভাগবতকার বাইশটা অবতার স্বীকার করিয়াছেন। গীতায় বিভূতিবাদের অধ্যায়ে শ্রীভগবান এই মতটার সহিত যেন কতকটা আপোষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

আনন্দগিরি স্বীয় টীকায় কথাটা একেবারে যেন খুলিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

বৈষ্ণব মত দ্বৈতবাদের মত। বৈষ্ণব, ভগবানের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং জীবের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন যে, জীবও নিত্য, নারায়ণও নিত্য। জীবের আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকার অভিব্যক্ত নারায়ণের সেবায়—কৈঙ্কর্য্যে; নারায়ণ অনাদিকাল হইতে জীবের সেবা খাইতেছেন, অনাদিকাল পর্য্যন্ত সেবা খাইতে থাকিবেন। সৃষ্টি ও স্রষ্টা নিত্য ভিন্ন, কখনও এক হইবে না, কখনও এক হইবার নহে। যখন জীবের মধ্যে পাপের বৃদ্ধি হয়, জীব যখন নারায়ণের কৈঙ্কর্য্য ভুলিয়া যায়, তখনই নারায়ণ স্বেচ্ছায় অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। দশবার তাঁহাকে ধরাধামে নররূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ এই চারি অবতারে নরত্বের অভিব্যঞ্জনা আছে। তাই আচার্য্য উহাদিগকে মানুষ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। পুরাণ পড়িলে বুঝা যায় যে, উহারা মানুষ ছাড়া অন্য জন্তু ছিল না। গল্পের রং চড়াইবার হিসাবেই যেন উহাদের কেহ মাছ, কেহ কচ্ছপ, কেহ শূকর, কেহ বা আধা মানুষ আধা সিংহ ভাবেই প্রকট হইয়াছিলেন। কেবল হিরণ্যকশিপুর হিংসার জন্যই নর বা বিষ্ণু সিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সিংহ শব্দ হিংসা হইতেই উৎপন্ন, নর বা নৃ বিষ্ণুর নামান্তর মাত্র। বৈষ্ণবী শক্তির বিকাশ দেখাইবার জন্যই তিনি নর বা বিষ্ণু, কেবল হিংসা করিবার জন্যই উদ্ভূত বলিয়া তিনি সিংহ। এই ভাবে আচার্য্য মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এই তিন অবতারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ণব বলেন, ভগবান ভাব বিলাইবার জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হন; তাঁহার দশটি ভাব দশ অবস্থায় জগৎকে বুঝাইয়া শেষে সকল ভাবের ভাবী, সকল রসের রসিক, মাধুরীর অবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ রূপে তিনি জগৎকে ঐশিক মহিমা বুঝাইয়া গিয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—এই বলিয়া অনেক বৈষ্ণবে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া মানেন না। শৈব, তান্ত্রিক এবং

বৈষ্ণব, অবতার-তত্ত্বের এই তিনটা মত লইয়াই পুরাণের অনেক আখ্যায়িকা এবং উপাখ্যান রচিত। তন্ত্র বলেন, পৃথিবী কেবল মাটির ঢিবী নহে, পৃথিবীর আত্মা আছে, অনুভূতি আছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আছে, পরমায়ুঃ আছে। তন্ত্রের আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্বটুকু গল্পের ছলে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে পুরাণ ধরাকে মানবী করিয়া রচিয়াছেন। ধরার ব্যথা বা বেদনাটা পুরাণের ভাষায় ধরার ভারে পরিণত হইয়াছে।

গীতায় অবতারবাদের সকল মতের সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গীতা যেন আমাদের সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের বৈষ্ণবী compendium এ কথাটা আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। বচন আছে—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো
দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা
পানং গীতামৃতং মহৎ॥"

অর্থাৎ সকল উপনিষদ্ যেন গরু; শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে, দুগ্ধ দুইতে পারেন ভাল, তাই তিনি উপনিষদ্ গাভীকে দোহন করিতেছেন; অর্জ্জুন হইলেন বাছুর, তিনি একটা জিজ্ঞাসার ঢুঁ মারিতেছেন আর দুধ বাহির হইতেছে। যাহারা সুধী তাহারাই এই গীতামৃতরূপী দুগ্ধ পান করিতেছেন। কাজেই বলিতে হয় যে, কর্ত্তারাও গীতাকে সঙ্কলন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই compendium বৈষ্ণবের তৈয়ারী, এ কথাটা রামানুজ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শাঙ্কর মতের মাপকাটিতে গীতাকে মাপিলে গীতা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। গীতার ব্যাখ্যা বৈষ্ণব মতানুসারে করিতে হইবে, তবে গীতা বুঝা যাইবে। কথাটা যে একেবারেই ভিত্তিহীন, তাহা বলিতে পারি না। শাঙ্কর মতানুসারে গীতার সকল কথার, সকল সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হয় না। যাউক সে কথা, গীতার অবতার-তত্ত্বের পাল্টা জবাব চণ্ডীতে আছে। চণ্ডীতে মায়ের আবির্ভাবের ব্যাপারটা, সকল মতের সমন্বয় সাধন করিয়া যেন ঘটান হইয়াছে। ফেন যেমন বুদ্‌বুদের সমাহারে জন্মায়, জগদম্বা তেমনি শুম্ভ নিশুম্ভ বধে সকল দৈবীশক্তির সমাহারে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। মহিষাসুর, মধুকৈটভ, শুম্ভনিশুম্ভ, প্রত্যেক অসুরের বধে মায়ের এক একটা নূতন বিকাশ; সে বিকাশ যেন শৈব বা শক্তি অবতারতত্ত্বের নানা সিদ্ধান্তের এক একটি সাবয়ব প্রতিমা। গীতা ও চণ্ডী পাশাপাশি রাখিয়া পড়িতে পারিলেই অবতারবাদের ধরার ভারের তত্ত্বের অনেক লুকান কথা ফুটাইয়া তোলা যায়। বলিয়াছি ত পুরাণ— কান্তাবাণী; বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী উপনিষদ্ সকলের Theory গুলিকে উল্টট গল্পাকারে পরিণত করিয়া তত্ত্বকথা শিখানই পুরাণের উদ্দেশ্য। বৈদিক উপনিষদের মধ্যে কয়েকখানির পঠনপাঠন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে; তান্ত্রিক সকল উপনিষদ্ লোপ পাইয়াছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উদ্‌যোগে শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কয়েকখানি তান্ত্রিক উপনিষদের সংগ্রহ করিয়াছেন। সেগুলি ছাপা হইলে এবং আমাদের বোধগম্য হইলে অনেক পুরাণের অনেক উৎকট কথা সোজা হইতে পারে। আপাততঃ পুরাণ পাঠ করিয়া আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, অবসরমত পাঠকগণকে তাহাই উপঢৌকন দিতেছি। আমি নিজের মত বা নিজের সিদ্ধান্ত কিছুই বলি নাই, সে পরে বলিলেও বলিতে পারি। এখন কেবল সারসংগ্রহ করিয়া ডালা সাজাইতেছি। কথায় কথায় authority দেখাই নাই; কেহ সত্যসত্যই অনুসন্ধিৎসু হইলে তাঁহাকে হদিস্ বলিয়া দিতে পারি।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

৩। নির্ব্বাণ কয় রকম ?

থেরাবাদী বুদ্ধেরা ও প্রত্যেক বুদ্ধেরা মনে করিতেন, মানুষ যদি সদুপদেশ পাইয়া, অথবা, নিজে মনে মনে গড়িয়া লইয়া চারিটি আর্য্য-সত্যে বিশ্বাস করে, আট রকম নিয়ম মানিয়া চলে, তাহা হইলে বহু-কাল অভ্যাসের পর, তাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়। এইরূপ যাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়, তাহাদের সোতাপন্ন বলে। স্রোতে পড়িলে যেমন সে আর উজান যাইতে পারে না, ভাটিয়াই যায়, সেইরূপ সোতাপন্ন নিষ্ঠাণের দিকেই যাইতে থাকেন, সংসারের দিকে তিনি আর কখন ফিরিয়া আসেন না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও তিনি আর উজান বহেন না।

সোতাপন্ন আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি "সকৃদা-গামী" হয়েন, অর্থাৎ, তিনি আর একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব এই 'সকৃদাগামী' অবস্থাতেই তুষিতভবনে বাস করিতেছিলেন। তিনি আর একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিলেন ও নির্ব্বাণ পাইয়া গেলেন।

সকৃদাগামী আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি যে অব-স্থায় আসিয়া দাঁড়ান, তাহাকে "অনাগামী" অবস্থা বলে। এ অব-স্থায় আসিলে আর ফিরিতে হয় না। ইহার পরের অবস্থার নাম অর্হৎ। অর্হৎ যদিও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকেন, তবুও তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি যে নির্ব্বাণ পাইয়া থাকেন, তাহার নাম "স্বউপাদি সেস নিব্বাণ" বা স্ব উপাধি শেষ নিব্বাণ। ইহা নির্ব্বাণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে পুনর্জ্জন্মের কিছু কিছু "উপাদান" এখনও শেষ আছে; অথবা সকল কর্ম্ম এখনও ক্ষয় হয় নাই। আরও

সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে—কর্ম্ম হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার কিছু কিছু এখনও রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থায় অর্হৎ কিছুদিন থাকিলে, তাঁহার কর্ম্মের ক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় আর হয় না। ক্রমে সব কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলেই তিনি "নিরুপাদি সেস নির্ব্বাণ ধাতু"তে প্রবেশ করেন—অর্থাৎ তখন তাঁহার কর্ম্মও থাকে না, কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন সংস্কারও থাকে না। তিনি নির্ব্বাণে প্রবেশ করেন, সব ফুরাইয়া যায়।

মহাযানীরা বলেন 'এই যে হীন-যানীদের নির্ব্বাণ, ইহা নীরস, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, এবং ইহাতে অতি সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দেয়। হীন-যানীরা ও প্রত্যেক যানীরা জগতের জন্য একেবারে 'কেয়ার' করেন না। তাঁহাদের কাছে জগৎ থাকা না থাকা দুইই সমান। নির্ব্বাণ পাইয়াও তাঁহারা কাঠের বা পাথরের মত হইয়া যান। ও নির্ব্বাণ, যাহারা বুদ্ধিমান, যাহাদের শরীরে দয়ামায়া আছে, যাহাদের হৃদয় আছে, যাহারা শুধু আপনার সুখের জন্য বাস করে না, যাহারা পরের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। তাহারা নির্ব্বাণের অন্যরূপ অর্থ করিয়া লইবে।

মহাযানীরা মনে করেন যে, নির্ব্বাণকে নিষেধমুখে অর্থাৎ 'না' 'না' করিয়া দেখিলে চলিবে না। উহাকে বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক্ হইতেই দেখিতে হইবে। আত্মার নাশের নাম নির্ব্বাণ, জ্ঞানের নাশের নাম নির্ব্বাণ, বুদ্ধির নাশের নাম নির্ব্বাণ,—এই যে হীনযানীরা 'না'র দিক্ হইতে উহাকে দেখিয়া থাকেন, উহা বুদ্ধের মনের কথা হইতে পারে না। তিনি 'চতুরার্য্যসত্য' ও আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ বা আটটি সুপথ ধরিয়া চলার নামই নির্ব্বাণ। তাঁহার মতে মনুষ্য হৃদয়ের যত আশা আকাঙ্ক্ষা, সব শান্তি করিয়া দেওয়ার নাম নির্ব্বাণ নহে; সেই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে দেওয়ার নামই নির্ব্বাণ। কিন্তু সে

আশা বা আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত থাকিলে চলিবে না, তাহার ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিতে হইবে।

দেখান গেল যে, মহাযান নির্ব্বাণ 'না'র দিক্ হইতে নয়, 'হাঁ'র দিক্ হইতে বুঝিতে হইবে। নিরালম্ব নির্ব্বাণে বোধিচিত্ত যে কেবল ক্লেশপরম্পরা হইতে মুক্ত হন, এরূপ নয়, কুদৃষ্টি হইতেও মুক্ত হন। তখন বোধিচিত্ত ধর্ম্মকায়ের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। দুটি জিনিস তখন তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে—(১) সর্ব্বভূতে করুণা, (২) ও সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান। যিনি এইরূপে 'সম্যক্ সংবোধি' লাভ করিয়াছেন, তিনি সংসারের উপরে উঠিয়াছেন, নির্ব্বাণেও তখন তাঁহার একান্ত আস্থা নাই। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়াছে সর্ব্বজীবের পরিত্রাণ ও তাহার জন্য তিনি আপনাকে বারংবার বদ্ধ করিতেও কাতর হন না। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী-প্রজ্ঞাবলে তিনি পদার্থের সত্যাসত্য দেখিতে পান। তাঁহার জীবন তখন উৎসাহে পরিপূর্ণ, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মময় হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে বলিতেছে, 'সমস্ত প্রাণীকে মুক্ত কর ও চরমানন্দে ভাসাইয়া দাও।' তিনি নির্ব্বাণেও তৃপ্তি লাভ করেন না, নির্ব্বাণেও তিনি বসতি করিতে পারেন না, তাঁহার কি ভব, কি নির্ব্বাণ কোনই আলম্বন নাই, এইজন্য তাঁহার নির্ব্বাণের নাম নিরালম্ব নির্ব্বাণ।

মহাযানীদের আর একরকম মুক্তি আছে। এ মুক্তি ভব ও নির্ব্বাণের অতীত। ইহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মকায়ের সহিত এক। আমরা যাহাকে তত্ত্ব বলি, সাধারণ লোকে যাহাকে তথ্য বলে, মহাযানীরা তাহাকে তথতা বলে। ধর্ম্মের যে তথতা তাহার নাম ধর্ম্মকায়। যিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিথি তথাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমসত্যে আগত হইয়াছেন।

সে পরম সত্যটি কি? জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহার তলায় যে নিগূঢ় সত্যটুকু রহিয়াছে, তাহারই নাম ধর্ম্মকায়। ধর্ম্মকায় হইতেই নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতেই

সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়। ধর্ম্মকায় মহাযানীদের নিজস্ব, কারণ হীনযানীরা জগতের আদিকারণ নির্ণয় করিতেই যান নাই। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মকায় বলিতে বুদ্ধের ধর্ম্ম ও তাঁহার শরীর বুঝাইত। অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মকায় বলিতে বেদান্তের পরমাত্মা বুঝায়, কিন্তু সে কথা সত্য নয়। নির্গুণ পরমাত্মা অস্তিত্ব মাত্র। ধর্ম্মকায়ের ইচ্ছা আছে, বিবেকশক্তি আছে, অর্থাৎ, ইঁহার করুণা আছে ও বোধি আছে। সকল সজীব পদার্থই এই ধর্ম্মকায়ের প্রকাশমাত্র।

নির্ব্বাণ বলিতে চৈতন্যের নাশ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় না। নির্ব্বাণে নিরোধ করে কি? কেবল অহংভাবেরই ইহাতে নিরোধ করে। ইহাতে বলিয়া দেয় যে অহং বলিয়া যে, একটা পদার্থ কল্পনা করা হয়, তাহা অলীক ও এই অলীক কল্পনা হইতে আরও যত ভাব উঠে, সে সবও অলীক। এতটুকু ত গেল কেবল 'নিষেধমুখে' অর্থাৎ 'না'র দিক্ হইতে। বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক্ হইতেও ইহার একটা অর্থ আছে। সেটি করুণা—সর্ব্বভূতে দয়া। এই দুইটা জিনিস লইয়াই নির্ব্বাণ সম্পূর্ণ হয়। হৃদয় যখন অহংভাব হইতে মুক্ত হইল, অমনি, যে হৃদয় এতক্ষণ সঙ্কীর্ণ ও অলস ছিল, তাহা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, নূতন জীবনের ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন কারাগার ছাড়িয়া বন্দী বাহির হইয়া পড়িল। এখন সমস্ত জগৎই তাহার, এবং সেও সমস্ত জগতেরই। সুতরাং একটি প্রাণীও যতক্ষণ নির্ব্বাণ পাইতে বাকি থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার নির্ব্বাণ পাইয়া লাভ কি? নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

একজন বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন, "অবিদ্যা হইতে বাসনার উৎপত্তি এবং সেই বাসনা হইতে আমার পীড়ার উৎপত্তি। সমস্ত সজীব পদার্থ পীড়িত সুতরাং আমিও পীড়িত। যখন সমস্ত সজীব পদার্থ আরোগ্য লাভ করিবে, তখন আমিও আরোগ্য লাভ করিব। কিসের জন্য? বোধিসত্ত্ব জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা স্বীকার করেন? কেবল জীবের জন্য।

জন্ম ও মৃত্যু থাকিলেই পীড়া থাকে। যখন জীবের পীড়ার উপশম হয়, বোধিসত্ত্ব রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। যখন পিতামাতার একমাত্র সন্তান পীড়িত হয়, তখন পিতামাতারও পীড়া উপস্থিত হয়। সে সন্তান নীরোগ হইলে পিতামাতাও নীরোগ হন। বোধিসত্ত্বেরও ঠিক সেইরূপ। তিনি সমস্ত জীবগণকে সন্তানের মত ভালবাসেন। তাহারা পীড়িত হইলেই তিনি পীড়িত হন, তাঁহারা নীরোগ হইলেই তিনি নীরোগ হন। তুমি কি শুনিতে চাও কেন বোধিসত্ত্ব এরূপ পীড়িত হন? তিনি মহাকরুণায় আচ্ছন্ন, তাই তিনি পীড়িত হন।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

দান

সে আমারে কত রূপে দেছে প্রেম উপহার!
সতত পারশে আছে ধরিয়া বিবিধাকার।
প্রথমেতে সে পার্শ্বতী স্নেহরূপা মূর্ত্তিমতী;
পুরুষ-প্রকৃতি ভেদে,—জনক জনমাধার।—
সে আমারে কত রূপে দি'ছে প্রেম উপহার!
কভু সে পরাণ-সখী; মরমে মরমে রাখি,—
জাহ্নবী-যমুনা যেন মুক্ত-বেণী—পূতধার।
কভু সে অনুজ সাথী; ক্রীড়া-রসে মাতামাতি—
কায়া সাথে ছায়া যেন একই রূপে একাকার
সে আমারে কত রূপে দেছে প্রেম উপহার!
যৌবনে, দ্বিতীয় অঙ্কে, তুলে সে লইয়া অঙ্কে—
বঁধুয়া মধুর হেসে ঢেলে দেছে প্রেমধার!
পুনঃ সে তনুজ সখা, স্নেহ ভক্তি মধু মাখা;
আলম্বন যষ্টি শেষ স্থবির জীবনাধার—
সে আমারে কত রূপে দেছে প্রেম উপহার!
আমার আঁখির আগে কত রূপে বঁধু জাগে;
নয়নে নয়নে হাসি—দিনে—পলে শতবার!
পিয়ার আনন মম শতদল নিরুপম;—
দুল-দুল চারু সরে—কোথায় তুলনা তার!
সে হাসি হৃদয়ে আঁকা, সে হাসি সুরভি মাখা,
সে হাসি সোহাগে ভরা, সে হাসি হাসির সার!
সতত সমুখে আছে ধরিয়া বিবিধাকার;
কতরূপে সে আমারে দেছে প্রেম উপহার!

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মাঝে থাকা

"দরশন লাগি বর নাহি মাগি"

আমি? সাগর-সৈকতে আমি একটি বালুকণা মাত্র। বালুকণা বলিয়া এ সাগরের কুল কিনারার সন্ধান রাখিনা, আদি-অন্তের সীমা জানিনা, ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান নাই, শুধু মধ্যে থাকাই আমার ধর্ম্ম, বর্ত্তমানের প্রকাশই আমার জীবন।

এ সৈকতে আমার ন্যায় বালুকণা অগণিত। কিন্তু তাহাদের সহিত আমার প্রভেদ আছে। তাহারা সাগরের জোয়ার ভাটার খেলার সামগ্রী—স্তূপীকৃত হ'য়ে পড়ে আছে। সেই জোয়ার ভাটার টানেই তাহাদের অনুভূতি, সুখদুঃখ, উৎসাহ ও অবসাদ, আলো ও আঁধার, ভাসিয়া উঠা ও ডুবিয়া যাওয়া। যদিও তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি স্বধর্ম্ম আছে, তথাপি তাহাদের স্বার্থ বিশ্বরাজার অর্থের অধীনে, তাহাদের স্বধর্ম্ম বিশ্বরাজার বিশ্বধর্ম্মে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের জঠরে ক্ষুধা আছে, তালুতে পিপাসা আছে, জীবনে সংগ্রাম আছে, জ্ঞানে অসঙ্গতি আছে, কিন্তু সে ক্ষুধার, সে পিপাসার, নিবৃত্তি আছে, —সে সংগ্রামের শাসন আছে, মীমাংসা আছে,—সে জ্ঞানের চরমে সঙ্গতি আছে। "আমি তোমারই অঙ্গ-বিশেষ, অন্তিমে আমি তোমাতেই সঙ্গত হইব" এই চিরসঙ্গম আশায় শান্ত হইয়া তাহারা প্রাণিধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম ও বিশ্বধর্ম্ম, রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহারা হইল বিশ্বরাজ্যের প্রজা, রাজার ধর্ম্মে রাজ্যের এলাকায় সুখে স্বার্থে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াই তাহাদের অধিকার। আমার কিন্তু তাহা নয়। আমি একটি বিদ্রোহী প্রজা। আমি স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি করিতে চাই, হোক্ না কেন সে বালুকণার রাজ্য। বিশ্বধর্ম্মে আমি স্বধর্ম্ম খোয়াইব না, বিশ্বের মূল্যে বিকাইব না।

এতদিন কে যেন আমাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আমি পুনরায় মাথা তুলিতে শিখিয়াছি। ডুবি নাই, আর ডুবিব না। যে সাগর হইতে উঠিয়াছি, সে সাগরে ডুবিব না। ধীবরেরা জাল পাতিয়া অতল জলধি হইতে শুক্তিকা তুলে, আর দৈবক্রমে যদি কোন মুক্তা জাল কাটিয়া ধীবরের হাত এড়াইতে পারে, তবে—তবে সে পুনরায় সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়! আমি কিন্তু অতল জলধি-গর্ভে প্রাণ হারাইব না। ঊর্ণনাভ সযত্নে জাল বুনিয়া আমাকে তাঁহার ফাঁদে বন্দী করিয়াছিলেন, আমি কিন্তু সে মায়াবীর জাল কাটিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছি। আমি প্রাণ হারাইতে পারি না, ডুবিলেও নিজগুণে স্বধর্ম্ম-প্রভাবে শোলার ন্যায় ভাসিয়া উঠি। সাগরে মুক্তাবাহী নটিলাসের (Nautilusএর) ন্যায় সন্তরণ করিতে করিতে কোথায় ভাসিয়া যাই!

এ লঘুত্ব কি যৌবনের ধর্ম্ম? বার্দ্ধক্যে কি গুরুত্ব মিলে? ওজনে ভারি হইতে শেখা যায়? না, প্রাণের বয়স নাই, জরা নাই। বিশ্বের বশ্যতাই তাহার জড়তার, স্থবিরত্বের, মূল। মহতের অধীনতা-স্বীকার, ভূমার আশ্রয় লাভই, ক্ষুদ্রের প্রকৃত শৃঙ্খল।

চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ড চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, এবং পরিণামে চুম্বকের সহিত সংলগ্ন হয়। পরশমণির সংস্পর্শে বালুকণাও স্বর্ণে পরিণত হয়। মাধ্যাকর্ষণের টানে পার্থিব বস্তুমাত্রই মৃত্তিকার উপর পতিত হয়। আমার সম্বন্ধে কিন্তু তাহা খাটিবে না। পরের মূল্যে নিজেকে বিকাইব না। পরশমণির সংস্পর্শে সোণা হইতে চাহি না। ক্ষুদ্র বালুকণা হইয়া থাকিব সেও ভাল, তবু যেন পৃথিবীতে পরিণত হইয়া পৃথিবীর বৃহদাকার প্রাপ্ত না হই। বেলাভূমিতে এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিব। বালুকণা জ্বলে, পুড়ে, কিন্তু ভস্মসাৎ হইয়া মাটিতে মিশাইতে জানে না।

বালুকণার কথা বলিতে বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। বালুকণা হইয়া একপার্শ্বে থাকিতে পারি কৈ? আমি একরত্তি বালুকণা, কিন্তু বালুকণা হইয়া অভ্রের গুণ পাইয়াছি। আমি স্বচ্ছ হইয়াছি। আমি

জ্বলিয়া উঠিলে যে বিশ্বের ছায়া আসিয়া আমার উপর প্রতিবিম্বিত হয়। আর সেই প্রতিবিম্বে আমার প্রাণের আগুন দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠে। এই আবছায়া, অর্দ্ধছায়া, খণ্ড আকৃতি দেখিয়া কিন্তু প্রাণে তৃপ্তি আসে না। ক্ষুদ্র বালুকণা হইয়া সমগ্রের প্রতিবিম্বও ধারণ করিতে পারি না। তাই রস-ভঙ্গ করাই আমার ব্যবসা! প্রাণের মায়া আছে বলিয়া পতঙ্গের ন্যায় অনলে ঝাঁপ দিয়া ছাই হইতে চাহি না।

পুড়িয়া মরা হইল না। তবে করি কি? আমি মাঝে থাকিতে চাই। কাছাকাছি, পাশাপাশি, মাটি ও আকাশের মাঝামাঝি। হায়! বালুকণা না হইয়া পাখী হইলাম না কেন? কবিত্বের ডানা মিলিলে ঐ আকাশের কাছে কাছে উড়িয়া গান গাহিয়া গাহিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম। মাটিতে আর নামিতাম না। বালুকণার আবাস বেলাভূমিতে। আকাশে ও বেলাভূমিতে যে অনেক খানি ব্যবধান। ঐ উপরের আকাশ ছেড়ে এত দূরে থাকিতে মন সরে না। আবার আকাশে, শূন্যে, মিলাইয়া যাইতেও পারি না। মাঝে থাকিতে চাই। আকাশের কাছাকাছি, পাশাপাশি, মাটি ও আকাশের মাঝামাঝি। পাখী হইলাম না কেন? উড়িতে শিখিলাম না কেন? দুটা ডানা থাকিলে আকাশের কাছে কাছে উড়িয়া সুখ পাইতাম।

অথবা ভ্রমর হইতে পারিলে মন্দ হইত না। ভ্রমর ফুলে ফুলে মধুপান করে। কানন ও মধুচক্রের মধ্যে যে পথ আছে সেইখানেই সে বিচরণ করে, আর তৃষিত প্রাণের পিপাসা নিবারণ হইলে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে বসিয়া যায়। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। সে পরের পীযূষ শোষণ করিয়া নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করে। কিন্তু এই মধুমক্ষিকাবৃত্তি আমাকে রাখিতে পারিল কই? আমার আজ বনপথে বিচরণ শেষ হয়েছে। আজ আমার রসকর্ম্ম নাই, কিন্তু এই রসের ভাণ্ডার লইয়া করি কি? এই রসই আমার বালাই। ফেলিতেও পারি না, পান করিতেও পারি না। এ যে নিজের রস।

তাই অপরকে মধুদান করিবার নিমিত্ত এই রসের বোঝা মাথায় লইয়া বেড়াইতেছি। হায়! জীবের ভাগ্যে স্বতন্ত্রতা কোথায়? বলিতে চাই, না না,—কে যেন বলায়, হাঁ হাঁ। স্কন্ধে যুগভার, মাথা নাড়িয়া ফল কি? এই বাহকবৃত্তিই কি তবে আমার কর্ম্ম? ইহাও কি দাসত্ব নহে? হউক, তথাপি দাস্যবৃত্তি করিতে করিতে কোনও প্রভুর হাতে মর্য্যাদা নষ্ট করিব না। প্রভুর মর্য্যাদা আছে, দাসীর কি মর্য্যাদা নাই? রসের বোঝা বহন করিতে করিতে যেন সুধারসে স্বরসে একরসে গলিয়া না যাই। সোহাগিনী আদরিনী হইব না। কেবল আড়ালে থাকিয়া দূরে সরিয়া সরিয়া দাস্যবৃত্তিই শ্রেয় মনে করি।

যখন রস বহন করাই আমার ধর্ম্ম তখন নিজেকে দাস না বলিয়া বাহন বলি। বুঝিলাম এ ত নিজ রস নয়, কোন দেবতার সুধাসম্ভার বহন করিতেছি। আমি দেবতার বাহন। দেবতা যখন ভক্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, তখন বাহনের ও প্রয়োজন আছে।

আমি কেবল দেবতার বাহন নই, আমি আবার ভক্তের ও সোপান। আমি আজ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আনাগোনার পথ। কিন্তু পথ শুধু বাঞ্ছিতের সঙ্গমে লইয়া যায়। পথের জন্য সে সঙ্গম নহে।

এতাবৎকাল দুই লইয়া আলোচনা করিয়া আসিলাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি তিনেরও যে আবশ্যক আছে, নতুবা আমার স্থান কোথায়? ভক্ত ভগবান, সাধ্য সাধনা, কর্ম্ম কর্ত্তা, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, লক্ষ্য উপলক্ষ্য,—লইয়া আর কতকাল ঘুরিব। সাধনার সোপানে সাধ্যের অনুগামী হইয়া এতাবৎকাল ছুটিয়া আসিলাম, কিন্তু যতই উঠি, যতই অগ্রসর হই, ততই সাধ্য দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়ে। প্রাণে আবার আকুলতা আসে, আবার অবসাদ, আবার মোহ।

তাই এবার সোপান হইয়া মধ্যে থাকাই স্থির করিয়াছি।—তাহাতে কোন বালাই নাই। সাধ্যের পথের পথিকেরা, সোপানে আরোহণ করিয়া লক্ষ্যের উদ্দেশে যাত্রা করুণ। সোপান শুধু বুক

পাতিয়া তোমাদের দেহভার বহন করিবে। এই পাষাণ রূপ ধারণ করিয়া মানবের বাহন হইয়া ধন্য হইব। পাষাণী অহল্যা ভবিষ্য অবতারের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। আমি কাহারও পদরেণু-স্পর্শে মুক্ত হইবার আশা রাখি কি?

স্বেচ্ছায় অবমাননার ভার বহন করাই আজ আমার মাথার মণি। আজ সকলকার ধূলা, সকলকার বোঝা, মস্তকে লইয়া স্বেচ্ছায় আপনার মান খোয়াইয়া পড়িয়া আছি। একদিন যে আমি তাঁহারই পিয়ার ছিলাম। সেদিন ভগবানের সাকীর পানপাত্র বহিবার প্রয়োজন ছিল। আজ আর সাকী হইতে চাহি না। আমি আজ সেই ভাঙ্গা পেয়ালা, তাঁহার পানের শেষে মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছি। সংসার আমাকে পদদলিত করিয়া উল্লাস করুক। আর আমি স্বপদভ্রষ্ট হইয়া সেই আনন্দে সহায়তা করি। তবে আজ এই স্বপদচ্যুতি, স্বধর্ম্মের নাশই, আমার ধর্ম্ম হউক।

না, না, কি বলিতে বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। পাষাণে আবার উত্তাপ কেন? বিক্ষোভ কেন? শীতল, অসাড়, না হইলে সোপান হইব কেমনে?—

আমি মাঝে থাকিতে চাই। মর্ত্ত্যে মধ্যবর্ত্তীরও প্রয়োজন আছে। মধ্যবর্ত্তীর ভিতর দিয়াই সকল প্রকাশ, সকল পূরণ, সকল মিলন। তাই সূর্য্যের কিরণধারা যেন কোন্ দৌত্যচর্য্যায় সাগরবক্ষ হইতে বাষ্প উত্তলোন করিয়া পৃথিবীর উত্তপ্ত বক্ষ শীতল করে। পীযূষ-ভারাবনত স্তনের ভিতর দিয়া শিশু মাতৃবক্ষ হইতে শোণিত শোষণ করিয়া কলায় কলায় বর্দ্ধিত হয়। ভাষার অভিব্যক্তিতেই ভাব বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। অনাহত ওঙ্কার রূপেই ব্রহ্ম প্রতিপ্রাণে শব্দপ্রমাণ হইয়া অবস্থান করেন। ছায়াময়ী কায়া দেখিয়াই বিশ্বরূপের অস্তিত্বের নিদর্শন পাইয়া থাকি।

কেবল বহির্জগতে বা অন্তর্জগতে নয়—উভয়ের সঙ্গমক্ষেত্র ঐতিহাসিক জগতেও এই মধ্যবর্ত্তীরই অভিনয় দেখিতেছি। ভগবান ও

মানবসন্তান (Son of Man, Universal Humanity) থাকিলেও লীলার জন্য পারিষদেরও উপযোগিতা আছে। অবতারী নারায়ণ ও বিরাট জীবসমষ্টি থাকিলেও যুগাবতারের প্রয়োজন আছে। তাই ইতিহাস এক মহাপুরাণ, যুগাবতারকাহিনী, নর-নারায়ণের কথা।

শুধু তাই নয়। জীব চৈতন্যের অস্তিত্বই এই মাঝে থাকায়। ব্রহ্ম ও বিশ্বরূপ আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্যের জাগরণও প্রার্থিত। সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মনেরও প্রাধান্য আছে, নতুবা এ দ্বয়ের উপলব্ধি করিবে কে? সঙ্গমস্থল কোথায়?

সেই নিমিত্তই বুঝি খৃষ্টীয় ধর্ম্মে তিনের উল্লেখ আছে। পিতা, পুত্র, পরিত্র-আত্মা। তাই পুত্র যীশুখৃষ্ট মধ্যবর্ত্তীরূপে মানবসন্তানের উদ্ধারের নিমিত্ত আনাগোনা করিবেন। আর তাই বুঝি শ্রীকৃষ্ণের অবতার চৈতন্যদেব ঘাটে ঘাটে মাথা রাখিয়া পাপীতাপীদিগকে 'আয় 'আয়'! বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। আজও কি বিশ্বমানব ধর্ম্মসংস্থাপক খৃষ্টের আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া নাই? আজও কি ভক্তগণ হৃদয়ে মহাপ্রভুর সেই "আয় আয়" ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন না? নতুবা ভক্ত বৈষ্ণব কবি গাহিবেন কেন, "গৌরাঙ্গ আমার, নাচত আবার"।

কে তুমি, মাঝে আসিয়া যুগে যুগে মর্ত্ত্যবাসীকে ডাকিতেছ! একদিন আমি সেই ডাক শুনিয়াছিলাম। আজ আমিই তোমার ডাক। আমি তোমার হাতে মুরলী। মুরলী কিন্তু নিজে বধির। মুরলীর জন্য সে ডাক নহে!

কে তুমি? হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার মুরলী বাজাইয়া বাজাইয়া প্রত্যেককে আকুল করিতেছ; সেই আহ্বান শুনিয়া কতজনে আপন কুটীর ছাড়িয়া সমাজ ও সংস্কারের রুদ্ধ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কোন্ অজানা পথে ছুটিতেছে, যেন বন্যার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। সেই স্রোতের টানে কেহ উঠিতেছে, কেহ পড়িতেছে, কেহ ভাসিতেছে, কেহ ডুবিতেছে। কোন কোন মাঝি আপন ক্ষুদ্র তর-

নীটি ঘাটেও বাঁধিতে পারিয়াছে, আবার কেহ কেহ অকূলের সন্ধানও পাইয়াছে।

কে ডাকে ঐ, আবার আবার, "আয় আয়"! "আয় আয়"! ঐ কি মায়াবিনী ডাকিনী (Siren) সাইরেন-এর গান, যাহা শুনিলে সংসারের মায়াবন্ধন সকলই টুটিয়া যায়, অবশেষে কোন অজ্ঞাত সাগরসৈকতে দেহের জীর্ণ কঙ্কাল শুকাইতে থাকে! কে গায় ঐ! কি গায় ঐ! ঐ কি নিয়তির তান?

এ জগতে ডাকার শেষ হইল না। চাওয়ারও শেষ হইল না। কিন্তু ডাকে কে? চায় কে! তুমি না আমি!

আজ আর কেহ ডাকে না। হৃদয়-গহনে সেই চিরপরিচিত মুরলীধ্বনি বাজে না। আজ যেন কোন গভীর নীরবতা, চিরস্তব্ধতা, মহাশূন্যের ন্যায় আমাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আপনি মরিয়া আমাকে ডাকিয়া তুমি পলাইয়াছিলে, আমি তোমার দিকে ধাইয়া তোমাকে পাইয়াছিলাম; কিন্তু পরের জন্য, তোমার জন্য—শ্রীরাধিকা যেমন গোপিনীদিগের জন্য রাসলীলা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—আমিও সেইরূপ তোমাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, আমাকে পাইলে যে তুমি আর কাহাকেও চাহ না! তাই আজ আমি পলাতক, তোমায় অস্বীকার করি, দূরে সরিয়া দাঁড়াই!

"দরশন লাগি বর নাহি মাগি!"

কিন্তু কৈ যাহাদের জন্য আসিলাম, যাহাদের জন্য কলঙ্কের ডালি মাথায় করিলাম, তাহারা ত আমাকে গ্রহণ করিল না! তোমার সঙ্গ-দোষ যে আমার অঙ্গে অঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে তাই আর আমাকে কেহ চিনে না, কেহ ডাকে না, কেহ চায় না। তুমি আমার উপর মান করিয়া নীরব হইয়া রহিলে, আর অপরে আমাকে ঘৃণা করিয়া বর্জ্জন করিল; তাই একূল ওকূল দুকূল হারাইয়া মাঝে পড়িয়া গেলাম।

"দরশন লাগি বর নাহি মাগি!"

হে আমার নীরব প্রভু! তুমি আজ গোপনে, অন্তরতলে, নীরব

হইয়া থাক। আজ আর আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া আপনাকে সীমাবদ্ধ করিও না। আপনার নিষ্ফলতা নাশে আপনাকে ক্ষুদ্র ও হীন করিও না। তোমার সেই গুহাহিত অনির্ব্বচনীয় রহস্য হারাইও না। যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি খোলে নাই, যাহারা আবরণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নিরাবরণের সাক্ষাৎ পায় নাই, তাহারাই কেবল রূপের অভাবে অন্ধকার দেখে, সতত বহিঃপ্রকাশ চায়। কিন্তু হে প্রভু! আজ আমি আমার দর্শনে, আমার স্পর্শনে, আমার আস্বাদে, আমার অনুভূতিতে, তোমাকে পাইতে চাহি না। আজ তুমি তোমাকে ব্যক্ত না করিলেই আমি তোমাকে পাই। আজ তোমার মহাশূন্যে শুদ্ধ নীরবতা, তোমার আঁধার সাগরে তলহীন স্তব্ধতা, আমার অনুরাগের জ্বলন্ত অননুভূতিতে জাগিয়াছে। তোমার সর্ব্বাস্তক প্রণয়মহিমা আমাকে স্তব্ধ করিয়াছে।

"দরশন লাগি, বর নাহি মাগি!"

তাই বলি হে আমার দেবতা, তুমি আজ আমার অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অবোধ্য, অনির্ব্বচনীয়। তুমি কি আমার উপর অভিমান করিয়া নীরব হইয়া আছ। আজ তোমার অভিমানেরই জয় হউক! এ জগতে আমার জন্য, হে স্বামিন, তোমাকে যেন আর জন্মমৃত্যুর পথে ঘুরিতে না হয়। তাই তোমারই জন্য তোমার বিদ্রোহী হইয়াছি। আমাকে পাইলে যে তুমি আর কাহাকেও চাহ না!

"দরশন লাগি, বর নাহি মাগি!"

কিন্তু নাথ! তোমার অবোধ সৃষ্টির প্রতি তুমি অভিমান করিও না। সৃষ্টিকে তুমি ডাকিও। তুমি না ডাকিলেও আমি তোমাকে চিনি, কিন্তু সৃষ্টি যে তোমার ডাক না শুনিলে, তোমার রূপ না দেখিলে, পথভ্রান্ত হয়। তুমি তাহাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া জন্মে জন্মে যুগে যুগে ডাকিতে থাক। নাথ, সৃষ্টিকে তোমার মণিকোঠার আঁধারে দর্শনের নিমিত্ত ডাকিয়া লও, আর আমি মন্দিরের বহির্দ্বারে তাহাদের সোপান হইয়া পড়িয়া থাকি।

"দরশন লাগি, বর নাহি মাগি!"

আমি শুধু আমার বুক পাতিয়া তাহাদের নিমিত্ত সোপান রচনা করি। তোমার সৃষ্টি এই সোপান অবলম্বন করিয়া উঠিতে উঠিতে ক্রমপরম্পরায় তোমার সহিত মিলিত হইতে থাকুক্। আমি যেন তোমার ও তোমার সৃষ্টির সন্ধিস্থল হইয়া থাকি। তীর্থ যাত্রীদের দেহভার বহন করিয়া জগন্নাথের রথযাত্রার পথের ন্যায় ধন্য হই। এই ছায়ার কায়া আশ্রয় করিয়া সকলকে তোমার অনন্তরূপ দেখাই।

ব্যোমকেশ! উপরে অজ্ঞেয় রহস্যরূপী তুমি, আর নিম্নে মানব-সমষ্টিরূপী তোমার অপরিমেয় সৃষ্টি, মধ্যে শুধু আমি। যেন পাতাল হইতে স্বর্গধামের উদ্দেশে কোন গগনস্পর্শী সোপানাবলি, মাঝে থাকিয়া কেবল সেই শূন্য রহস্যের পানে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া পড়িয়া আছি।

শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তা।

কল্যাণী

১

এবারে পূজার সময় পুরুলীয়া গিয়াছিলাম। ছেলেরা ধরিয়া পড়িল, একদিন রাঁচি যাইতে হইবে। রাঁচির পথ নাকি বড় সুন্দর। বাঙ্গালা দেশের আশে-পাশে অমন ঘন নিবিড় জঙ্গল আর কোথাও নাই। রাঁচি রওয়ানা হইলাম বটে, কিন্তু রাঁচি দেখা হইল না। মাঝ-পথে এঞ্জিন ভাঙ্গিয়া গাড়ী আট্‌কাইয়া রহিল। আমার পক্ষে ভালই হইয়াছিল। এটি না হইলে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইত না।

যাত্রিরা অনেকেই নামিয়া পড়িল। আমরাও নামিলাম। সেখান-টাতে কোনও ষ্টেশন ছিল না। কাছে জনমানবের বসতি নাই। রেলের দুধারে কেবল পাহাড়, খাদ, আর শালবন। লাইনের ধারে ধারে বেড়াইয়া আমরা বনের শোভা দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ গৃহিণী বলিলেন—দেখ, দেখ, ঐ গাছতলায় যেন চাঁদের হাট মিলিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম, তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া কল্যাণী। কল্যাণীকে পঁচিশ বৎসর পরে দেখিলাম। আমি আমার কাজে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। কল্যাণীও কলিকাতায় ক্বচিৎ কখনও যায়। চাইবাসাতে বাড়ী করিয়াছে, সেখানেই থাকে। পঁচিশ বছর পরে দেখিলাম বটে, কিন্তু মনে হইল কাশীতে পঁচিশ বছর আগে যেমনটি দেখিয়াছিলাম, আজ যেন ঠিক তেমনটিই রহিয়াছে। তার সে স্বাস্থ্য, সে সৌন্দর্য্য, সে কান্তির কিছুই কমে নাই, কেবল যাহা অপরিস্ফুট ছিল তাহা যেন আরো ফুটিয়াছে, যাহা অপরিপক্ক ছিল, তাহা পাকিয়াছে, যাহা একটু চঞ্চল ছিল, তাহা স্থির হইয়াছে। তার আশে-পাশে আটটি সন্তান। বড়টির বয়স ছাব্বিশ, ইহা

জানিতাম। ছোটটিকে দেখিয়া মনে হইল, চারি পাঁচ বৎসরের। ছেলেরা কেউ বা দাঁড়াইয়া আছে, কেউ বা ঘাসের উপরে বসিয়াছে, আর বড়টী মা'এর পার কাছে, আপনার বাহুতে ভর করিয়া একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। এই চাঁদের হাট দেখিয়া মনে মনে আনন্দ-স্বামীকে প্রণাম করিলাম।

২

কল্যাণীকে তার বাল্যকাল হইতেই আমি চিনি। কল্যাণীর পিতা, রাধামাধব বাবু আমাদের কালেজের ইংরাজি-অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্ বিদ্যা যে জানিতেন না, বলিতে পারি না। কালেজে আমরা তাঁর নিকটে ইংরাজিই পড়িতাম, কিন্তু বাড়ীতে যাইয়া দর্শন, ইতিহাস, গণিত, এমন কি সংস্কৃত কাব্য এবং জড়-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত রীতিমত পড়িতাম। পড়ান'তে তাঁর কোনও দিন ক্লান্তিবোধ হইত না। কালেজের অধ্যাপকেরা কেবল নোট লিখাইয়া দিতেন। অনেকেই এগুলি মুখস্থ করিয়া পাশ হইয়া যাইত। রাধামাধব বাবুর কাছে যারা পড়িতে যাইত, তাদের নোট মুখস্থ করিতে হইত না, তারা প্রত্যেক বিষয়ে মূলতত্ত্বগুলি নিজের জ্ঞানে ধরিতে পারিত। আর তাঁর পড়াইবার ধরণটা এমন ছিল যে, তাহাতে সকল বিষয়ই বড় মিষ্ট হইয়া উঠিত। রাধামাধব বাবুর একমাত্র সন্তান কল্যাণী। ছেলেবেলা কল্যাণী অনেক সময় বাবার কাছে বসিয়া তাঁর এ সকল অধ্যাপনা শুনিত।

সেই সূত্রেই কল্যাণীর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে প্রথম পরিচয়ের কথাটা এখনও মনে আছে। আমি সবে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। রাধামাধব বাবু একদিন আমার একটা ইংরাজি রচনা বাড়ী লইয়া গেলেন। আমাকেও সন্ধ্যার পরে তাঁর বাড়ী যাইতে বলিলেন। তখন তিনি শান্‌কিভাঙ্গায় থাকিতেন। একটা ছোট দুতালা বাড়ী। আমি গিয়া দরজার

কড়া নাড়িলাম। "কে ও" বলিয়া একটি আট-নয় বৎসরের বালিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। "ভিতরে আসুন" বলিয়া সে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া রাধামাধব বাবুর বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—"বাবা বাড়ী নাই।" কল্যাণীর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

সেই অবধি আমি একরূপ রাধামাধব বাবুর পরিবারভুক্ত হইয়া গেলাম। যখন তখন তাঁদের বাড়ী যাইতাম। অর্দ্ধেক দিন সেখানেই থাইতাম। কল্যাণী আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, সত্যসত্যই আমাকে তার নিজের সহোদরের মতন দেখিত। বড় হইলেও এ সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটিল না। আমারও নিজের ছোট বোন কেউ ছিলনা; কল্যাণীকে পাইয়া আমার সে অভাব দূর হইল।

আমি ক্রমে এম্. এ পাশ করিয়া বছরখানেক কলিকাতাতেই শিক্ষকতা করি। তারপর, ডিপুটী হইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া গেলাম। কল্যাণীর বয়স তখন ষোল-সতের হইবে। কিন্তু রাধামাধব বাবুকে সেজন্য কোনও দিন চিন্তিত দেখি নাই। প্রথম প্রথম কল্যাণীর বিবাহের কথা উঠিলে তিনি বলিতেন ছেলের পঁচিশ ও মেয়ের ষোল বছরের কমে কিছুতেই বিবাহ হওয়া উচিত নয়। লোকে বলিত—সমাজে এ নিয়ম চলিবে না। রাধামাধব বাবু বলিতেন—সমাজে যাই বলুক, শাস্ত্রে এই কথাই বলে। তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা বলিতেন—আজকালকার হিন্দুসমাজে অত বড় আইবুড়া মেয়ে রাখা অসম্ভব। রাধামাধব বলিতেন—আমরা কুলীন, আমাদের ঘরে চিরদিনই আইবুড়া মেয়ে থাকিত। ষাট বৎসর বয়সে আমার নিজের পিসীমার গঙ্গালাভ হয়, তাঁর বিবাহ হয় নাই। এ সকল কথা শুনিয়া লোকে রাধামাধব বাবুকে কেউ বা খৃষ্টীয়ান্, কেউ বা ব্রাহ্ম ভাবিত। তাঁর নিজের লোকেরাও ভাবিতেন তিনি ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়া পড়িলেন।

চা'র বৎসর পরে আমি পূজার সময় কলিকাতায় যাইয়া দেখি,

কল্যাণীর সম্বন্ধ আসিয়াছে। বরটী আমার বিশেষ পরিচিত। কালেজে সে আমার নীচে পড়িত, কিন্তু আমরা এক মেসেই থাকিতাম। সেও কুলীন ব্রাহ্মণ; এম. এ. পাশ করিয়াছে। দেশে বিষয়-আশয় বেশ আছে। সংসারে তার আর কেউ নাই। অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন হয়। বিধবা পিসী তাকে মানুষ করেন, পিসাত ভাই তার বিষয় দেখিতেন। অল্পদিন হইল দুজনাই মারা গিয়াছেন।

এ সম্বন্ধ যখন আসে, আমি তখন রাধামাধব বাবুর কাছেই বসিয়াছিলাম। তিনি চিঠিখানা আমাকে পড়িতে দিলেন। পড়া শেষ হইলে চোখ তুলিয়া দেখিলাম—রাধামাধব বাবুর চোখ ছল ছল করিয়া আসিয়াছে।

পাত্রের নাম ললিত। ললিত সদ্বিদ্বান, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজ, সাংসারিক অবস্থা বেশ ভাল। রাধামাধব বাবু কল্যাণীর বিবাহের আশাই একরূপ ছাড়িয়া বসিয়াছিলেন। বিধাতা এমন বর আনিয়া দিবেন, ইহা তিনি কোনও দিন ভাবেন নাই।

চিঠিখানা লইয়া তিনি বাড়ার ভিতরে গেলেন। আমাকেও ডাকিয়া নিলেন। কল্যাণীর মা ললিতকে বেশ জানিতেন। ললিত এক সময় তাঁর বাড়ীর ছেলের মতই হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তখন তাঁদের বাড়ী যাইত। কল্যাণীও নিঃশঙ্কোচে তার সঙ্গে মিশিত। কিছুদিন পূর্ব্বে ললিত যাওয়া-আসা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেয়। ডাকিলেও ওজর আপত্তি তুলিয়া এড়াইতে চেষ্টা করিত। ললিতের কি হইয়াছে, বলিয়া রাধামাধব বাবুর গৃহিণী মাঝে মাঝে দুঃখ করিতেন। কল্যাণীর মা এই প্রস্তাবে খুবই সুখী হইলেন। কেবল "কিন্তু" দিয়া বলিলেন, "আর সবই খুব ভাল, ওর সংসারে যে আর কেউ নাই আমি তাই ভাব্‌ছি।"

একটু পরেই কল্যাণী মায়ের কাছে আসিল। রাধামাধব বাবু তার হাতে চিঠিখানা দিলেন। চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে তার মুখ লাল হইয়া উঠিল। মাথা হেট করিয়া সে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিয়া

নির্ব্বাক, নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। রাধামাধব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর মত আছে ত?

কল্যাণীর মা বলিলেন—তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কথা। তোমার আমার মত হলে ও' কি আর 'না' বলবে?

রাধামাধব বাবু বলিলেন—কচি বয়সে বিয়ে দিলে অন্য কথা ছিল; আমার মেয়ে বড় হয়েছে। লেখাপড়াও শিখেছে। ভালমন্দ বুঝ্‌বার শক্তি জন্মেছে। আগেকার কাল থাকিলে সে স্বয়ম্বরা হইতে পারিত। তার মত না লইয়া কি আমি কিছু ঠিক করিতে পারি?

কল্যাণীর মা বলিলেন—পুরুষগুলো কি একেবারে দিনকাণা? ওর মুখ দেখে কি বুঝ্‌ছ না, ওর অমত নাই!

মায়ের কথা শুনিয়া কল্যাণী সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

রাধামাধব বাবু তখন তাঁর মায়ের কাছে গেলেন। প্রতিদিন প্রাতে বৃদ্ধা গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিলে রাধামাধব বাবু যাইয়া তাঁর পদধূলি লইয়া আসিতেন। এটিই তাঁর একমাত্র প্রকাশ্য সন্ধ্যা-বন্দনা ছিল। আজিও মায়ের পদধূলি লইয়া বলিলেন—মা কল্যাণীর সম্বন্ধ আসিয়াছে।

বৃদ্ধা কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মুখ বিষণ্ণ হইল। কল্যাণীর বিবাহ হইবে, এ আশা তিনি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মনে মনে ভাবিতেন, যদি কোনও দিন হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজেই হইবে। আর তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষাতেই রাধামাধব বাবু ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়া পড়েন নাই। কিন্তু কন্যার বিবাহের খাতিরে বুঝিবা সে দেরিটুকুও আর সহিল না।

রাধামাধব বাবু মায়ের মনোভাব বুঝিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—মা তোমার জাত যাবার ভয় নাই। বর বামন, আমাদের পাল্‌টি ঘর, তুমি তাকে জান।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, আমি চিনি? সে কে?

রাধামাধব বাবু বলিলেন—ললিত।

বৃদ্ধা বলিলেন—আমাদের ললিত!

তাঁর মুখ অপূর্ব্ব-উল্লাসে ভাসিয়া উঠিল, দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। বলিলেন—কল্যাণীর জন্য মনে মনে এই বরটি চাহিয়া আমি এ দুবছর কাল প্রতিদিন শিবের মাথায় বেল-পাতা দিয়াছি। ঠাকুর দুঃখিনীর মান রাখলেন।

৩

কল্যাণীর বিবাহে আমি উপস্থিত ছিলাম। রাধামাধব বাবুর গুরুদেব এ বিবাহে পৌরহিত্য করেন। আনন্দস্বামী রাধামাধব বাবুর কুলগুরু নহেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার গয়াধামে রাধামাধব বাবু তাঁর দর্শন লাভ করেন। আনন্দস্বামী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, অনেকে তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া জানিত। তাঁর নিকটে স্বামীজীতে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া, সেই অবধি রাধামাধব বাবু নামব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ করেন। কল্যাণীর বিবাহ ঠিক হইলে, তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। শিষ্যের আগ্রহে আনন্দস্বামী কলিকাতায় আসিলেন। রাধামাধব তাঁহাকেই কল্যাণীর বিবাহ দিবার জন্য ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন—বাবা, দেশে যে আর ব্রাহ্মণ নাই, আপনার মুখেই একথা শুনেছি। ব্রাহ্মণ নহিলে কল্যাণীর বিবাহ দেয় কে? আনন্দস্বামী বলিলেন, কাশী হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া দিবেন। রাধামাধব বলিলেন—বেদজ্ঞ হইলে কি বাবা মন্ত্রজ্ঞ হয়। বেদ ত আজকাল যে সে পড়ে; কিন্তু তার অর্থ জানে কয়জন? আর যারা অর্থ জানে, তারাও ত এ সকলের মর্ম্ম বুঝে না। যদি কচিৎ কেউ মর্ম্মও বুঝে, তারাও ত মন্ত্রের শক্তি ফুটাইতে পারে না। এটী কেবল আপনিই পারেন। আপনি কল্যাণীর বিয়ে না দিলে তার বিয়ে হয় না। আনন্দস্বামী শিষ্যের আব্দার অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। নিজেই কল্যাণীর বিবাহে পৌরহিত্য

করিলেন। আর বিবাহের পূর্ব্বে সাত দিন ধরিয়া কল্যাণীকে বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধি ও বৈদিক মন্ত্রাদি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

রাধামাধব বাবু কল্যাণীকে বেশ ভাল লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এমন কি মোটামোটি জড়বিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্ব পর্য্যন্ত সে শিখিয়াছে। গুরুদেবের মুখে হিন্দু বিবাহের মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এ যে কেবল ধর্ম্ম নয়, কিন্তু জীববিজ্ঞান; শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, এমন কি আধুনিক ইউজেক্‌নিস্ বা সুপ্রজনন-বিদ্যার মূলতত্ত্বগুলির উপরে হিন্দুর বিবাহ-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত। এ সকল কথা বিবাহের মন্ত্রের ভিতরে লুকাইয়া আছে। এতদিনে বিবাহ ব্যাপারটা যে কি কল্যাণী বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া তাহার প্রাণ দমিয়া গেল।

যথাসময়ে আনন্দস্বামী কল্যাণীর বিবাহ দিলেন। যাঁরা এ বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা একবাক্যে বলিয়াছেন, জন্মে কখনও এমন বিবাহ দেখেন নাই। এই মহাপুরুষ যখন ললিতকে মন্ত্রগুলি পড়াইতে লাগিলেন, তখন প্রত্যেকটী মন্ত্র যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। আর এই সকল মন্ত্র-প্রভাবে কল্যাণীর ফুল্ল-যৌবনের উচ্ছ্বসিত রূপরাশি অলৌকিক লাবণ্যে উদ্ভাষিত হইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবতীর মতন দেখাইয়াছিল।

কল্যাণীর বিবাহে সকলের চাইতে বেশী আনন্দ হইল তার পিতামহীর। এই জন্যই যেন তিনি এতকাল পুত্রের সংসারে বাঁধা পড়িয়াছিলেন। কল্যাণী স্বামীর ঘর করিতে গেলে, তার ঠাকুর-মাও কাশী চলিয়া গেলেন।

৪

কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গেলে আমি আমার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলাম। ললিত বয়সে আমার ছোট হইলেও, সখ্যের হিসাবে একই

বন্ধুদলভুক্ত ছিল। একটী বন্ধু লিখিলেন—ললিতের উদ্বাহ শেষে উদ্বন্ধনে দাঁড়াইয়াছে। আমরা তার টিকি পর্য্যন্ত আর এখন দেখিতে পাই না। তার এখন—

উঠিতে কল্যাণী বসিতে কল্যাণী
কল্যাণী হইল সারা,
কল্যাণী ভজন, কল্যাণী পূজন
কল্যাণী নয়ন-তারা।

আমি লিখিলাম, শৈশবে যেমন দাঁত ওঠা, যৌবনে সেইরূপ বিয়ে-টাও কারও কারও হয়। টিদিং আর বিয়ে—দুয়েতেই ভারি কনষ্টিটি-উষন্যাল্ ডিস্টারবেন্স্ হয়। ললিতেরও দেখ্‌ছি তাই হয়েছে। ললি-তকে লিখিলাম—লোকে বলে তোমার নাকি বিয়ে হয় নাই, মৃত্যু হয়েছে। কল্যাণী কি তোমাকে গিলিয়া বসিয়াছে, না তুমিই তাকে গিলিয়া এখন অজগর হইয়াছ, আর নড়িতে চড়িতে পার না। যেই যাকে গিলিয়া থাক, হজম করা শক্ত হবে। কল্যাণী কথাগুলি পড়ুক, এই জন্য পোষ্ট কার্ডে লিখিলাম। তাহাই হইল। কল্যাণী আমাকে লিখিল—

"আপনার পোষ্টকার্ড খানা আমার হাতে পড়িয়াছে। আমি কি বলিব, সত্যি আমার মরিতে ইচ্ছা হয়। আমি ওঁকে কত বলি—তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ একেবারে ছাড়্‌লে, তাঁরা আমাকে কি যে ভাব্‌ছে, তা তুমি দেখ না। উনি বলেন—ওদের হাল্‌কা কথা-বার্ত্তায় তাঁর মাথা ধরে। আমি জমিদারীতে যেতে বলি। তিনি বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া, কোন্ ফ্যাসাদে ফেলে জেলে পুরে দিবে, তার জন্য যান না। আমি বলি, আর কিছু না করুন, প্রতিদিন ময়দানে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন—হাঁট্‌লে তাঁর প্যালপিটেশন্ হয়। আমি মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যাই, কিন্তু গিয়ে দু'দণ্ড থাক্‌তে পারি না—তাগিদের উপর তাগিদ

যায়। আমি কি করি বলুন? আমি ত হার মেনেছি। আপনি যদি কিছু কর্‌তে পারেন, তারই জন্য আপনাকে লিখ্‌ছি।"

৫

বৈশাখ মাসে ঈষ্টারের ছুটিতে কল্যাণীর বিবাহ হয়। আবার বৈশাখ ঘুরিয়া আসিল। তখন আমি মৈমনসিংহে ছিলাম। তিন মাসের ছুটি লইয়াছি। মৈমনসিংহে সেবারে আমরা একটা সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন করি। আমি ললিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাই-লাম। সম্মিলনের পরে কলিকাতায় যাইয়া তার বাড়ীতে কিছুকাল থাকিব, লিখিলাম। ললিত মৈমনসিং আসিল। পাঁচ সাত দিন আমার বাড়ীতেই ছিল। পরে দুইজনে কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

কলিকাতা পৌঁছিয়া দেখিলাম, কল্যাণী বাড়ী নাই। ললিতের চাকর আসিয়া বলিল—পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা কল্যাণী বিছানাপত্র লইয়া কোথায় গিয়াছেন, সে সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, সঙ্গে নেন নাই। এই বলিয়া সে ললিতের হাতে একখানা চিঠি দিল। নিজে পড়িয়া ললিত চিঠিখানা আমার হাতে দিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিল। কল্যাণী লিখিয়াছে—

"প্রাণপ্রতিমেষু,

আমার এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়িবে, তখন আমি অনেক দূরে, কত দূরে তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। তোমার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে, জানি। আমারও যে ক্লেশ কম হইতেছে, ইহা ভাবিও না। কিন্তু আমার চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। অনেক দিন ধরিয়া এটাকে এড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, এড়াইতে পারিলাম না। কোথায় যাইতেছি বলিলাম না, মা বাবাও জানেন না। কেন যাইতেছি, তোমাকে বলিতে পারি না, তাঁদেরেও পারিব না। তোমাদের সকলের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার খোঁজ করিও না, করিলে পাইবে না। তোমারই—কল্যাণী।"

দু'জনে রাধামাধব বাবুর বাড়ী গেলাম। রাধামাধব বাবুকেও কল্যাণী একখানা চিঠি লিখিয়াছে। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই সেখানা ডাকে আসিয়াছে। রাধামাধব বাবু চিঠিখানা হাতে লইয়াই বসিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া তিনি ললিতের হাতে চিঠিখানা দিলেন। কল্যাণী বাবাকে লিখিয়াছে—

"শ্রীশ্রীচরণেষু,

বাবা, আমি বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম। কোথায় যাইতেছি বলিতে পারিব না। কি হইবে ভগবান জানেন। মা'র প্রাণে খুব লাগিবে, জানি। কিন্তু আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। আমার জীবন আর আমার নয়। স্বপ্নে কোনও দিন ভাবি নাই, তোমাদের এমন কষ্ট দিব। সকলই বিধাতার ইচ্ছা। তোমরা আমার ভক্তিপ্রণাম লইবে। ঠাকুরমাকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইও। সেবিকাধম সেবিকা—কল্যাণী।"

আমরা আসিবার পূর্ব্বেই কল্যাণীর মা সব শুনিয়াছিলেন। তাঁরা কিছুতেই এ রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। ললিতের চিঠিখানাও দেখিলেন, তাহাতেও বিষয়টার কোনও কুলকিনারা হইল না।

আমি ছুটীর অধিকাংশটাই কলিকাতায় কাটাইব মনে করিয়াছিলাম। ললিতের অবস্থা দেখিয়া সে সংকল্প আরও দৃঢ় হইয়াছিল। ললিতের বাড়ীর পাশেই একটা বাড়ী ঠিক করিয়া, আমার ছেলে-পিলেদেরে আসিতে লিখিলাম। কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। তিন দিন পরে, গৃহিণীর জ্বরাতিসার হইয়াছে, তারে খবর পাইলাম। আমাকে তখনি মৈমনসিং ফিরিতে হইল।

৬

পারিবারিক অসুখ ও অস্বোয়াস্তির ভিতরে মাসেক কাল আমি ললিতের কোনও খবর লইতে পারি নাই। তারপর যখন তাহার

খবর লইলাম, তখন সে আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিল না। কেবল লিখিল,—তুমি যার খবর জানিতে চাহিয়াছ, তার কোনও খবর লই নাই, পাই নাই, লইবও না, পাইতেও চাই না। পোষ্ট-কার্ডখানা পড়িয়া বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। বুঝিলাম ললিত একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে। তাহা কি, পরে শুনিয়াছি।

আমি চলিয়া আসিলে ললিত প্রথমে তন্ন তন্ন করিয়া কল্যাণীর বাক্স, আলমারী, দেরাজ প্রভৃতি তল্লাস করিয়া দেখে। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তারপর হঠাৎ, তার শোবার ঘরের কোণে একখানা চিঠি কুড়াইয়া পাইল। গ্রাম-সম্পর্কে রাধামাধব বাবুর একটী ভাগিনেয় ছিল। সে প্রথমে আমাদের কালেজেই পড়িত। আমি যখন এম. এ. দেই, তখন সে এফ্. এ. পড়ে। তারপর মেডিকেল কালেজে যায়। একসময় মনে হইয়াছিল বুঝিবা তারই সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ হইবে। ললিত সে কথা জানিত। কল্যাণীর বিবাহের পরে সে একদিন মাত্র কল্যাণীকে দেখিতে আইসে। কিন্তু কল্যাণী সর্ব্বদাই তার কথা কহিত, আর সে কেন যে তাকে দেখিতে আসে না, এজন্য দুঃখ করিত। চিঠিখানা তারই লেখা। সে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে, সরকারী কর্ম্ম পাইয়াছে, শীঘ্রই বর্ম্মায় চলিয়া যাইবে। বর্ম্মা তখনও ভাল করিয়া ইংরেজের দখলে আসে নাই। হামেসাই মারামারি কাটাকাটি চলিতেছিল। সেখানে ইংরাজের কর্ম্মচারিদের অবস্থা বড় নিরাপদ ছিল না। তাই সে লিখিয়াছে—তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর কখনও দেখা হইবে কি না, জানি না। কিন্তু যতদিন বাঁচিব, যেখানেই থাকি, তোমাদের ভালবাসা ভুলিতে পারিব না। সে বিজন বিদেশের মর্ম্মান্তিক একাকিত্বের মধ্যে তোমাদের স্মৃতি আমার এক মাত্র সঙ্গী হইয়া থাকিবে। এই চিঠিখানা পড়িয়া ললিত ভাবিল, সব বোঝা গিয়াছে। বাড়ীর চাকরবাকরদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল আবার দিন দুই আগে একটী বাবু সারাদিন কল্যাণীর সঙ্গে কাটাইয়া গিয়াছেন। বর্ম্মার জাহাজের সন্ধান লইয়া জানিল, যে রাত্রিতে

কল্যাণী চলিয়া যায় সেই রাত্রেই বর্ম্মার জাহাজও কলিকাতা হইতে গিয়াছিল। ললিত তারপর আর কল্যাণীর কোনও খোঁজ করিল না। মুখেও আর তার নাম লইত না।

গৃহিণীকে লইয়া যমের সঙ্গে টানাটানি করিতেই আমার ছুটী ফুরাইয়া গেল। তাঁর হাওয়া বদলান আবশ্যক। আবার ছুটি চাহিলাম, কিন্তু পাইলাম না। ললিতের সঙ্গে দেখা করিবার বা কল্যাণীর খোঁজ লইবার আর সুযোগ জুটিল না। তারপর বড়দিনের ছুটীতে কলিকাতায় গেলাম। গিয়া দেখিলাম রাধামাধব বাবু পেন্‌শন্ লইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন। আর বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন—ললিত গোল্লায় গিয়াছে।

শুনিয়া বড় একটা বিস্মিত হইলাম না। ললিতের হৃদয়টা যে বেশী দিন নিরাশ্রয় হইয়া থাকিবে, এ কল্পনা আমি করি নাই। সে প্রকৃতি তার নয়। ললিতের পিতা চারিবার বিবাহ করেন, ললিত তাঁর চতুর্থ পক্ষের সন্তান। ভেরেণ্ডা গাছে যেদিন তেঁতুল ফলিবে, সেদিন ললিতের রক্তে ব্রহ্মচর্য্য ফুটিতে পারে, তার আগে নয়। কল্যাণীকে হারাইয়া, ললিত প্রথমে প্রথমে মনে মনে বিবিধ রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া তাঁহারই মধ্যে নিরাশ্রয় প্রাণের আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। এ আশ্রয় তার মিলিল। অল্পদিন মধ্যেই সে একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিল। উপন্যাস খানিতে সাহিত্যজগতে একটা প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিল। ললিত বেনামী করিয়া বইখানা ছাপাইল। আমি মৈমনসিং'এ থাকিয়াই বইখানি পড়িয়াছিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই গ্রন্থে এক নূতন যুগ আনিয়াছে, সকলেই বলিতে লাগিল, আমারও তাহাই মনে হইল। ক্রমে থিয়েটারের কর্ত্তারা বইখানি অভিনয় করিতে চাহিলেন। ললিত নিজেই তাহা নাটকাকারে পরিণত করিল। নাটকখানি তাদের খুব পছন্দ হইল। ললিত তখন লিখিল—এ'খানির অভিনয় করিতে হইলে রিহিয়ার্শেলটা তার মনোমত করিতে হইবে। সে যেরূপ চায়, সেরূপ অভিনয়ের

সম্ভাবনা না থাকিলে তার নাটক খানিকে সে কোনও রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে দিবে না। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার উপরেই রিহিয়ার্শেলের ভার দিলেন। ললিত নিজেই রিহিয়ার্শেল করাইতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন—ঐ পথেই সে গোল্লায় গিয়াছে।

৭

কিন্তু ললিতের সঙ্গে একটিবার দেখা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দু'তিন দিন তার বাড়ী গেলাম,—সকালে গেলাম, দুপোরে গেলাম, সন্ধ্যায় গেলাম, রাত্রে গেলাম—দেখা হইল না। বেহারা বলিল, কখন আসে কখন যায়, ঠিকানা নাই। তারপর থিয়েটারে গেলাম। প্রথম দিন সে সেখানে আছে, শুনিলাম; কিন্তু দেখা পাইলাম না। পরের দিন থিয়েটার ভাঙ্গা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। তারপর দেখিলাম ললিত একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে গাড়ী করিয়া চলিয়া গেল। আমার ছুটীর আর দু'দিন মাত্র আছে, সে রাত্রে ললিতের সঙ্গে দেখা না হইলে এ যাত্রায় আর হয় না। আমিও একখানা গাড়ী লইয়া তার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলাম। অবিলম্বেই আমার গাড়ীও সেই বাড়ীর দরজায় যাইয়া দাঁড়াইল। ললিত ও সেই স্ত্রীলোকটী সবে গাড়ী হইতে নামিয়াছে। আমিও গাড়ী হইতে নামিয়া তাদের পিছনে পিছনে বাড়ী ঢুকিলাম। ললিত স্ত্রীলোকটীর পশ্চাতে যাইতেছিল, দুতালার সিঁড়িতে উঠিবার জন্য যেই সে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় আমি তার কাঁধে হাত দিয়া বলিলাম—ললিত!

ললিত চমকিয়া উঠিল, ফিরিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটীও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—"আমায় চিন্‌তে পারছ না? এই পাঁচদিন তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ্ হয়েছি। আমার ছুটী ফুরাইয়াছে, কালই চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারি না। তাই এখানে এসে এ বেয়াদবি করলাম।

স্ত্রীলোকটী বলিল—"আপনারা উপরে আসুন, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন?" ললিত নিঃশব্দে উপরে উঠিতে লাগিল, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিলাম। স্ত্রীলোকটি সিঁড়ির পাশের একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া, আমাদিগকে সেখানে বসিতে বলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, তাতে যেন একটা সংযমের ও ভদ্রতার হাওয়া বহিতেছে। আসবাবগুলি সামান্য মূল্যের, কিন্তু বড় নিপুণতাসহকারে সাজান। আমি একখানা কৌচে বসিলাম, ললিত আমার পাশেই বসিল। আমি কি বলিব, ঠিক করিতে পারিলাম না। শেষটা কেবল কথা না কহিলে নয় বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল আছ ত?" ললিত বলিল "আছি।"

আবার কথা বন্ধ। এবারে আমার সুবুদ্ধি জুটিল। বলিলাম, "সুরমা বইখানা যে তোমার তা' এই সেদিন শুনেছি। আগেই পড়েছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে অমন উপন্যাস বাঙ্গলায় আর হয় নাই। কোনও কোনও দিক দিয়া মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যা করতে পারেনি, তুমি এখানে তাই করেছ। তোমার চরিত্রগুলি কল্পিত বলে আদৌ বোধ হয় না। দিনরাত যাদের সঙ্গে ঘরকন্না করি, তারাই যেন তোমার বইএর ভিতর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর নাটকখানাও অতি চমৎকার হয়েছে। আজ অভিনয় দেখলাম। অমন অভিনয় এদেশে হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।" ললিতের মুখের বাঁধন খুলিয়া গেল। কি করিয়া প্রথমে উপন্যাসটী লিখিয়াছিল, এই খানি লিখিতে গিয়া তার ভিতরে কি যুগান্তর উপস্থিত হয়, তারপর কি করিয়া এখানিকে নাটকাকারে পরিণত করে, সব বলিতে লাগিল। তারপর অভিনয়ের কথা বলিতে যাইয়া, আর বলিতে পারিল না। কি যেন বুকের ভিতর হইতে তার মুখের কথা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি বলিলাম—"ইনিই না তোমার নাটকের নায়িকা সাজেন? এরই নাম কি রসমঞ্জরী? বাঙ্গলারঙ্গমঞ্চে এমন করিয়া কেউ কখনও কোন চরিত্রকে ফুটাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

ললিত বলিল—"এখন ইহাকে দেখিলে এ কথা তোমার বিশ্বাস হ'বে না। অমন সামান্য স্ত্রীলোকের ভিতর অমন অসামান্য অদ্ভুত শক্তি ও প্রতিভা কোথাও দেখি নাই, থাকতে পারে বলিয়াও আগে কল্পনা করতে পারতাম না। দেখা করবে?"

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "এখন থাক্"; কিন্তু মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—"দেখতে ইচ্ছা হয় বটে।"

ললিত তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। দেখিলাম সত্যই এ মানুষ সে মানুষ নয়। সে তেজ, সে দীপ্তি, সে কিছুই নাই। সেখানে একটা বিশ্বগ্রাসিনী, বিশ্ববিজয়িনী শক্তির প্রকাশ দেখিয়াছিলাম। এখানে দেখিলাম অনুপম কোমল-প্রকৃতির একটী শ্রীমতী বাঙ্গালীর মেয়ে। কিন্তু একটী বস্তু সেখানে ঐ রঙ্গমঞ্চেও ছিল, এখানে এই ঘরের মাঝেও আছে, তাহা চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বস্তুটিকেই ইংরাজিতে Character বলে। দেখিলাম মুখের ভিতরে এমন একটা কিছু ফুটিয়া আছে, যাহা আপনা হইতে চিত্তে সম্ভ্রম জাগাইয়া দেয়। দেখিয়া বন্ধুদের কথা মনে পড়িল—"ললিত গোল্লায় গিয়াছে।"

রূপ আছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ ব্যক্তি যে রাজ্যের লোক এ রূপ সে রাজ্যের নহে। এ রূপ দেহ-গঠনের পারিপাট্যে ফুটিয়া উঠে নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যের আভাতে উদ্ভাসিত। ইহার কান্তি লাবণ্যের। ইহার মধ্যে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা আছে, জ্বালা নাই। এ রূপ আত্মসম্ভাবিত নহে, ইহাতে আত্মবিস্মৃতি আছে। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যত দেখিতে লাগিলাম, ততই কাণে বন্ধুদের কথা বাজিতে লাগিল—ললিত গোল্লায় গিয়াছে।

কি কথা কহিব, খুজিয়া পাইলাম না। অভিনয়ের কথাটাই তুলিলাম, কথা খুলিল না। মনে হইল এ যেন কলাজগতের কোন কিছুই জানে না। ভাবিলাম এ মানুষের ভিতরে কি দুটা ব্যক্তিত্ব আছে? এরই নাম কি—Dual Personality?

তার মুখে দু'চারিটী কথার বেশী শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু এ দুচারিটী কথাতেই বুঝিলাম, এ সামান্য স্ত্রীলোক নয়। জাত, কুল, ব্যবসা তার যাই হউক না কেন, দেবতা ইহার মধ্যে এখনও সজাগ আছেন। উঠিবার সময় সে আমাকে অতিশয় নত হইয়া নমস্কার করিল বটে, কিন্তু আমি তাহাকে মনে মনে প্রণাম করিলাম।

আমি ললিতকে গোল্লায় হইতে টানিয়া তুলিতে আসিয়াছিলাম, এই রমণী আমার সে শক্তি হরণ করিল।

৮

ললিতের সঙ্গে তার বাড়ীতেই ফিরিয়া গেলাম। গাড়ীতে দু'জনার কাহারও মুখেই কোনও কথা ফুটিল না। সেই নীরবতা লইয়াই দুজনায় ললিতের শোবার ঘরে যাইয়া একখানা কৌচে বসিলাম। হঠাৎ আমি বলিয়া উঠিলাম—তার পর!—কি ভাবিয়া, কোন্ স্বপ্নঘোরে যে বলিলাম মনে নাই। কিসের পর, কি জানিতে চাহিয়াছিলাম, বস্তুতঃ পূর্ব্বাপর কিছুই ছিল কি না, তাহাও জানি না। কেবল ঐ প্রথম কথাটাই এখনও মনে আছে।

ললিত আগে কড়ির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, এবারে মাথা হেট করিয়া আনত চক্ষু দুটী মেজের উপরে রাখিল। ডান হাতের তর্জ্জনীতে কোঁচার খুঁট জড়াইতে জড়াইতে বলিল—আমি ইহাকে বিবাহ করিতে চাই, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না।

আমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। অজ্ঞাতসারে মুখে কল্যাণীর নাম বাহির হইয়া পড়িল।

ললিত বলিল—"মানুষকে ভূতপ্রেতে পাইলে দেবতার নামেই শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে।"

আমার মুখে কথা সরিল না। খানিক পরে ললিত আমার

মুখের দিকে চোক তুলিয়া কহিল—"তুমি যে বড় আমায় দেখ্‌তে এলে? এ সংসারে কেহই ত আমার খোঁজ করে না।"

বহু বহু দিন যা করি নাই, আজ তাহাই করিলাম—ললিতকে টানিয়া বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিলাম। চোক বুজিয়া আসিল। সেই নিমীলিতনেত্রে কল্যাণীর ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিল। ললিত আমার বুকে মাথা গুঁজিয়া শীতার্ত্ত বালকের মতন কাঁপিতে লাগিল। কতক্ষণ যে দু'জনায় এ ভাবে ছিলাম, জানি না। তারপর ললিত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—"তোমায় পেয়েছি ভালই হয়েছে। তোমার সাম্‌নে আজ হিসাব নিকাষ কর্‌ব।"

বলিয়াই উঠিয়া তার বসিবার ঘরে গেল। সেখান হইতে এক-তাড়া চিঠি হাতে লইয়া আসিয়া আমার কাছে বসিল। চিঠির তাড়াটা খুলিতে খুলিতে বলিল—

"তুমি আমার কথা সবই জান। একরূপ বাল্যকাল হইতেই জান। তারপরও সব জান। সে কথা তুলিব না। তুমি সেবারে আমাকে কি অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছিলে, তাও জান। তারপর—"

ললিতের কথা আটকাইয়া গেল। একটু পরে ক্ষীণ স্বরে বলিল—"জানিলাম সে বর্ম্মায় চলিয়া গিয়াছে।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—"কি?"

ললিত আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—"এই দেখ, তুমি চলিয়া গেলে, এখানা ঘরের শোবার কোণে কুড়াইয়া পাইয়াছি।"

আমি চিঠিখানা পড়িয়া বলিলাম—"তুমি পাগল।"

ললিত বলিল—"পাগল হই আর ছাগল হই, আমার জীবনের সে অঙ্ক শেষ হইয়া গিয়াছে। তার স্মৃতি প্রেতিনীর মতন আমাকে তিন মাস কাল দিন রাত তাড়া করিয়া বেড়াইয়াছিল। ক্রমে "সুর-মার" স্বপ্ন রচনা করিতে যাইয়া, সে জ্বালা কমিয়া গেল। কিন্তু দুধের সাধ কি জলে মিটে? না, স্বপ্নে পাঁচ তরকারী দিয়া পেট ভরিয়া খাইলে জাগ্রতের ক্ষুধার যাতনা নষ্ট হয়। প্রাণের শূন্যতা

গেল না। যতক্ষণ ভাবতাম ও লিখতাম ততক্ষণ বেশ থাকতাম, তার-পর—তারপর তুমি ত সবই দেখলে। যা ভাবতে ইচ্ছা হয়, তাই ভাব। আমার কোনও ভয় ভাবনা নাই।"

খানিক পরে বলিল—আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম, এখনও চাই; কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হয় না।

আমি বলিলাম,—না হইবারই কথা।

ললিত একটু গরম হইয়া বলিল—তুমি তাকে জান না বলেই অমন কথা বলছ।

আমি বলিলাম—যা দেখেছি ও জেনেছি, তাতেই একথা বলছি।

ললিত বলিল—তুমি কি মনে কর যে ওরাজ্যে কখনও কোন ভাল লোক থাকতে পারে না।

আমি বলিলাম—ভাল মন্দের বিচার করিবার আমি কে?

ললিত বলিল—তুমি বিশ্বাস করবে না, ওকে না দেখলে আর ওর সকল কথা ভাল কর না জানলে আমিও বিশ্বাস করতে পারতাম না। এ ভদ্রলোকে'র মেয়ে—

আমি বলিলাম—তা বিশ্বাস করার বাধা কি? অনেকেই ত তাই।"

ললিত বলিল—সে ভাবে নয়। সে অর্থে ভদ্রঘরে তার জন্ম হয় নাই। কিন্তু কুল মন্দ হইলেও, রক্তটা ভাল। আর কেবল আর্টের আকর্ষণেই থিয়েটারে ঢুকিয়াছে, নতুবা জীবিকার ব্যবস্থা বেশই ছিল। মা মরিয়া গেলে, কথা কইবার লোক ছিল না। তখন দুই পথ তার সম্মুখে খোলা ছিল। এক, যে পথে সবাই যায়, আর যে পথ সে ধরিয়াছে। তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, থিয়েটারের আলাপ পরিচয়টা তার থিয়েটারের চতুঃসীমানার ভিতরেই আবদ্ধ। আমিই প্রথম এ লক্ষণের গণ্ডী পার হইবার অধিকার পাইয়াছি। আর এই-টুকু না পাইলে, আজ আমি কোথায় যাইতাম জানি না।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া, ললিত আবার বলিল—ও যে কিছু-তেই বিয়ে করতে রাজি হয় না, না হইলে আমার আর কোনও দুঃখ থাকিত না। আর যে ভাবে আমার বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে, তার উপরে আমার কোনও কথাও যে চলে না।

ললিত নীরবে হাতের চিঠির তাড়া হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া, পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা বড় নয়, কিন্তু ললিতের পড়া যেন শেষ হইতে চাহে না। অনেকক্ষণ পরে অতি মৃদুভাবে সে-খানা আমার হাতে দিল। বোধ হইল আমার হাতে দিতে যেন তার প্রাণে কি একটা ভয় জাগিতেছে। আমি পড়িলাম—

"সুহৃদ্বরেষু,—

তোমাকে এই আমি প্রথম পত্র লিখিতে বসিলাম। বাবার মৃত্যুর পরে, একবার কেবল যে থিয়েটারে আমি এখন আছি তার অধ্যক্ষ মহাশয়কে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম, আর জন্মে কাউকে লিখি নাই। মুখে আমার কথা ভাল ফোটে না, তুমি জান। মুখে সকল কথা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না, ভয় হয়। তাই লিখিতে বসি-লাম।

আমার জীবনের আগেকার কথা তুমি সবই জান। তারপর তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি কোন্ পথে আমার জীবনে আসিয়াছ, তাহা জান। আমার জীবনের ঐ একটী পথই বাল্যাবধি খোলা ছিল, আর পথ ছিল না, এখনও নাই। আমি জীবনে যা কিছু পাই-য়াছি, ঐ পথেই আসিয়াছে। সেই পথেই তোমাকেও আমার জীব-নের সহায় রূপে বরণ করিয়াছি, সেই পথেই তোমার জীবনের সহ-চরী হইয়া তোমার সেবা করিবার অধিকার লইয়াছি। অন্যপথে আমার এ অধিকার নাই। এই জন্যই তুমি যে প্রস্তাব করিয়াছ, আমি তাহাতে কোনও মতেই সম্মত হইতে পারি না। তুমি আমার জীবনে আসিবার আগে, আমি অপরের রস-মূর্ত্তিকেই রঙ্গমঞ্চে ফুটাই-তাম, নিজে রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিতে পারি নাই। তুমি আমাকে দিয়া

এইটি করাইয়াছ। আমিও তোমার নিত্য নূতন রস-সৃষ্টির সাহায্য করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব। তোমার সন্তানের জননী হইবার অধিকার আমার নাই। তুমি পুরুষ, আমি যে স্ত্রীলোক। পুরুষের পিতৃত্ব বুদ্বুদের মতন উপরে ভাসিয়া থাকে, রমণীর মাতৃত্ব তার হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া যায়। আমি বাবাকেও দেখিয়াছি, মাকেও দেখিয়াছি। আর মার কথা ভুলিতে পারি না বলিয়াই তোমার প্রস্তাবে রাজি হইতে পারি না। তুমি আমার জন্মকথা অগ্রাহ্য করিতে পার, আমি যে পারি না। আর আমি ভুলিয়া গেলেই, আমার সন্তানও কি তাহা ভুলিতে পারিবে? আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু তোমাকে সুখী করিবার জন্যও যারা এখনও জন্মায় নাই, তাদের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা আগে হইতে জন্মের মতন নষ্ট করিয়া রাখিতে পারি না। আমার প্রাণের বেদনা কি তুমিও বুঝিবে না? মুখে সব কথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিতাম না, তাই এই দীর্ঘ পত্র লিখিলাম। এই কথা তুলিয়া আর আমাকে যাতনা দিও না।"

কতক্ষণ যে এই চিঠিখানা পড়িতে লাগিল, জানি না। পড়া শেষ হইলেও কতক্ষণ যে, এ খানিকে হাতে লইয়া বসিয়াছিলাম, তাহাও বলিতে পারি না। চিঠিখানা ললিতের হাতে ফিরাইয়া দিয়া আনমনে বলিলাম—এখন?

ললিত বলিল—এখন, যা দেখলে যা জান্‌লে তাই। তুমি যে আমার বাড়ী, আমাকে খোঁজ করতে এসেছিলে, তা আমি জান্‌তাম। প্রতিদিনই আমি বাড়ী ছিলাম। তোমাকে বাড়ী ঢুক্‌তেও দেখিয়াছি। দেখা করতে ইচ্ছা হয় নাই, তাই করি নাই। আর আমার বেহারা জানে আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। সবাইকে এ'কথা বলে—বাবু বাড়ী নাই। তুমি ত জানই, আমার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই বলে—আমি গোল্লায় গিয়াছি। সত্যি করে বল দেখি, তুমিও কি তাই ভাব?

কি উত্তর দিব ভাবিয়া আকুল হইলাম। বিধাতা বাঁচাইলেন। চাকর চা লইয়া আসিয়া, দরজা জানালা খুলিয়া দিল। সূর্য্য উঠিয়াছে। ললিত বলিল—তাই ত, সারা রাত তোমায় ঘুমুতে দেই নাই।

৯

এই বৎসর পূজার সময় আবার এক মাসের ছুটি লইলাম। রাধামাধব বাবু, কোন্ সূত্রে বলিতে পারি না, এ খবর পাইয়া একবার কাশীতে যাইয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে লিখিলেন। আমারও সেই ইচ্ছা ছিল। পরিবারবর্গকে বৈদ্যনাথে রাখিয়া আমি কাশী চলিয়া গেলাম। রাধামাধব বাবু তাঁর গুরুদেবের ঠিকানা দিয়া, সেই খানেই যাইয়া আমায় উঠিতে লিখিয়াছিলেন। আমি সেই খানেই গেলাম। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখি, কল্যাণী সেখানে দাঁড়াইয়া; কোলে নয় দশ মাসের একটী ফুট ফুটে ছেলে; মুখে যেন ললিতের মুখখানি আবার কচি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। কল্যাণী ছেলে কোলে লইয়াই আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম তোমার একি অন্যায় কাজ, মামাকে যে সোণা দিয়া ভাগিনার মুখ দেখতে হয়, আমি এখন সোণা পাই কোথায়?

বিকালবেলা আনন্দস্বামী আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া, কল্যাণী এই দেড় বৎসর কাল যে তাঁর কাছেই ছিল, সে কেন বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসে, কেন ললিতকে বলিয়া আইসে নাই, কেন পরেও কোনও সংবাদ দেয় নাই, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। আমি বলিলাম—সবই বুঝিলাম, কিন্তু ললিতের কথা ত আপনারা ভাবিলেন না, আর কল্যাণীর ভবিষ্যতের দিকেও ত চাহিয়া দেখিলেন না।

আনন্দস্বামী একটু হাসিয়া বলিলেন—সবই ভাবিয়াছি।

আমি বলিলাম—ললিতের খবর—

আনন্দস্বামী বলিলেন—সবই রাখি, সবই জানি।

আমি বলিলাম—ললিতের জীবনটা যে নষ্ট হইল, আর কল্যাণীর সংসারও উৎসন্নে গেল।

আনন্দস্বামী বলিলেন—আপনি জ্ঞানী হইয়া অমন কথা বলিবেন ভাবি নাই। সত্য কি কাউকে নষ্ট করে?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। প্রাণের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত যেন কথাগুলিতে নাড়িয়া চাড়িয়া দিল। তবু বলিলাম,—আপনি সত্য কাকে বলেন?

"প্রত্যেকের প্রকৃতিই তার একমাত্র সত্য।"

"প্রকৃতির কি ভাল মন্দ নাই?"

"প্রকৃতি যা নয়, তাই মন্দ, তা ছাড়া আর মন্দ কোথায়?"

"তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম।"

"স্ব-ধর্ম্ম ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই। কল্যাণী আপনার ধর্ম্মের প্রেরণাতেই ললিতকে ছাড়িয়া আসে।"

"বুঝিলাম না।"

"বোঝা সহজ। কল্যাণী যতদিন কেবল রমণী ছিল, ততদিন ললিতের সেবাই তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল, যে দিন সে মা হইতেছে বুঝিল, সে দিন এই নূতন মাতৃ-ধর্ম্ম তার পূর্ব্বকার সকল ধর্ম্মাধর্ম্মকে ছাড়াইয়া, তাহাকে এক নূতন নিয়মে বাঁধিল। এরই খাতিরে সে ললিতকে ছাড়িয়া আসিয়াছে।"

"এখন?"

"ছেলে বড় হইয়াছে, স্তন ছাড়িলেই কল্যাণী আবার ললিতের কাছে যাইবে।

"আপনি কল্যাণীর ধর্ম্মটাই কেবল দেখিলেন, ললিতের কথাটা ত ভাবিলেন না।"

"ভাবিয়াছি। ললিত ধর্ম্মমতে কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াও ধর্ম্মপত্নীত্বে কোনও দিন বরণ করে নাই। কামপত্নী করিয়াই রাখিতে

লাগিল, ললিত রস চাহিয়াছে, ভোগ চাহিয়াছে, সখ ও সুখ চাহিয়াছে, আপনাকে বহু করিয়া আত্মার যে পরম সার্থকতালাভ হয়, তাহা চাহে নাই। যে যা চায়, সংসারে সে তাই পায়। ললিত যাহা চাহিয়াছিল, তাহা পাইয়াছে।"

"কল্যাণীকে সে কি আর গ্রহণ করিবে? কল্যাণীই কি আর ললিতের জীবনের আধখানা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে?"

"না পারিলে কল্যাণী এখনও মা হইবার অধিকার পায় নাই। কল্যাণীই কি আর ললিতকে তার জীবনের সবটা দিতে পারে? এই ছেলে যে তার বড় আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছে।

আমার বড় খটকা লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কল্যাণী সব জানে।

"সব জানে। আপনি যে কলিকাতায় এসেছিলেন, তাও জানে।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম—আপনাদের কোনও অতিলৌকিক শক্তি আছে, নতুবা বহুতর গুপ্তচর নিশ্চয়ই আছে; নহিলে এ সব কথা আপনারা জানিলেন কেমন করিয়া?"

"উত্তর বড় সহজ। মঞ্জরীর মা আমার মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।" মঞ্জরী আজ এখানেই আছে। কল্যাণীর কথা সে বিশেষ কিছুই জানিত না। এখন সকল রহস্য ভেদ হইয়াছে, আর তার প্রাণের যে দিকটা খালি ছিল, কল্যাণীর সন্তানকে বুকে ধরিয়া তাহা পূর্ণ হইতেছে।

আমি আনন্দস্বামীর পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম। তিনি "নমো নারায়ণায়" বলিয়া আমাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া, বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর কি যে হইল জানি না!

চোখ খুলিয়া দেখিলাম—কল্যাণীর পাশে, তার ছেলেটীকে কোলে লইয়া মঞ্জরী দাঁড়াইয়া। আমি চোখ খুলিবামাত্র কল্যাণীর কোলে ছেলেটীকে দিয়া সে আমাকে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

আনন্দস্বামী বলিলেন—বিশ্বের পরম তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক, রূপতঃ

দুই। এই দুই'এর এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি। এই প্রকৃতির আবার দুইরূপ, একরূপ জগদম্বা আর একরূপ শ্রীরাধিকা, একরূপের আশ্রয়ে সৃষ্টির, আর অপরের আশ্রয়ে লীলার প্রকাশ হয়। এই তিনেতে পুরুষ আপনি আপনার পূর্ণতা সাধন করেন।

চাহিয়া দেখিলাম একদিকে কল্যাণী, আর একদিকে মঞ্জরী, আর মাঝখানে দুজনের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণীর সন্তানটী। আমি এই অভিনব বিশ্বরূপ দেখিয়া, প্রণাম করিলাম।

আনন্দস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুর এরূপ প্রকট কোথায়?

তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে।

শ্রীহরিদাস ভারতী।

প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক

"ভদ্রার্জ্জুন অর্থাৎ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ" বাঙ্গালা ভাষায় আদিম নাটক।* ইহার রচয়িতা তারাচরণ শীকদার। গ্রন্থখানির প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে,—

ভদ্রার্জ্জুন
অর্থাৎ
অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ।
শ্রীতারাচরণ শীকদার কর্ত্তৃক প্রণীত।

"মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা।
সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা॥"

কলিকাতা
চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।
শকাব্দ ১৭৭৪।

গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহা অধুনা আদি বাঙ্গালা নাটক বলিয়া সাধারণতঃ বিঘোষিত 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্বের' এক বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। তারাচরণ এই নাটকখানি পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে গঠিত করিয়াছেন। "ভদ্রার্জ্জুনের" "বিজ্ঞাপনে" তারাচরণ লিখিয়াছেন,—

"এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে।.....এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থলের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটকপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েকজন নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই। যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার

---

* 'বিদ্যমঙ্গল' নামক একখানি নাটকের উল্লেখ কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না, ও ইহা যাত্রার পালা বা নাটক তাহাও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না।

ও নটীর রঙ্গ-ভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায়-ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় (Act) একট্ কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) একট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থানঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন। যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত হইত তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটকনির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়।.....এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

তারাচরণ (Scene) সিন্ বুঝাইতে 'সংযোগস্থল' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য নাটকে Scene শব্দ দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাটকের ঘটনাগুলি কোন্ দেশে ঘটিতেছে তাহা বুঝাইবার জন্য নাটকের পাত্রপাত্রীর উল্লেখের পর সেই ঘটনাস্থল বা Sceneএর উল্লেখ থাকে। উদাহরণ—সেক্ষপীয়রের জুলিয়াস্ সীজার নাটকে পাত্রপাত্রীর উল্লেখের পর আছে "Scene—During a great part of the Play at Rome; afterwards at Sardis and near Philippi" (ঘটনাস্থল—নাটকের অধিকাংশ স্থলে রোম-নগরী, পরে সার্দিস ও ফিলিপির নিকটবর্ত্তী প্রদেশ)। এইখানে Scene শব্দটি "সংযোগস্থল"-দ্যোতক। এই অর্থেই পরে বহু বাঙ্গালা নাটকে "সংযোগস্থল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'প্রকুল্ল' ও "বলিদান" নাটকে পাত্র-পাত্রীর উল্লেখের পর আছে 'সংযোগস্থল—কলিকাতা'।

কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকে Scene শব্দ আর এক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক অঙ্ক কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ অংশে বিভক্ত হয়। এই অংশগুলি আজকালকার বাঙ্গালা নাটকে 'দৃশ্য বা

গর্ভাঙ্ক' নামে কথিত হইয়া থাকে। ইংরাজী Scene শব্দটি এই 'দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক' অর্থেও প্রযুক্ত হয়। তারাচরণ 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকে 'দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক' অর্থে 'সংযোগস্থল' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রয়োগ সমীচীন নহে। পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ যে Scene শব্দের দুইটি পৃথক্ অর্থ 'সংযোগস্থল' ও 'দৃশ্য' এই দুইটি পৃথক্ শব্দ প্রয়োগ দ্বারাই বুঝাইয়াছেন তাহাই অধিকতর সঙ্গত।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এইখানে বাঙ্গালা নাটকে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। "অঙ্ক" "যবনিকা" "নট" "নটী" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত ও প্রায় প্রাচীন-কালে যে অর্থে প্রযুক্ত হইত সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু "দৃশ্য" অর্থে "গর্ভাঙ্ক" শব্দটি অদ্ভুত ধরণে বাঙ্গালা নাটকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাটকের মধ্যে নাটক থাকিলে শেষোক্তটিকে 'গর্ভাঙ্ক' বলা হইত। হ্যাম্‌লেটে যেরূপ নাটকের মধ্যে নাটকের অবতারণা আছে, সংস্কৃতে ভবভূতির "উত্তর-রাম-চরিত" ও রাজশেখরের "বাল-রামায়ণ" নামক নাটকদ্বয়ের মধ্যে তেমনি ক্ষুদ্র নাটকের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাকেই গর্ভাঙ্ক বলে। বিশ্বনাথ কৃত সাহিত্য দর্পণে আছে,—

"অঙ্কোদরপ্রবিষ্টো যো রঙ্গদ্বারামুখাদিমান্।
অঙ্কোঽপরঃ স গর্ভাঙ্কঃ সবীজঃ ফলবানপি॥"

[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২০ শ্লোক]

উদাহরণস্বরূপ বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত বাল-রামায়ণের মধ্যে প্রযুক্ত "সীতা স্বয়ম্বর" নামক ক্ষুদ্র নাট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা নাটকে গর্ভাঙ্ক-শব্দের এ অর্থ বজায় থাকে নাই। প্রথমে তারা-চরণ 'দৃশ্য' অর্থে 'সংযোগস্থল' শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের অপ-প্রয়োগে দোষী নহেন। কিন্তু তাঁহার পর রামনারায়ণ তর্করত্ন নিজ-রচিত "নব-নাটক" ও "রুক্মিণী-হরণ" নাটকে 'দৃশ্য' অর্থে 'গর্ভাঙ্ক' শব্দ প্রয়োগ করেন। রামনারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত।

তাঁহার এইরূপ প্রয়োগ নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। নব-নাটকে দুই-এক স্থলে গর্ভাঙ্কের বদলে 'প্রস্তাব' শব্দ ব্যবহারে রাম-নারায়ণের 'সতর্কনাং পরিচয়ং অল্পমিতং' হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার পর হইতে তাঁহার অনুসরণে বাঙ্গালা নাটকে 'দৃশ্য' অর্থে 'গর্ভাঙ্ক' প্রচলিত হইয়া গেল।

সংস্কৃতজ্ঞ রামনারায়ণই যখন 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তখন বঙ্গের যে সকল নাট্যকার আদৌ সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্র পাঠ করেন নাই, তাঁহারাও যে সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির অপ-প্রয়োগ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। ইংরাজী Prologue শব্দের অনুবাদে বাঙ্গালায় "আভাস" "প্রস্তাবনা" ও "সূচনা" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিকের সহিত সূত্রধারের কথোপকথন-সম্বলিত নাটকের প্রারম্ভে প্রযুক্ত অংশকেই প্রস্তাবনা বলে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে॥
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভিমিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা॥"

[সাহিত্য-দর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৩১, ৩২ শ্লোক]

আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে কিন্তু নটী, সূত্রধারের কথোপকথনের অবতারণা হয় না। নাটকের প্রারম্ভে নাট্য হইতে পৃথক্ একটি দৃশ্য-কেই এখন 'প্রস্তাবনা' বলা হইয়া থাকে। গীতি-নাট্যগুলির প্রারম্ভে একটি সঙ্গীত যোজিত হইলেই তাহা প্রস্তাবনা-নাম ধারণ করে। আদিম বাঙ্গালা নাটকসমূহে সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ প্রস্তাবনা থাকিত। পরে তাহা উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু প্রস্তাবনা শব্দটি ভিন্ন অর্থে তাহার পরও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। "স্বগত" "প্রকাশ্যে"

প্রভৃতি বাঙ্গালা নাটকে ব্যবহৃত নাট্যোক্তিগুলি ঠিক সংস্কৃত অর্থানুযায়ীই ব্যবহৃত হয়। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্।
সর্ব্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্যাদ্"

[সাহিত্য দর্পণ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১৩৭-৩৮ শ্লোক]

এতদ্ব্যতীত "ক্রোড়াঙ্ক" "উপসংহার" "উজ্জ্বল দৃশ্য" প্রভৃতি কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ বঙ্গীয় নাট্যকারগণ নূতন সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা নাটকে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজী নাটকের *Dramtis Personae*র অনুবাদ আদিম বাঙ্গালা নাটকসমূহে নিম্ন-লিখিত শব্দ-প্রয়োগে সাধিত হইয়াছে—"নাটক সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম" (ভদ্রার্জ্জুন), "নাট্যোলিখিত ব্যক্তিবৃন্দ" (নব-নাটক), "নাট্যো-ল্লিখিত পুরুষ ও স্ত্রীগণ" (কুলীনকুলসর্ব্বস্ব) ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে "চরিত্র" শব্দ দ্বারাও Dramates Personae বুঝাইবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। গিরীশচন্দ্রের কতকগুলি নাটকে এই "চরিত্র" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতে ঠিক্ Dramaatis Personaeর অনুরূপ কোনও শব্দ পাওয়া যায় নাই। কারণ, তখন নাট্যাভিনয়ে "প্রোগ্রামের" ব্যবহার ছিল না, ঐরূপ কোনও শব্দ দ্বারা নাট্যের পাত্রপাত্রীর পরিচয়ও জ্ঞাপন করান হইত না। অধিকাংশ স্থলেই একজন পাত্র প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আর একজন তাহার সূচনা করিতেন। উত্তর-রাম-চরিতে অষ্টাবক্র চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া যাইতেছেন "এই যে কুমার লক্ষ্মণ আসছেন"। নাটকের সর্ব্ব প্রথম দৃশ্যে যে পাত্র প্রবেশ করিত সূত্রধারই প্রস্তাবনায় তাহার বর্ণনা করিয়া দিত; যথা,—"এই রাজা দুষ্মন্ত যেমন অতিশয় বেগবান্ মৃগ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছেন।" কাজেই প্রোগ্রামের প্রচলন না থাকায় সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে Dramatis Personaeর অনুরূপ কোন শব্দের বিশেষ প্রযুক্ত প্রয়োজন ছিল না। লিখিত নাটকগুলির পুঁথিতেও ইংরাজী নাটকের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে পাত্রপাত্রীর তালিকা

থাকিত না, কাজেই Dramatis Personaeর অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় না। ইহা দ্বারা অবশ্য বলিতে পারা যায় না যে, পাত্র-পাত্রীদ্যোতক কোনও শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নাই। সংস্কৃত নাট্যসমূহের প্রস্তাবনায় বহু স্থলে "ভূমিকা" শব্দ দ্বারা নাট্যের পাত্র-পাত্রীর অংশ সূচিত হইয়াছে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এক্ষণে Dramatis Perso nae শব্দটি যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, প্রোগ্রামাদিতে বা নাটকের প্রারম্ভে ব্যবহারের জন্য সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ কোনও শব্দ-প্রয়োগ আবশ্যক ছিল না বলিয়া, তাহার ব্যবহার দেখা যায় না। কাজেই প্রথমে যখন ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালা নাটকের রচনা আরম্ভ হইল, তখন বাঙ্গালী নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যে Dramatis Personaeর অনুরূপ কোনও শব্দ না পাইয়া নিজ নিজ নাটকে "নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ "চরিত্র" প্রভৃতি শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং দেখা গেল যে বাঙ্গালা নাটকে যে সকল পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত নাট্য হইতে গৃহীত, কতকগুলি নূতন সৃষ্ট। সংস্কৃত নাট্য হইতে গৃহীত শব্দগুলির কতক বা প্রাচীন অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, আবার কতক বা নূতন অর্থ ধারণ করিয়াছে।

এক্ষণে আমরা "ভদ্রার্জ্জুন" নাটকখানির পরিচয় দিব। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু "মাইকেলের জীবনীতে" লিখিয়াছেন—"তখন বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয়োপযোগী নাটক ছিল না। বিদ্যমঙ্গল, ভদ্রার্জ্জুন প্রভৃতি যে দুই একখানি নাটক ছিল, তাহাও এরূপ কদর্য্য ভাষায় রচিত ছিল, যে পাশ্চাত্যনাটক সমূহের অভিনয় দর্শন করিয়া কাহারও আর সেরূপ নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে বাসনা হইত না।" আমরা বিদ্যমঙ্গল নাটক দেখি নাই, কিন্তু ভদ্রার্জ্জুন সম্বন্ধে যোগীন্দ্র বাবুর উক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। ভদ্রার্জ্জুন নাটকখানি আদৌ "কদর্য্য

ভাষায়" রচিত নহে। যে অশ্লীলতাদোষে মাইকেল, দীনবন্ধু, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতির নাট্যগুলি দূষিত, ভদ্রার্জ্জুনের কোথাও তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহন রায় সম্পাদিত "সংবাদ কৌমুদী" পত্রিকায় তৎকালীন নাটকসমূহের দূষিত রুচির আলোচনা হইয়াছিল। যোগীন্দ্র বাবু সম্ভবতঃ এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক না দেখিয়াই পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি যে "সংবাদ কৌমুদী"তে 'নাটক' নামে যে সকল রচনা নিন্দিত হইয়াছে, ভদ্রার্জ্জুন তাহাদের অন্যতম নহে। ভদ্রার্জ্জুন নাটকের 'বিজ্ঞাপন' হইতেই এ কথা প্রমাণিত হইবে। ভদ্রার্জ্জুন প্রণেতা তারাচরণ লিখিয়াছেন,—

> এতদ্দেশীয় কবিগণ-প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয় কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্তে মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে সুভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।" [ভদ্রার্জ্জুন, বিজ্ঞাপন, ৪ পৃষ্ঠা]

উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে নাটক নামে পরিচিত গ্রন্থগুলি যাত্রা ও গীতাভিনয়েরই অধিক অনুরূপ ছিল, আমরা এখন নাটক বলিতে যাহা বুঝি তাহা ছিল না। সেকালের যাত্রা ও তারাচরণ বর্ণিত 'নাটকে'র যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তৎকালীন যাত্রায় গীতবাহুল্য ও সং'এর বাড়াবাড়ি ছিল। "সং যাত্রার অঙ্গীভূত ছিল। .....বাসুদেব ঠাকুর, সুন্দুরে জেলে, নারদ মুনি প্রভৃতি প্রথমেই হাস্যরসের উদ্রেক করিয়া আসর হইতে অবসর লইতেন।.....যাত্রার...অধিকারীরা পরে আসরে অব

তীর্ণ হইতেন। তাঁহারা তখন গান জমাট করিতেন, শ্রোতৃবর্গকে ভক্তি ও করুণরসে আপ্লুত করিতেন এবং রাগরাগিণীর মূর্চ্ছনা দ্বারা মোহিত করিতেন।" [সারদাচরণ মিত্রের স্মৃতি, "সংকল্প" ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা] "যাত্রার কেলুয়া ভুলুয়া প্রভৃতি সং ছেলেদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল।" [জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, "ভারতী" বৈশাখ, ১৩২১] ইহা হইতে যদি আমরা অনুমান করি যে "সংবাদ কৌমুদী"তে ও ভদ্রার্জ্জুনের বিজ্ঞাপনে নিন্দিত 'নাটক' যাত্রা মাত্র, আমরা নাটক বলিতে এক্ষণে যাহা বুঝি তাহা নয়," তাহা অসঙ্গত হইবে না। অন্ততঃ যতদিন না ইহার বিপরীত কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ততদিন ইহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইবে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত 'কলি রাজার যাত্রা' নামক গ্রন্থ "সংবাদ কৌমুদী"তে 'নাটক' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার নাম হইতেই ইহা যে যাত্রা বা গীতাভিনয়, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। যাত্রাদির ঘৃণ্য রুচি সংশোধন করিবার জন্য ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালায় নাটক রচনা আরম্ভ হয়, ভদ্রার্জ্জুনের বিজ্ঞাপন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। রামনারায়ণ তর্করত্নও 'রত্নাবলী'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটকসমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মল সুধাকরবিনিঃসৃত সুধাধারের আস্বাদ পাইলে কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না।"

এই সকল হইতেই বুঝা যাইবে যে রামমোহন রায় 'কলি রাজার যাত্রা'কে 'নাটক' আখ্যা দিলেও, তাহা প্রকৃতপক্ষে নাটক কি যাত্রা, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সংশয় আছে। কারণ তৎকালে 'নাটক' শব্দটি যাত্রার অভিনয়ার্থ রচিত গ্রন্থ সকলে ও প্রযুক্ত হইত। পূর্ব্বোদ্ধৃত ভদ্রার্জ্জুনের ভূমিকায় 'নাটক' বলিয়া যে সকল পুস্তক বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যাত্রা বা গীতাভিনয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাত্রা, "কবি" প্রভৃতি প্রাচীনকালের নাট্যাভিনয় অশ্লীলতা দোষে প্রায়ই দূষিত হইত।

কাজেই শিক্ষিত জনসাধারণের প্রাণে ক্রমে এসকল অভিনয়ের প্রতি বিরাগের সঞ্চার হইল। এই বিরাগ এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, কবিত্বপূর্ণ অথচ অশ্লীলতাবর্জ্জিত "কবি" "পাঁচালী" প্রভৃতির পালাও কেবল "পাঁচালী" ও "কবি" বলিয়া ঘৃণিত হইতে লাগিল। অবশ্য আসর বুঝিয়াই পাঁচালী বা কবিওয়ালাগণ খেউড়ের অবতারণা করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নাট্যকলার আস্বাদ পাওয়াতে ক্রমশঃ অশ্লীলতাশূন্য পাঁচালী বা কবির পালাও বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জনে সক্ষম হইল না। আজ তাই গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সখের নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পাঁচালী, কবি প্রভৃতি বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। যাত্রাও ক্রমে ক্রমে থিয়েটারের মতই হইয়া উঠিতেছে।

সে যাহা হউক, এই কুরুচিপূর্ণ যাত্রার পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ নাটক অভিনয়ে শিক্ষিত দর্শক সন্তুষ্ট হইবেন, এই আশায় তারাচরণ শীকদার 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজী নাটকের Prologueএর ন্যায় ভদ্রার্জ্জুনে একটি 'আভাস' সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে তারাচরণ নাটক ও নাট্যকলার নিম্নলিখিত প্রশংসা করিয়াছেন :—

"সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান।
সর্ব্বস্থলে নাটকের আদর সমান॥
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী-নিবাসী।
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাষী॥
দর্শকমণ্ডল-মাঝে করিয়া বিস্তার।
করিতেছি সুধাসম-নাটক-প্রচার॥
শ্রুতিযুগে দৃষ্টিযুগে প্রবেশি এ সুধা।
তৃপ্তি করে সকলের নিরানন্দ-ক্ষুধা॥"

এইরূপে নাট্যকলার প্রশংসা করিয়া নাট্যকার সমগ্র নাটকের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটী 'আভাসে' পয়ারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'আভাসে'র পরই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্, এ।

বিরহে

এমন বাদল-দিনে
কোন মথুরায়,
আমার পরাণ ল'য়ে,
গেল শ্যামরায় ।
সেথা কি মধুর নিশি
আঁধারে গিয়েছে মিশি' ?
এমনি পাগল পারা
নেমেছে বাদল ধারা ?
তা'রো কি নয়ন-দুটি
আঁখি জলে ছায় ?
এমন আঁধার রায়
নিঠুর বিজুলী-ঘায়,
তারো কি বিজন-হিয়া,
উঠিতেছে শিহরিয়া ?
সেও কি চমকি উঠি
পথপানে চায় ?
সখি, এমন বাদল দিনে,
কোথা শ্যামরায় ?

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

২

যে শ্রীকৃষ্ণের কথা এই শেষ-বয়সে, শুনিতে ও বলিতে এমন আনন্দ পাই, গুরুকৃপায় এই ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনোবৃত্তি-সকল, আপন আপন প্রকৃতির অনুসরণে এই সংসারের বিচিত্র বিষয়-রস ভোগ করিতে করিতেই ক্রমে যে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কিন্তু তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ। মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তেও ইঁহাকে তত্ত্ববস্তুরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ

ইহাই মহাপ্রভুর কথা। ইহাই আমার এই সামান্য কৃষ্ণকথারও মূলসূত্র। তবে এই সিদ্ধান্তকে ধরিয়াই যে আমি কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, এমন নয়। অন্তরে গুরুকৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়াই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছি।

আর এই সিদ্ধান্তের মর্ম্ম বুঝিয়াই দেখিলাম, মহাপ্রভুর কথা লোকে ধরিতে পারে নাই। তিনি বলিলেন প্রত্যক্ষ তত্ত্বের কথা, লোকে শুনিল কেবল পুরাতন কিম্বদন্তীর দূরাগত প্রতিধ্বনি। তিনি দেখাইলেন চিদ্বস্তু, তারা দেখিল কেবল পৌরাণিকী প্রতিমা। তিনি প্রকট করিলেন ভগবানের নিত্য-লীলা, তারা ভাবিতে লাগিল কেবল দ্বাপরের পুরাণ-কাহিনীর কথা। এই বাঙ্গালার, উড়িষ্যার, তৈলঙ্গ-দেশের ও দক্ষিণাপথের মাঠে ঘাটে তিনি আবিষ্কার করিলেন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব চিন্তামণিময়ী ব্রজভূমি, ভারতের এক কোণে যে সামান্য পরিসর বনভূমিকে লৌকিকী কিম্বদন্তী বলিত শ্রীবৃন্দাবন, তারা চলিল ব্রজের ধূলি মাখিতে, কেবল সেইখানে। তিনি বলিলেন, কৃষ্ণের—

"বিভূতি দেহ সব চিদাকার"

তারা মাটি দিয়া, ধাতু গালিয়া, পাথর খুঁদিয়া গড়িতে লাগিল—নব-নটবর শ্যামসুন্দর। মহাপ্রভু, "নূতন" ভক্তি বিলাইবার জন্য নূতন ভাবের হাট খুলিলেন,—আর জগতের সকল মহাপুরুষেরা যাহা করেন, তিনিও তাহাই করিলেন,—পুরাতন ও প্রচলিত ভাষা দিয়াই এই নূতন ভাবকে সাজাইয়া লোকের নিকটে ধরিলেন। তাঁর ভাবসম্ভার ছিল অজ্ঞাতপূর্ব্ব, এই ভাষার সাজ ছিল চিরপরিচিত। ভাব তাঁর ধরিল সাড়ে তিনজন, ভাষা তাঁর গিলিল লক্ষ লক্ষ লোকে। এই সাড়ে তিনজন খাঁটি বৈষ্ণবের তিরোভাবে মহাপ্রভুর সেই "অভিনব" ভক্তিভাব, নিরাধার হইয়া, যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানেই উড়িয়া গেল, পড়িয়া রহিল কেবল ঐ প্রাচীন প্রাণহীন ভাষা, আর সেই লক্ষ লক্ষ অবোঝ লোক। আর তাহারা সেই শূন্যগর্ভ শব্দ-রাশিতে আপনাদিগের চিরাগত সংস্কারকে পূরিয়া দিয়া তাহাকেই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত পন্থা বলিয়া ধরিল। মহাপ্রভু যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তার অঙ্কুরোদ্গম হইল না। কিন্তু সে বীজ অক্ষয়, তাহা কদাপি নষ্ট হইবার নহে। সেই অক্ষয় বীজকে ফুটাইবার জন্যই ভারতের, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশের, আধুনিক ইতিহাসের অভিব্যক্তি।

যে নিবিড় কল্পনাজাল মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সহজ সাধনকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিল, ইংরাজি শিক্ষা ও আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল। যে বৈদান্তিক মায়াবাদ কেবল জীব-ব্রহ্মের ভেদই উড়াইয়া দিতে চাহে নাই, কিন্তু এই ভেদ উড়াইতে যাইয়াই জগৎকে মিথ্যা ও সংসারের সর্ব্ববিধ রসের সম্বন্ধকে বন্ধন-হেতু বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, বৈষ্ণবেরা তত্ত্বমীমাংসায় তাহাকে বর্জ্জন করিয়াও, ধর্ম্মসাধনে প্রকৃত পক্ষে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আর পারেন নাই বলিয়াই, সত্যভাবে মহাপ্রভুর পথও ধরিতে পারিলেন না। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন, বিশেষতঃ প্রাচীন গ্রীশীয় ললিত-

কলার জীবন্ত রক্তমাংসের প্রবলপ্রেরণা, সেই মায়ার প্রভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। য়ুরোপের সংস্পর্শে আসিয়া আর যাহা কিছু পাইয়া বা খোয়াইয়া থাকি না কেন, তাহাতে যে এই প্রত্যক্ষ জগৎকে এবং আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মাকর্ম্মকে ও সংসারের সর্ব্ববিধ রসের সম্বন্ধকে সজীব, সতেজ ও সত্য করিয়া তুলিয়াছে, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর য়ুরোপের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে, এই সংসারটা এমন সত্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই, মহাপ্রভুর অভিনব ভক্তিপন্থাটিও দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছে।

এই ভক্তির পথ সংসারের পথ, সন্ন্যাসের পথ নহে। আর যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতের সভ্যতা ও সাধনা একান্ত সংসার-বিমুখ ও পরলোক-সর্ব্বস্ব হইয়াছিল বলিয়াই, আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মহা-প্রভুর উপদেশ শুনিয়াও তার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের ধর্ম্মকর্ম্ম ও সাধন ভজন সকলই, বহুদিন হইতে, সংসার ও সংসারের বিবিধ সম্বন্ধকে উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে একান্ত পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল। সংসার মায়ার খেলা; প্রবৃত্তিবশে লোকে সংসার করে, করুক; কিন্তু এ মায়ার বন্ধন না কাটিলে কখনও পরম-পুরুষার্থ লাভ হয় না। ইহাই লোকের ধারণা ছিল। সংসার-বিমুখ সাধনভজন জীবকে কৈবল্যের পথেই লইয়া যাইতে পারে। প্রকৃত ভক্তির পথ সন্ন্যাসের পথ নহে, সংসারেরই পথ, লোকে এ সকল কথা জানিত না ও বুঝিত না। কৈবল্যের সাধ্য নির্গুণব্রহ্ম; ভক্তির উপজীব্য সর্ব্বগুণাধার ভগবান। কৈবল্যসাধক চাহেন সকল সংসার-বন্ধন কাটিয়া, সর্ব্বসম্বন্ধাতীত ও সর্ব্বোপাধিশূন্য হইয়া, নির্গুণ ও নিরুপাধি ব্রহ্মস্বরূপে মিলিয়া গিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ করিতে। ভক্তের প্রাণ চাহে ভগবানের সঙ্গে বিবিধ রসের সম্বন্ধ পাতিয়া, তাঁহাকে পিতা, সখা, পুত্র বা প্রণয়ীরূপে ভাবিয়া, দাস্য, সখ্য, বাৎ-সল্য বা মধুর রসে বিভোর ও আত্মহারা হইয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিখিলরসামৃতমূর্ত্তির—তাঁহার সেবা করিতে। কৈবল্য চাহে সর্ব্ব

সম্বন্ধের উচ্ছেদ করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হইতে। ভক্তি চাহে সংসারের সকল সম্বন্ধকে বজায় রাখিয়া ও পূর্ণ করিয়া, সকল রসকে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে তুলিয়া লইয়া, নিত্যকাল এই সকল রসের সম্বন্ধের সাধন করিয়া শ্রীভগবানের লীলার সহায় হইতে। মহাপ্রভু এই কৈবল্যমুক্তির অপূর্ণতা ও এই মায়াবাদের ভ্রান্তি দেখাইয়া জীবকে সত্য ভক্তির পথে লওয়াইবার জন্যই আসিয়াছিলেন। "আপনি আচরিয়া," তিনি "কলির জীবকে" এই "অনর্পিতচরী" ভক্তির পথই দেখাইয়া গিয়াছেন। অবতার মাত্রেই অসুরবধ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়াবাদরূপ অসুরকে নষ্ট করিলেন। কিন্তু এ অসুর মরিয়াও মরিল না। লোকে ভক্তির কথা শুনিল, কিন্তু মুক্তির লোভ ছাড়িতে পারিল না। যাহারা হরি-নাম পাইল, জপযজ্ঞে দীক্ষিত হইল, মুখে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—

বলিতে লাগিল, তাহারাও বাহ্য-ক্রিয়াকলাপ ও তান্ত্রিক শান্তিস্বস্ত্যয়ন ছাড়িল না। তারা নামও করিতে লাগিল, কাপড়ও তুলিতে ভুলিল না। যারা মহাপ্রভুকে স্বীকার করিল, নিত্যানন্দের আশ্রয় লইল, তারাও তিলক কণ্ঠী ধারণ করিয়া ভেক লইয়া সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যারা গৃহী হইয়া রহিল, তারাও সংসারের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত সম্বন্ধের মধ্যে, দাস্যসখ্যবাৎসল্যাদি রস সাধন করিয়া নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবানকে পাইল না। আর না পাইয়া এ সকলকে মায়িক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া কল্পিত প্রতীকাদি ধরিয়া এই সকল রস-সাধনে নিযুক্ত হইল। লোকে মহাপ্রভুর এই অনর্পিতচরী ভক্তি পাইল না। আর তাঁর আবির্ভাবের সার্থকতাসম্পাদনের জন্যই মনে হয় ইংরাজের শাসন-দণ্ডে ভয় করিয়া, সংসার-রস-বিভোরা, প্রত্যক্ষপরায়ণা য়ুরোপীয়সাধনা আসিয়া আমাদের দ্বারে দ্বারে, অজ্ঞাতসারে, সেই রসই বিলাইতে লাগিল। শয়তানের

দূত হইয়া নহে, কিন্তু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কিঙ্কররূপেই য়ুরোপ আমাদের কাছে আসিয়াছে।

সংসার ও পরমার্থের মধ্যে বিরোধ সকলদেশের সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে এ পর্য্যন্ত এ বিরোধের নিঃশেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। কেহ বা সংসারকে ছাড়িয়া পরমার্থ খুঁজিয়াছে, কেহ বা পরামর্থকে ছাড়িয়া সংসারে মজিয়াছে; আর কেহ বা সংসার ও পরমার্থের মধ্যে, তদর্দ্ধং মদর্দ্ধং করিয়া, একটা গোঁজামিল দিয়া চলিয়াছে, কিন্তু এ দু'এর সম্যক্ সমন্বয় এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মে করিয়াছে বলিয়া জানি না। মহাপ্রভুই কেবল এই সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের সেবা মানুষ চিরদিনই করিয়াছে। কেহ কেহ এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সেবাকেই ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়াও লইয়াছে। বামাচার কেবল ভারতবর্ষেই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মিশরে, গ্রীশে, সকল—প্রায় সকল প্রাচীন দেশেই, কোনও না কোনও সময়ে, কোনও না কোন আকারে, এই কদাচার প্রবল হইয়াছে। মহাপ্রভু এই কদাচারের সমর্থন বা প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কিন্তু ভগবদারাধনায় এ সকল ইন্দ্রিয়কে একেবারে বর্জ্জনও করেন নাই। কেবল এই সকল রসের করণকে নির্ম্মল করিয়া, শুদ্ধ করিয়া, তাহাদের ভিতরে যে অতীন্দ্রিয়-সংকেত আছে, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া, সকলরসাধার ভগবানের সেবাতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। পূর্ব্বতম সাধকেরা ঈশ্বরে পরানুরক্তিকেই ভক্তি বলিয়া গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—রস ভিন্ন অনুরাগ কোথায়? শুদ্ধ রসের সম্বন্ধেতেই কেবল সত্য ও অহৈতুকী অনুরাগ ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ অনুরাগ লাভ করিতে হইলে, শ্রেষ্ঠরসাস্বাদন আবশ্যক। ভগবানেতে এই শ্রেষ্ঠ অনুরাগ অর্পণ করিতে হইলে, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ-রসের আশ্রয় বা বিষয়রূপে ধরিতে হইবে। অতএব কেবল "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—বলিয়া ভক্তির সংজ্ঞা দিলে চলিবে না। এ ভক্তি প্রাচীন ভক্তি। এ ভক্তি উপনিষদের ঋষিগণ, শুকনারদাদি

ভাগবতেরা পূর্ব্বে আচরণ করিয়া গিয়াছেন। এ ভক্তি অনর্পিত-চরী নহে। যে ভক্তি পূর্ব্বে কেউ কোনও দিন আচরণ করে নাই, মহাপ্রভু জীবকে তাহাই বিলাইতে আসিয়াছিলেন। এই অনর্পিতচরী ভক্তির নূতন সংজ্ঞা প্রয়োজন। তাই—

"হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"

অনর্পিতচরী ভক্তির এই সংজ্ঞা হইল। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরের সেবাই ভক্তি।

উপনিষদ্—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেনঃ প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি—

"মন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আপন বিষয়ের প্রতি গমন করে? শরীরের অভ্যন্তরে প্রধানরূপে বর্ত্তমান প্রাণ, কাঁহাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? কাঁহার চালনায় লোকে এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে, এবং কোন দেবতাই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন,—বলিয়া যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়াছিল, এবং ক্রমে

"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং"

সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত হইয়াও যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণাভাস—বলিয়া যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তিনিই হৃষীকেশ। এ সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা যখন তিনি এ সকল ইন্দ্রিয়ের সার্থকতাই বা তাঁহাতে ভিন্ন আর কোথায় হইতে পারে? তাঁর সেবার জন্য ইন্দ্রিয়-গ্রামকে নিষ্পেষিত করিতে হয় না, যথাযথভাবে বিকশিত করিয়াই তুলিতে হয়। প্রাচীন সন্ন্যাস-মুখী সাধনা, যে ইন্দ্রিয় সকলকে সাধনার বৈরী ভাবিয়া নির্য্যাতন করিয়াছিল, মহাপ্রভু সেই ইন্দ্রিয়গ্রামকেই সাধনের সহায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সংযমে শক্তি বাড়ে, অসংযমে ও উচ্ছৃঙ্খলতায় শক্তি নষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ের শক্তির বৃদ্ধির জন্য সংযম চাই। অনুশীলন ব্যতীত বিকাশ অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের বিকাশের জন্য অনুশীলন চাই। এই অনুশীলনের পথ, অনেক পশুদেরও ইন্দ্রিয় আছে, তারাও নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন করে। এ পথ পাশব। তারা ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন করে "অবশং প্রকৃতের্বশাৎ"—প্রকৃতির প্রেরণায়, অবশেই তারা যন্ত্রারূঢ়ের মতন বিষয় রাজ্যে চলাফেরা করিয়া থাকে। আর, এক দিক দিয়া দেখিলে মানুষকে কেবল শ্রেষ্ঠ পশুরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেষ্ঠ পশুরূপী মানুষের একটা ইংরাজি নাম হইয়াছে। ইংরাজিতে আমরা ইহাকে mere man (মিয়ার ম্যান্) বলিয়া থাকি। কেবল মাত্র বুদ্ধির দিক দিয়াই এই মিয়ার ম্যান পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই মানুষ প্রাকৃত-বুদ্ধি-সম্পন্ন। ইহার অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি ফোটে নাই। সে এখনও আপনাকে আত্মা স্বরূপ বলিয়া জানে নাই। এই প্রাকৃত মানুষের ইন্দ্রিয়ানুশীলন, বিষয়ের প্রেরণায় চলিয়া, বিষয়ের সীমাতেই পড়িয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়ানুশীলন প্রত্যক্ষের উপরে উঠে না। ইন্দ্রিয়ানুশীলনের এ পথকে প্রাকৃত মানুষের পথ বলা যাইতে পারে। এই পথেও হৃষীকেশের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে ইন্দ্রিয়ের ভিতরে অতীন্দ্রিয়ের সাড়া জাগিয়াছে, তারই দ্বারা কেবল হৃষীকেশের ভজনা সম্ভব হয়। যে ইন্দ্রিয়ানুশীলনের মধ্যে উচ্চাঙ্গের ললিতকলার উদ্দীপনা নাই, তাহা ভক্তিসাধনের উপযোগী হয় না। তাহাতে রূপের মধ্যে অরূপকে, সান্তের মধ্যে অনন্তকে, সংসারের মধ্যে পরমার্থকে, ধরা যায় না। আর রূপের ভিতরে যে অরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করে নাই, যে ভাবাঙ্গের সাহায্যে হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করিতে হয়, সে ভাবাঙ্গগঠন তার পক্ষে অসম্ভব। এই ভাবাঙ্গস্ফূর্ত্তিকেই ইংরাজিতে idealisation কহে।

এই ভাবাঙ্গ-স্ফুরণ বা idealisation ধর্ম্মসাধনে নূতন কথা নহে।

স্বল্পবিস্তর সকল ধর্ম্মেতেই এই ভাবাঙ্গস্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই ভাবাঙ্গস্ফূর্ত্তি ব্যতীত জীবের অতীন্দ্রিয়ানুভূতি জাগে না; আর কোনও না কোনও আকারে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি না জাগিলে, কোনও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্ম সাধনে এই ভাবাঙ্গের স্ফুরণ কল্পিত ছিল, সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয় নাই। প্রত্যক্ষের উপরে ভাবাঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, মানস-কল্পনার উপরেই হইত। কোনও কোনও স্থলে ললিতকলাতে এ সকল ভাবাঙ্গ সম্পূর্ণ বস্তুতন্ত্র হইলেও, ধর্ম্মসাধনে চিরদিনই স্বল্পবিস্তর কল্পিত ছিল। মহাপ্রভু ভাবাঙ্গসাধনে এই কল্পনার প্রভাবকে নষ্ট করিয়া, ভক্তিকে প্রত্যক্ষ রসের উপরে গড়িয়া তুলিয়া বস্তুতন্ত্র

"হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"

করিলেন। কিন্তু লোকে মুখে এই কথার আবৃত্তি করিয়াও, ইহার মর্ম্ম ধরিল না।

য়ুরোপীয় সাধনা আসিয়া, এতদিন পরে, আমাদিগকে এই ভক্তি-পথের সন্ধান দিয়াছে। য়ুরোপ এই অনর্পিতচরী ভক্তির কথা কিছুই জানে না। কিন্তু ললিতকলার মধ্যে অপূর্ব্ব ভাবাঙ্গ গড়িবার সংকেতটী সুন্দররূপে সাধন করিয়াছিল। গ্রীশের ললিতকলাতে একদিকে যেমন অপূর্ব্ব বস্তুতন্ত্রতা দেখিতে পাইলাম, অন্যদিকে সেই-রূপ অদ্ভুত ভাবাঙ্গ-স্ফূর্ত্তিও প্রত্যক্ষ করিলাম। গ্রীশীয় ললিতকলার ভাবাঙ্গস্ফূর্ত্তি বা idealisation বস্তুতন্ত্রহীন নহে। জড়ের ভিতরে গ্রীশ অজড়কে, প্রত্যক্ষের উপরে অপ্রত্যক্ষকে, চাক্ষুষ রক্তমাংসের আকার ও বর্ণের মধ্যেই অচাক্ষুষ আত্মবস্তুকে যেমন ফুটাইয়াছিল; এ পর্য্যন্ত আর কোথাও তেমন দেখি নাই। ভারতের তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান য়ুরোপে ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু এই বস্তুতন্ত্র ভাবাঙ্গ-স্ফূর্ত্তি-নিবন্ধন, এই idealisation'এর প্রভাবে, য়ুরোপীয় সাধনা মানুষকে পশুত্বের ভূমি হইতে তুলিয়া শ্রেষ্ঠতম মানবতার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষকে

য়ুরোপ এখনও দেবতা করিয়া তুলে নাই। জীবে শিববুদ্ধি য়ুরোপের এখনও জন্মে নাই। এখনও সর্ব্বজীবে তার ব্রহ্মভাবোদয় হয় নাই। আমাদের সাধনা ইহা করিয়াছে। কিন্তু করিয়াছে বেশীভাগ কেবল কল্পনার রাজ্যে, বস্তুর রাজ্যে করিতে পারে নাই। আমরা কল্পনা-জগতে মানুষকে দেবতা করিয়াছি, য়ুরোপ বাস্তব জগতে মানুষকে সত্য জীবন্ত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে। য়ুরোপীয় সাধনার ভাবাঙ্গস্ফূর্ত্তি বা idealisation বস্তুতন্ত্র, কল্পিত নহে। আর এই জন্যই এই সাধনা অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভু প্রচারিত অনর্পিতচরী ভক্তির পথ ক্রমে প্রশস্ত ও উজ্জ্বলতর করিয়া দিতেছে।

য়ুরোপীয় সাধনার প্রেরণায়, জগতের প্রত্যক্ষ রূপ রসাদির অনুসরণ করিয়াই ক্রমে কৃষ্ণপথের সন্ধান পাইয়াছি। এই জন্যই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ পৌরাণিকী কাল্পনার শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কিন্তু তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ। আর কৃষ্ণবস্তু যে তত্ত্ববস্তু এই গোড়ার কথাটা ভুলিয়া গেলে, আমাদের এই প্রত্যক্ষপ্রধান বৈজ্ঞানিক যুগে, কেউ কখনও শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে ও ভজিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।